সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা বারো

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৬১

দ্বিতীয় সংস্করণ : চৈত্র, ১৩৬১

তৃতীয় সংস্করণ : কার্ত্তিক, ১৩৬৩

প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর : মন্মথনাথ পান

কে. এম. প্রেস

১।১, দীনবন্ধু লেন

কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা :

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই :

বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

শ্রীমতী পদ্মিনী সান্যাল ও

শ্রীধীরেশ চন্দ্র সান্যাল-কে

১৯৫৪ সালের গ্রীষ্ম স্মরণে

ঃ রচনাকাল ঃ

১৯৫৩ সালের জুলাই থেকে

১৯৫৪ সালের ৫ই মে, বুধবার সকাল

কলিকাতা

লেখকের অন্যান্য বই—

অন্য নগর (৩য় সংস্করণ)

এই মর্তভূমি (২য় সংস্করণ)

মনে মনে (২য় সংস্করণ)

মুখর লণ্ডন (৩য় সংস্করণ)

ছায়া মারীচ (২য় সংস্করণ)

নতুন বাসর (২য় সংস্করণ)

ইভনিং ইন প্যারিস (২য় সংস্করণ)

জনসম্রাট

ব্যালেরিনা

দুর্গতোরণ (যন্ত্রস্থ)

বিপাশা (যন্ত্রস্থ)

সোমবার

পুরো ঠিকানা হলো,

অফিস অব দি হাই কমিশনার ফর ইণ্ডিয়া

ইণ্ডিয়া হাউস

অল্ডউইচ

লণ্ডন

ডাবলিউ. সি. দুই

কেউ কেউ আরও যোগ করে, ইংল্যাণ্ড। ব্যাস, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীর নানা দেশের নানা ধরনের লোক ডাকবাক্সে ভারত-ভবনের উদ্দেশ্যে চিঠি ছাড়ে।

কিন্তু অত কথা কষ্ট করে না লিখলেও চলে। শুধু, ইণ্ডিয়া হাউস, লণ্ডন, ডাবলিউ. সি. দুই—এই যথেষ্ট। সেই আটতলা বিরাট অট্টালিকার কথা লণ্ডন শহরের কে আর না জানে!

বনেদি আপিস-পাড়া অল্ডউইচে ভারত সরকারের লণ্ডন-দপ্তর। চারপাশ রীতিমতো জমকালো। এ পাশে বুশ্ হাউস, ও পাশে কি একটা বড় বিলিতি আপিস, সামনে অ্যামেরিকান হোটেল—ওয়ালডরফ, তার পাশে অল্ডউইচ থিয়েটার। রঙ্গালয়ের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে নামকরা রাস্তা ড্রুরি লেন।

রাস্তার ধারে ধারে তামাকের দোকান, কাপড়ের দোকান, ওষুধ-পত্র, খেলনা-বই, জামা-কাপড়—কত জিনিসের ছড়াছড়ি। আর এ পাড়ায় পথিকেরও বড় তাড়াতাড়ি। সাধারণত আপিসে হাজির হতে হয় সকাল সাড়ে নটায়। কাজেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে এক

মিনিটও নষ্ট করা চলে না। শুধু কোনরকমে চেনা দোকান থেকে সে-দিনের মতো সিগ্রেট ধাঁ করে কিনে নিয়ে পথিক আপিসে ছোটে। পুরোনো খদ্দের না হলে দোকানদার ভালো সিগ্রেট সহজে দেবে না। গছাতে চাইবে টার্কিশ কিংবা কড়া অ্যামেরিকান সিগ্রেট। কিন্তু মুড়ি-মিছরির এক দর। অর্থাৎ প্লেয়ার্স, গোল্ড ফ্লেক, কেনসিটাসের যা দাম অন্য বিদেশী সিগ্রেটেরও তাই। সুতরাং নতুন ক্রেতা ইতস্তত করে, একটু হেসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দোকানদার বলেছে ভার্জিনিয়া সিগ্রেট নেই—তাকে বিশ্বাস করবার ভান করতেই হবে, কিন্তু ভেতরকার ব্যাপার ক্রেতার অজানা নেই। দোকানদার যা দেবে, ধন্যবাদ দিয়ে তিন-চার দিন তা নিয়ে গেলে ক্রেতা পুরোনো হয়। তারপর হঠাৎ একদিন দোকানদার নিজেই বলে, কী দেব? প্লেয়ার্স?

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কুড়িটা দাও—এমনি করে সেই বিশেষ দোকান থেকে রোজ দরকারমতো সিগ্রেট কিনে লোকবিশেষের ধূমপান সমস্যার সমাধান হয়। একেই সিগ্রেটের দাম বেশি লণ্ডনে, তারপর এই কাণ্ড—তাই যাদের ধৈর্য কম তারা বিরক্ত হয়ে পাইপ ধরে।

আপিসের তাড়া থাকলেও সেই বিশেষ দোকান যদি এ পাড়ায় হয়, তাহলে পথিককে কিছুক্ষণের জন্যে থামতেই হয়। তারপর আবার দ্রুত পা চালাতে হয়—আর কোনো দিকে চোখ দেবার অবসর নেই।

কী ভিড়—কী ভিড়! ভরা টিউব-ট্রেন, ভরা বাস, হনহন করে ছুটছে ছেলে মেয়ে—হাতে একটি করে খবরের কাগজ। ত্রিভঙ্গ-মুরারি হয়ে টিউব-ট্রেনে দাঁড়িয়ে থাকলেও কায়দা করে কাগজ পড়বার চেষ্টা করতে হবেই।

কিন্তু যতই তাড়া থাক না কেন লোকের, ইণ্ডিয়া হাউসের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে তাদের গতি হঠাৎ অনেক হ্রাস হয়ে যায়। আরে এ আবার কি? এমনটি তো আর কোথাও দেখি নি। কাচ ভেদ করে দেখা যায় রঙ-বেরঙের দামী সুন্দর কার্পেট, সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঝলমলে শাড়ি, কাশ্মীরী ছোট গোল টেবিল, হাতির দাঁতের নানা রকম জিনিস। কী সুন্দর! পথিক

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তবু আশ মেটে না—ইচ্ছে হয় ভেতরে ঢুকে আরও ভালো করে সব দেখি। হয়তো আরও কত সুন্দর জিনিস আছে এখানে; কিন্তু এ বাড়িটা কি? আরে—একটু এগিয়ে গিয়ে পথিক দেখে প্রবেশ-পথে সোনালী অক্ষরে লেখা রয়েছে, "ইণ্ডিয়া হাউস"। মাথা তুলে সে আরও দেখে, অনেক উঁচুতে দুলছে ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা।

সময়ে-অসময়ে এমনি অনেক বিদেশী এই সব দেখে-শুনে সটান ঢুকে পড়ে ইণ্ডিয়া হাউসের ভেতরে। বাঃ, বেশ আবহাওয়া তো! মাথার ওপর সিলিংএ খাঁটি দিশি রঙিন ছবি আঁকা। বাঁ দিকে সিঁড়ির কাছে রবীন্দ্রনাথের মর্মর মূর্তি। মার্বেলের মেঝে। সামনে একটু দূরে এক ভারতীয় ভদ্রলোক বসে—তার সামনে একটি ছোট কাঠের বোর্ড—তাতে লেখা রয়েছে, 'এনকোয়ারি'।

আগন্তুক একটু ইতস্তত করে, ভাবে সেই ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবে কি-না। কিন্তু একটু বাধো-বাধো ঠেকে যেন—ভদ্রলোককে শুধু শুধু বিরক্ত করা কি ঠিক হবে। ইংরেজ তো, তাই সব সময় সতর্ক, পাছে কাউকে নিজের অজ্ঞাতে সামান্য বিরক্ত করে ফেলে।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না তাকে। ইংরেজ ম্যাসেঞ্জার গটগট করে তার কাছে এগিয়ে এসে বলে, গুড মর্নিং, কি চাই স্যার?

মর্নিং, ইয়ে, মানে এখানে নাচ-টাচ হয়?

নাচ? চোখ বড় করে ম্যাসেঞ্জার বলে, নাচ-গান হবে কি স্যার? এটা আপিস, ভারতবর্ষের হাই-কমিশনারের ব্যাপার—এখানে কাজকর্ম হয়। নাচ হয় ওই পাশে লাইসিয়াম হলে, কিন্তু সে তো সন্ধ্যেবেলা, হ্যারি রয়ের বাজনা আছে—যাবেন নাকি আজ?

এক প্রশ্নের উত্তরে এত কথা শুনে বেশ হকচকিয়ে যায় আগন্তুক। তাড়াতাড়ি বলে, আমি ভারতীয় নাচের কথা বলছিলাম—

না স্যার, এখানে ওসব কিছু হয় না, তবে ভারতবর্ষ থেকে শিল্পীরা এলে, তারা

মিনিটও নষ্ট করা চলে না। শুধু কোনরকমে চেনা দোকান থেকে সে-দিনের মতো সিগ্রেট ধাঁ করে কিনে নিয়ে পথিক আপিসে ছোটে। পুরোনো খদ্দের না হলে দোকানদার ভালো সিগ্রেট সহজে দেবে না। গছাতে চাইবে টার্কিশ কিংবা কড়া অ্যামেরিকান সিগ্রেট। কিন্তু মুড়ি-মিছরির এক দর। অর্থাৎ প্লেয়ার্স, গোল্ড ফ্লেক, কেনসিটাসের যা দাম অন্য বিদেশী সিগ্রেটেরও তাই। সুতরাং নতুন ক্রেতা ইতস্তত করে, একটু হেসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দোকানদার বলেছে ভার্জিনিয়া সিগ্রেট নেই—তাকে বিশ্বাস করবার ভান করতেই হবে, কিন্তু ভেতরকার ব্যাপার ক্রেতার অজানা নেই। দোকানদার যা দেবে, ধন্যবাদ দিয়ে তিন-চার দিন তা নিয়ে গেলে ক্রেতা পুরোনো হয়। তারপর হঠাৎ একদিন দোকানদার নিজেই বলে, কী দেব? প্লেয়ার্স?

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কুড়িটা দাও—এমনি করে সেই বিশেষ দোকান থেকে রোজ দরকারমতো সিগ্রেট কিনে লোকবিশেষের ধূমপান সমস্যার সমাধান হয়। একেই সিগ্রেটের দাম বেশি লণ্ডনে, তারপর এই কাণ্ড—তাই যাদের ধৈর্য কম তারা বিরক্ত হয়ে পাইপ ধরে।

আপিসের তাড়া থাকলেও সেই বিশেষ দোকান যদি এ পাড়ায় হয়, তাহলে পথিককে কিছুক্ষণের জন্যে থামতেই হয়। তারপর আবার দ্রুত পা চালাতে হয়—আর কোনো দিকে চোখ দেবার অবসর নেই।

কী ভিড়—কী ভিড়! ভরা টিউব-ট্রেন, ভরা বাস, হনহন করে ছুটছে ছেলে মেয়ে—হাতে একটি করে খবরের কাগজ। ত্রিভঙ্গ-মুরারি হয়ে টিউব-ট্রেনে দাঁড়িয়ে থাকলেও কায়দা করে কাগজ পড়বার চেষ্টা করতে হবেই।

কিন্তু যতই তাড়া থাক না কেন লোকের, ইণ্ডিয়া হাউসের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে তাদের গতি হঠাৎ অনেক হ্রাস হয়ে যায়। আরে এ আবার কি? এমনটি তো আর কোথাও দেখি নি। কাচ ভেদ করে দেখা যায় রঙ-বেরঙের দামী সুন্দর কার্পেট, সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঝলমলে শাড়ি, কাশ্মীরী ছোট গোল টেবিল, হাতির দাঁতের নানা রকম জিনিস। কী সুন্দর! পথিক

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তবু আশ মেটে না—ইচ্ছে হয় ভেতরে ঢুকে আরও ভালো করে সব দেখি। হয়তো আরও কত সুন্দর জিনিস আছে এখানে; কিন্তু এ বাড়িটা কি? আরে—একটু এগিয়ে গিয়ে পথিক দেখে প্রবেশ-পথে সোনালী অক্ষরে লেখা রয়েছে, "ইণ্ডিয়া হাউস"। মাথা তুলে সে আরও দেখে, অনেক উঁচুতে দুলছে ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা।

সময়ে-অসময়ে এমনি অনেক বিদেশী এই সব দেখে-শুনে সটান ঢুকে পড়ে ইণ্ডিয়া হাউসের ভেতরে। বাঃ, বেশ আবহাওয়া তো! মাথার ওপর সিলিংএ খাঁটি দিশি রঙিন ছবি আঁকা। বাঁ দিকে সিঁড়ির কাছে রবীন্দ্রনাথের মর্মর মূর্তি। মার্বেলের মেঝে। সামনে একটু দূরে এক ভারতীয় ভদ্রলোক বসে—তার সামনে একটি ছোট কাঠের বোর্ড—তাতে লেখা রয়েছে, 'এনকোয়ারি'।

আগন্তুক একটু ইতস্তত করে, ভাবে সেই ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবে কি-না। কিন্তু একটু বাধো-বাধো ঠেকে যেন—ভদ্রলোককে শুধু শুধু বিরক্ত করা কি ঠিক হবে। ইংরেজ তো, তাই সব সময় সতর্ক, পাছে কাউকে নিজের অজ্ঞাতে সামান্য বিরক্ত করে ফেলে।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না তাকে। ইংরেজ ম্যাসেঞ্জার গটগট করে তার কাছে এগিয়ে এসে বলে, গুড মর্নিং, কি চাই স্যার?

মর্নিং, ইয়ে, মানে এখানে নাচ-টাচ হয়?

নাচ? চোখ বড় করে ম্যাসেঞ্জার বলে, নাচ-গান হবে কি স্যার? এটা আপিস, ভারতবর্ষের হাই-কমিশনারের ব্যাপার—এখানে কাজকর্ম হয়। নাচ হয় ওই পাশে লাইসিয়াম হলে, কিন্তু সে তো সন্ধ্যেবেলা, হ্যারি রয়ের বাজনা আছে—যাবেন নাকি আজ?

এক প্রশ্নের উত্তরে এত কথা শুনে বেশ হকচকিয়ে যায় আগন্তুক। তাড়াতাড়ি বলে, আমি ভারতীয় নাচের কথা বলছিলাম—

না স্যার, এখানে ওসব কিছু হয় না, তবে ভারতবর্ষ থেকে শিল্পীরা এলে, তারা

কবে কোন হলে নাচবেন সেকথা লিখে আমরা ওই বিজ্ঞাপন-বোর্ডে সেঁটে দি ; কিন্তু দুঃখিত স্যার, এখন অমন কোন ব্যাপারের সম্ভাবনা নেই।

ও, কিন্তু আর কি আছে এখানে ? ওই কার্পেট, হাতি, বাঘ—ওগুলো কেনা যায় ?

না স্যার, ওগুলো সাজিয়ে রাখবার জন্যে, না হলে আপনাদের মতো পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো কেমন করে ? তবে ওপরে ভালো লাইব্রেরি আছে। চলে যান সটান দোতলায়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বই পাবেন সেখানে।

না ধন্যবাদ, আজ থাক। বইএর ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখা যায় না আগন্তুকের। সন্তর্পণে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে যায়।

আর-এক ইংরেজ ম্যাসেঞ্জার টম্ এসে জিজ্ঞেস করে সঙ্গীকে, কে এসেছিল হে ? ইংরেজ বলে মনে হলো যেন ?

আরে হাঁ, সকাল বেলা বাছাধন নাচ দেখতে এসেছিলো ইণ্ডিয়া হাউসে। লাইব্রেরির নামে সরে পড়লো।

নাচ ? বল কি হে !

আরে হ্যাঁ।

এমনি অনেক বিদেশী দিনের মধ্যে অনেকবার ইণ্ডিয়া হাউসে হানা দেয়। কিংস্ কলেজ আর লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের ছাত্রছাত্রীরা নিয়ম করে দল বেঁধে লাঞ্চ খেতে আসে এখানে। তাছাড়া অসংখ্য ভারতীয় লোকের ভিড় তো লেগেই আছে। কত লোকের কত কাজ ইণ্ডিয়া হাউসে। কারুর কণ্টিনেণ্ট যাবার 'ভিসা' করে দিতে হবে, কাউকে ব্যবসার সুযোগ দিতে হবে, কাস্টমস্ থেকে কারুর মাল ছাড়িয়ে আনতে হবে, কাউকে চাকরির সন্ধান দিতে হবে। এমনি অনেক ব্যাপারে ভারতীয়দের আসতে হয় ইণ্ডিয়া হাউসের নানা বিভাগে অনেক বার। কেউ কেউ মোটঘাট নিয়ে দেশ থেকে লণ্ডনের মাটিতে পা দিয়েই সটান চলে আসে ইণ্ডিয়া হাউসে। এসেই বলে, ঘর আছে তো ? এখানেই থাকবো বলে এলাম—

তার কথা শুনে ঘাবড়ে যান অ্যাকোমোডেশন্ অফিসার। ভদ্রলোক বাঙালী। তিনি হঠাৎ-আসা ভদ্রলোককে অনেক কষ্টে বোঝান যে এটা হোটেল নয়, যদি তিনি খবর দিয়ে আসতেন তাহলে কোনো হোটেলে তাঁর থাকবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারতেন তিনি।

কিন্তু আগন্তুক নাছোড়বান্দা। বলে, আমি ভারতবাসী, নতুন লোক, কিছু জানি না, কাউকে চিনি না, বেটাদের কথা বুঝতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। আমার থাকা-খাওয়ার সামান্য ব্যবস্থা না করতে পারলে এত খরচ-পত্তর করে এই বিদেশে-বিভুঁয়ে তোমাদের এত বড় আপিস চালাবার মানে কি হে?

অ্যাকোমোডেশন্ অফিসার ঘোষ সাহেব দেখেন ব্যাপার বেগতিক। মনে মনে এনকোয়ারি অফিসারের মুণ্ডুপাত করেন। যাকে তাকে হুপ করে তাঁর ঘরে ঠেলে দেবার মানে কি।

যাহোক আগন্তুককে অনেক বুঝিয়ে কোনো হোটেলে পাঠিয়ে দেন তিনি। কিন্তু তাই করে কি রক্ষে আছে। হোটেলওয়ালা পরদিন নালিশ জানায়, কাকে পাঠিয়েছ হে? বাথরুমে টবে জল ভরে, ফ্লোরের ওপর দাঁড়িয়ে মাথায় ঘটি-ঘটি জল ঢেলে চান করেছে, জল পড়ে নিচেব ঘরের কার্পেট আর অন্য জিনিস ভিজে গেছে—এখন দণ্ড দাও—আর এমন লোক পাঠালে ভবিষ্যতে আমাদের হোটেলে আমরা আর ইণ্ডিয়ান নেবো না।

ঘোষ সাহেব মাথায় হাত দিয়ে ভাবেন এখন কি করা যায়। কিন্তু পরদিন আবার এসে হাজির হয় সেই ভদ্রলোক। বলে, খুব দেখালে সাহেব তোমাদের বিলেত! এখন টিকিট কেটে দাও, প্লেনে ফিরে যাবো দেশে, এ হতচ্ছাড়া দেশে আর বেশিদিন নয় বাবা—

মালপত্র ইণ্ডিয়া হাউসের সাহায্যে পাঠাতে বলে ভদ্রলোক সত্যি দেশে ফিরে যায়। ইণ্ডিয়া হাউসে যারা চাকরি করে, এমন অনেক উপরি কাজ প্রায়ই তাদের ঘাড়ে এসে পড়ে। কোনো ভারতীয় ছাত্র ল্যাণ্ডলেডির মেয়েকে বিয়ে করবে বলে তার সর্বনাশ করে দেশে পালিয়েছে তার খোঁজ করা, কে হোটেল-ওয়ালাকে মেরেছে তার ব্যবস্থা করা, কোন ভারতীয়কে রেস্টুরেণ্ট সার্ভ

সোমনাথ ব্যানার্জি সেইদিকে তাকিয়ে চার্টম্যান নম্বর ওয়ান সিগ্রেট খুব আস্তে আস্তে খাচ্ছিলো। অন্য সোফায় আর-একটি ইংরেজ মেয়ে বোধহয় কারুর জন্তে অপেক্ষা করছিলো ; কারণ পায়ের শব্দ শুনলেই বার বার ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছিল সে। অন্য আর একদিকে ইণ্ডিয়া হাউসের তুজন অবাঙালী চাকুরে ফিসফিস করে কি পরামর্শ করছিলো যেন। কাজেই ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলবার আজ আর কেউ নেই। সে একবার মেয়েটিকে দেখছিলো, মাঝে মাঝে সেই অবাঙালীদের দিকে চোখ ফেরাচ্ছিলো, তারপর রাস্তার দিকে তাকিয়ে আপন মনে সিগ্রেট টানতে টানতে চুপ করে একা বসেছিলো। এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের মতো সেখানে এলো অনঙ্গ দাশ।

খবর শুনেছো ব্যানার্জি ? ধপ করে তার পাশে বসে পড়ে অনঙ্গ বললো, চঞ্চল বিয়ে করেছে—

ব্যানার্জি খুব বেশি অবাক হলো না। স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে জিজ্ঞেস করলো, তাই নাকি ?

আরে হ্যাঁ, আজ এইমাত্র খবর শুনে ছুটতে ছুটতে আসছি, ছোকরার সঙ্গে দেখা হলে ঠাসঠাস করে তু গালে চড় মারবো আগে তারপর অন্য কথা।

মারবে কেন তাকে ?

উঃ এত করে বারণ করলাম কিছুতেই কথা শুনলো না—শেষ অবধি সাদা মেয়ে বিয়ে করে বসলো। ব্যাস এবার কিছুদিন মেমসাহেব নিয়ে খুব হৈ হৈ করবে, তারপর গণ্ডগোল ডিভোর্স, থানা-পুলিস—বড় ঘরের ছেলে হয়ে কিনা এই দোকানদারের দেশে কুকুর-বেড়ালের মতো দিন কাটাবে! ব্যানার্জি অনঙ্গ দাশের কথায় যেন একটু আঘাত পেলো। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ না করে বললো, কিন্তু এখন অত কথা তুলে কি হবে, বিয়ে যখন হয়ে গেছে তখন শুধু-শুধু ওকে তুঃখ দেওয়া হবে—

তুঃখ ? অনঙ্গ দাশ হঠাৎ যেন খেপে উঠলো, বাঁদর একবার আমার সঙ্গে পরামর্শ করলে তো পারতো—আরে বাপু, আমরা এতদিন আছি এখানে। পরামর্শ করে কেউ এমন বিয়ে করে না দাশ।

ছি ছি ছি, চঞ্চলের মতো সোনার টুকুরো ছেলে, তার কিনা এমন কাজ—কত ভালো মেয়ে পেতে পারতো দেশে, কাকে না কাকে দুম করে বিয়ে করে বসলো। এখন না পারবে ফেলতে—না পারবে সারা জীবন মিলেমিশে থাকতে। আর বিয়ে করবার দরকার ছিল কি, এদেশে মেয়ের অভাব? যতদিন এদেশে আছে, ততদিন একসঙ্গে থেকে ফেরবার সময় বিদেয় করে দিলেই তো পারতো। এখানে তো আর সতীত্বের বালাই নেই, কিছু ক্ষতি হতো না মেয়ের—আর এক ছোঁড়া যোগাড় করে নিতো দু-একদিন পরেই।

অনঙ্গ দাশ একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে সহজে থামতে চায় না। আর কোথায় কতটা বলা উচিত সে কথাও ভেবে দেখে না। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যেখানে সেখানে যা খুশি বলে যায় অনঙ্গ দাশ। সুখের বিষয় যারা তাকে জানে তারা শুধু হেসে তার কথায় সায় দেয়, আর যারা চেনে না তারা রেগে যায়, তর্ক করে—শেষ অবধি মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয় দুজনের। এই ইণ্ডিয়া হাউসেই অনেকে আসে যাদের বাক্যালাপ নেই দাশের সঙ্গে। কেউ কেউ তাকে বলে পাগল, কেউ বলে অতি বাজে লোক, আর কেউ কেউ আবার তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে বলে, ও যা বলে একেবারে খাঁটি কথা। সাতাশ বছর আছে এদেশে, ওর কথার কি কোনো দাম নেই? ভুক্তভোগী লোক বাপু অনঙ্গ দাশ।

পাছে আবার আজ ইণ্ডিয়া হাউসে কি বলতে কি বলে ফেলে অনঙ্গ দাশ, তাই তাড়াতাড়ি সোমনাথ বললো, কিন্তু চঞ্চল আজ আসে নি আপিসে? তাকে দেখছি না তো!

সে কি সহজে আসবে? হনিমুন চলবে কতদিন। মেমসাহেবকে মাথায় নিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরবে তাই ভেবে পাবে না ছোকরা। চতুর্দিকে গল্প করে বেড়াবে বউএর—আহা, এমন আর হয় না, কী গুণের মেমসাহেব—কোথায় লাগে বাঙালী মেয়ে এর কাছে। বুঝলে বাঁড়ুজ্জে—অনঙ্গ দাশ খুক খুক করে হাসলো, থাকবে যতদিন এদেশী মেয়ে ততদিন তো সব করবে—ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা—কি নয়? তাই দেখে ভারতবর্ষের সুসন্তানরা সব দুর্গা বলে কাত! মেমসাহেব তার মতো কেলে-কুচ্ছিতকে মাথায় নিয়ে নাচছে

আর মেটাকে পায় কে! কিন্তু যখন ছাড়বে বিনা নোটিসে—হি হি হি—ব্যাস, তখন মজা দেখ—ভারতবর্ষের সুসন্তানরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে গোঙাবে—কাম ব্যাক ডার্লিং কাম ব্যাক। আর ডার্লিংটি যে মুখ দিয়ে একদিন বলেছিলো, প্রিয়তম, আজ সেই মুখ দিয়ে বেশ দরদ দিয়ে বলে যাবে, ব্ল্যাক বাসটার্ড—

আঃ দাশ, সোমনাথ সেই ইংরেজ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললো, চুপ করো।

কেন কেন? তোমার আবার লজ্জা হল যে? গায়ে বড় বেশি বিঁধছে বুঝি? আমাদের তো গণ্ডারের চামড়া—ভয় কি বাপু? এইবার সেই মেয়েটিকে হঠাৎ বললো দাশ, কি গো সুন্দরী? হ্যালো, ওয়েটিং ফর ইউর বয়-ফ্রেণ্ড?

অনঙ্গ দাশের কথা অনেকক্ষণ ধরে শুনছিলো মেয়েটি। ভাষা বুঝতে না পারলেও তার গলার স্বর আর হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি দেখে সে বেশ মজা পাচ্ছিলো।

অনঙ্গ দাশের প্রশ্ন শুনে মেয়েটি হেসে বললো, হ্যাঁ।

কে—ভাগ্যবানটি কে?

মেয়েটি আবার হেসে বললো, অমল।

অমল? ওহো মানে আমাদের অমল দত্ত? শোন শোন বাঁড়ুজ্জে—অমল দত্তও গার্ল ফ্রেণ্ড জুটিয়েছে। তা আর জোটাবে না কেন? এ দেশে তো কানা-খোঁড়ারও গার্ল-ফ্রেণ্ড থাকে—

আঃ তুমি থামো দাশ।

সে কথায় কান না দিয়ে অনঙ্গ দাশ মেয়েটিকে বললো, কোন্ দেশের মেয়ে তুমি মা-লক্ষ্মী—জার্মান তো?

হ্যাঁ, কি করে বুঝলে?

বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি—সাতাশ বছর আছি এদেশে, বুঝেছো? তোমাদের মতো অনেক মা-লক্ষ্মীর দেখা-সাক্ষাৎ পেয়েছি কিনা। জার্মান না হলে অমল দত্তর মতো গুণবান ছোঁড়ার দর্শন লাভের আশায়, মরতে ইণ্ডিয়া হাউসে আসবে কেন সতীলক্ষ্মী!

অনঙ্গ দাশের কথা সম্পূর্ণ বুঝতে না পেরে মেয়েটি বললো, পার্ডেন?

থাক থাক আর সব কথা বুঝে কাজ নেই—খুব হয়েছে।—এই যে এসো এসো, অমল দত্তকে দেখে দাশ চিৎকার করে উঠলো, বাহাদুর এসো—একে বসিয়ে রেখে আর কার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলে বাপু? এ যে দেখছি সেয়ানে-সেয়ানে—।

অমল দত্ত একটু বিরক্ত হয়ে বললো, কি সব সময় যা-তা বকেন? থামো ছোকরা! বলি তোমার মতো গাধা ফেঁসে গেলে ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি জানি তুমিই চঞ্চলকে ফাঁসিয়েছ—

তাতে আপনার কি? অমল দত্ত উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়ে মেয়েটিকে হেসে বললো, হ্যালো ইংগে, অনেকক্ষণ বসে আছো বুঝি?

হ্যাঁ, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

অফিসের কাজে একটু বেরোতে হয়েছিলো। আই অ্যাম রিয়েলি সরি। চলো তাড়াতাড়ি—ক্যানটিন বন্ধ হয়ে গেলে মুশকিলে পড়বো—

অমল আর ইংগে লিফটের কাছে এসে লিফটম্যানকে বললো,—সেভেন্থ্ ফ্লোর প্লিজ—

আটতালায় ক্যানটিন।

লাঞ্চ খেয়ে ইংগে চলে যাবার পর অমল দত্ত আবার ফিরে এলো লাউঞ্জে। এখনও তার আর কিছুক্ষণ অবসর। ভাগ্যিস অনঙ্গ দাশ চলে গেছে।

আমি তোমারই অপেক্ষা করছি অমল, খুব আস্তে আস্তে সোমনাথ বললো।

তার পাশে বসে প্লেয়ার্স সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে অমল বললো, বলুন!

চঞ্চল কেমন আছে?

ভালো, হেসে অমল বললো, আসছে সপ্তাহে আপিসে আসবে।

এখানেই আছে না বাইরে গেছে?

বাইরে যাবে ভেবেছিলো কিন্তু ওদিকে আর-একটা মুশকিল হয়েছে—অমল দত্ত সিগ্রেট টানতে গিয়ে থেমে গেলো।

কি মুশকিল ?

ওর বাবা এ খবর শুনলে নাকি রেগে গিয়ে আর টাকা পাঠাবেন না, তাই ওরা আগে থেকেই খরচের ব্যাপারে সাবধান হতে চায়।

তিনি প্রথমে অবাক হবেন বটে, কিন্তু—

তিনি শুধু অবাক হবেন না, রেগে যাবেন। আর ছেলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না—চঞ্চল ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আর একটি পয়সাও আশা করে না।

কি যেন ভেবে সোমনাথ বললো, দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বোধ হয় না, আস্তে আস্তে অমল বললো, চঞ্চলের বাবাকে আমি চিনি না কিন্তু তার মুখ থেকে শুনলাম তিনি নাকি অত্যন্ত কঠিন প্রকৃতির লোক, আর এসব ব্যাপারে তাঁর এতটুকুও সায় নেই।

আবার হাসলো সোমনাথ, দেখা যাক! অমলের দিকে তাকিয়ে সে বললো, মেয়েটি তো ভালোই।

খুব ভালো। তাছাড়া লেখাপড়া জানে। একটু থেমে আবার ও বললো, চঞ্চলের মতো ছেলে যখন এদেশে বিয়ে করলো তখন আপনি তো বুঝতে পারেন মিঃ ব্যানার্জি, সে-মেয়ে খুব সাধারণ হবে না।

সোমনাথ উত্তর দিলো না।

ইণ্ডিয়া হাউসে লাঞ্চের সময় বারোটা থেকে দুটো। ঠিক ধরাবাঁধা কোনো সময় নেই। ওই সময়ের মধ্যে যে যার খাওয়া সেরে নেয়। দু-দশ মিনিট এদিক ওদিক হলে কিছু যায় আসে না। অমলের ওঠবার সময় হলো। সিগ্রেটে শেষ টান দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। সোমনাথেরও সময় হয়ে গেছে কিন্তু তার যেন আজ উঠতে ইচ্ছে করছে না। অনেক দিন পর এই ক্লান্তিকর একটানা জীবনে সহসা যেন কোথা থেকে ছিটকে পড়লো আলস্যের হালকা টুকরো, আর অকারণে তার চোখ বুজে এলো।

সে তো আজকের কথা নয়। তবু চঞ্চলের কথা শুনে অনেক কথা মনে ভিড় করে। এমনি হয়—হয়তো চঞ্চলও সুদূর ভবিষ্যতে একদিন তার মতো চোখ

বন্ধ করে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখবে—আর কী পাবে তখন ? কিন্তু থাক, এই শুভমুহূর্তে সেকথা ভেবে কাজ নেই।

সোমনাথ ব্যানার্জি গম্ভীর প্রকৃতির লোক। চঞ্চলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার অনেকবার নিজের যৌবনের কথাই মনে পড়েছে। অমল যেমন একটু আগে বলে গেলো, চঞ্চলের মতো ছেলে যখন এদেশে বিয়ে করলো, তখন আপনি তো বুঝতে পারেন মিঃ ব্যানার্জি, সে মেয়ে খুব সাধারণ হবে না—অনেকদিন আগে ঠিক এমনি কথা বলেছিলো সোমনাথের বন্ধুবান্ধব। না অ্যানালিসা যে সাধারণ মেয়ে নয় সেকথা মনেপ্রাণে মানে সোমনাথ। যদি সাধারণ মেয়ে হতো তাহলে দারিদ্র্যের ভারে ম্লান সেই দিনগুলি কিছুতেই সে হাসিমুখে বরণ করে নিতো না।

সোমনাথ কিন্তু স্বপ্ন দেখে নি। সে বাস্তবকে মেনে নিতে চেয়েছিল। গ্লাসগোতে চার বছর কাটিয়ে যখন সে এনজিনীয়ারিং-এর ডিগ্রি পেলো, তখন সে তার অনেক বন্ধুবান্ধবের মতো বেশ বড়ো চাকরি নিয়েই দেশে ফিরে যেতে পারতো। কোনো বাধা ছিলো না, কোনো মধুর আকর্ষণও ছিলো না এদেশে।

কারণ সামান্য। তবু অকস্মাৎ সেই সামান্য কারণেই তার জীবন—তার সব কিছুই যেন বদলে গেলো। এদেশে চিরকাল থাকবার কথা কোনোদিনও মনে হয় নি সোমনাথের—এমন কথা স্বপ্নেও সে ভাবতে পারে নি।

পাশ করে যখন সে ফিরবো-ফিরবো করছে তখন ভাইএর চিঠি এলো। বেশ কঠিন চিঠি। দেশের একমাত্র আকর্ষণ সোমনাথের মা আর ইহলোকে নেই। সে-খবর দিয়ে ব্যবসায়ী ভাই লিখেছে, সোমনাথের বিলেতে থাকবার জন্যে অনেক খরচ হয়েছে, আর ভাই শুধু তার জন্যে করেছে দুঃখভোগ। এখন সে বিয়ে করেছে এবং তার সংসারের খরচ বাড়ছে দিনে দিনে। কাজেই পৈত্রিক বাড়িতে সোমনাথের অংশ থাকলেও ভাই আশা করে ন্যায়ের খাতিরে সোমনাথ বাড়ির জন্যে কোনো দাবি জানাবে না। ভাই আরও লিখেছে, এ বিষয়ে দু-এক লাইন লিখে দিলে সে খুশী হবে। অবশ্য সোমনাথ ফিরে এসে সে-বাড়িতে উঠতে পারে।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। সোমনাথ চিঠি পড়ে মায়ের জন্তে ছেলে মানুষের মতো কাঁদলো, ভাইএর বৈষয়িক বুদ্ধির কথা ভেবে মনে মনে হাসলো। ছু-এক দিনের মধ্যে উত্তর লিখলো, বাড়ি যেন ভাই নির্বিঘ্নে ভোগ করে, সোমনাথ কোনোদিনও কোনো দাবি জানাবে না, আর আপাতত দেশে ফিরবে না সে—কখনও ফিরলেও সে-বাড়িতে উঠে ভাইএর সাংসারিক শান্তি ভঙ্গ করবে না।

সেই চিঠির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সঙ্গে সম্পর্কে চুকে গেলো সোমনাথের। তখন লণ্ডনে সে চাকরির চেষ্টা করতে লাগলো। আর এমনি সময় নানা কথা মনে হতে লাগলো তার। ফেরবার প্রয়োজন কি? কেনই বা ফিরতে হবে তাকে? এই কবছরে সে অনেক জেনেছে অনেক দেখেছে, বন্ধু-সংখ্যাও বেড়েছে অনেক, তারা তার কোনো আত্মীয়র চেয়ে কম নয়। সোমনাথ লণ্ডনে চাকরির চেষ্টা করতে লাগলো। একেবারেই সে ভারতবর্ষে ফিরবে না, তেমন কথা সে ভাবলো না, সে-ইচ্ছা তোলা রইলো ভবিষ্যতের জন্তে। দূরে থেকেই এখন দেশের সেবা করবে। এদেশের লোককে জানাবে ভারতবর্ষের আচার-ব্যবহার আর সংস্কৃতির কথা—চেষ্টা করবে ইউরোপ আর ভারতবর্ষের কৃষ্টির বিনিময়ের! তাছাড়া যখন ভারতবর্ষ থেকে সে প্রথম এসেছিলো, তখন তার মন ছিলো আজকের চেয়ে অনেক সংকীর্ণ, কিন্তু আজ তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশের কত জীবন্ত মানুষের! তারও জীবনের পরিধি আস্তে আস্তে বেড়ে গেছে। কাজেই এখন যেখানেই থাকুক, কোনো বিশেষ দেশের কথা মনে করে ব্যাকুল হবে না সে। আরও প্রসারিত করবে নিজের মন। খুব উৎসাহের সঙ্গেই থেকে গেলো সোমনাথ। কিন্তু যত সহজে সে চাকরি পাবে ভেবেছিলো তত সহজে চাকরি জুটলো না তার। একেই সে ভারতীয়, তার ওপর রঙ তার ফর্সা নয় বরং বেশ কালো। বিদেশীর পক্ষে সে-সময়ে লণ্ডনে চাকরি জোটানো বেশ কঠিন ছিলো বৈকি! বাড়ি থেকেও আর টাকা আসে না। অর্থাভাব সোমনাথকে দিশাহারা করে তুললো। তবু ক্লান্তি এলো না তার, বরং কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা বেড়ে গেলো। শুধু একবার নয়,

এই লণ্ডনেই বার বার সোমনাথ দেখেছে, মনের জোর থাকলে সব সমস্যার সমাধান যেন আপনার থেকে হয়ে যায়। এবারেও হয়ে গেলো। অ্যানালিসার সঙ্গে আলাপ হলো তার। আর তারপর অভাব-অভিযোগ আর দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও একদিন সোমনাথ বুঝতে পারলো, এবার ঘর বাঁধতেই হবে। জার্মান মেয়ে অ্যানালিসা। দেখা গেলো সোমনাথের সঙ্গে তার বড় মতের মিল। তাই মনের মিল হতেও বাধা রইলো না। আর এর মধ্যে এক বিলাতি কারখানায় সোমনাথের একটা ছোটোখাটো চাকরি জুটে গেলো। ব্যাস, তখন সোমনাথের মনে হলো এবার সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে তার। অ্যানালিসাকে নিয়ে সে ঘর বাঁধলো। কিন্তু তারপর ···

আজ আর নয়। ইণ্ডিয়া হাউসে বসে সোমনাথ দেখলো প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে! তিনটে বাজে। কারখানায় ফিরে না গেলেই নয় এবার।

এত কথা এত সহজে আজকাল আর সোমনাথের মনে পড়ে না।

আজ চঞ্চলের কথা শুনে তার শুধু নিজের অতীতের কথা মনে পড়ছে বার বার।

চঞ্চলের অনেক কিছু যেন তার নিজের মতো।

মঙ্গলবার

হ্যাম্পস্টেড অঞ্চলে নাকি শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস। ব্যারিস্টার, লেখক, বড় উকিল, অধ্যাপক—এমনি অনেকের বাড়ি এ পাড়ায়। নির্জন পাড়া। বেশ বড়। গোটা তিনেক টিউব স্টেশন সমস্ত হ্যাম্পস্টেড অঞ্চলে।

চঞ্চল ফ্ল্যাট নিয়েছিলো ফেয়ার হেজেল গার্ডেনসএ। টিউব স্টেশনের নাম ফিঞ্চলে রোড। স্টেশনের সামনেই জন বার্নস্-এর বড় দোকান। সেখানে প্রয়োজনীয় সব রকম জিনিস পাওয়া যায়। দোকানের পাশ দিয়ে টানা রাস্তা গ্রীনক্রফট গার্ডেনস—গিয়ে পড়েছে ফেয়ার হেজেল গার্ডেনসএ। বাঁ দিকে একটু হাঁটলেই চঞ্চলের ফ্ল্যাট। নির্জন রাস্তা। আশেপাশে কোনো কোলাহল নেই। বাস-ট্যাক্সি-টিউবের গণ্ডগোল জন বার্নস-এর দোকানের সামনে—ফিঞ্চলে রোডের ওপর। তা ছাড়া সারাদিন অন্য কোথাও গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ বড় একটা পাওয়া যায় না—শুধু খুব ভোরে গয়লার গাড়ির ঘোড়ার খুরের প্রচণ্ড আওয়াজ।

ফিঞ্চলে রোড টিউব স্টেশনের আশেপাশে সবগুলি রাস্তার নামের পাশে একটি করে গার্ডেনস যোগ করা আছে। ফেয়ার হেজেল গার্ডেনস, গ্রীন ক্রফট গার্ডেনস, অ্যাবারডেভ গার্ডেনস, আরও কত তার ঠিক নেই।

রাস্তার ধারেকাছে ফুল-ফল-গাছপালার ভিড় না থাকলেও চলতে চলতে সহসা চোখে পড়ে ছোট একটি গাছ কিংবা কারুর বাড়ির সামনে বসন্তের ফুলে ভরা ছোট একটুকরো জমি, আর মনে হয় সার্থক রাস্তাগুলির নাম। গার্ডেনস ছাড়া আর কী নামই বা দেওয়া যেতো এই টানা নির্জন ফাঁকা পথগুলির! বেশ লম্বা রাস্তা ফেয়ার হেজেল গার্ডেনস। মাঝামাঝি জায়গায় চঞ্চলের ফ্ল্যাট —এক তলায় শুধু দুটি ঘর। ভাড়া দিতে হয় সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড।

চঞ্চল এ ফ্ল্যাট নিয়েছে খুব সম্প্রতি—বিয়ের ঠিক আগে। তার আগে তার ফ্ল্যাটের কোনো দরকার ছিলো না—হ্যামারস্মিথের প্রাইভেট বোর্ডিং হাউসে নির্ভাবনায় বাস করে এসেছে এতদিন।

চঞ্চলের বিয়ে হঠাৎ হয় নি। মারিয়াকে যে সে এমনি করে বিয়ে করে ফেলবে সেকথা সে আলাপের সময় ভাবতে পারে নি। কত মেয়ের সঙ্গেই তো লণ্ডনে মানুষের রোজ আলাপ হয়। কিন্তু বিয়ে করে সংসার সাজায় কজন!

আজ চঞ্চল বার বার ধন্যবাদ দেয় অমল দত্তকে। তারই জন্যে এই পরিণতি। দেশে থাকতেই অমলের সঙ্গে চঞ্চলের আলাপ। একই জাহাজে বছর দু-এক আগে ওরা বিলেতে এসেছে। এখানে এসেই অমল দত্ত চাকরি নিলো ইণ্ডিয়া হাউসে। চঞ্চলকে জানালো, দেশে থাকতে অনেক পড়াশুনো করেছি, এখানে ওসব করবার বিশেষ ইচ্ছে নেই। তবু একবার চেষ্টা করবো, মানে চাকরি করতে করতে ইভনিং ক্লাশ করবো ইকনমিক্সের। যদি এক ঢিলে দু পাখি মারতে পারি তো বাহাদুরি, আর না পারলেও ক্ষতি নেই, বাবার টাকা তো নিচ্ছি না।

চঞ্চল জিজ্ঞেস করেছিল, দেশে ফিরবে না?

পরের কথা পরে হবে—কোনো তাড়া নেই।

যাক তাহলে অমল দত্তর প্রোগ্রাম করাই আছে। চঞ্চলের ব্যাপারটা আবার উল্টো, মানে তাকে পড়াশুনো করতেই হবে। ইচ্ছেমতো বিষয় নির্বাচন করলে চলবে না—ব্যারিস্টারি পড়তেই হবে। কঠিন অ্যাডভোকেট বাপের মতের বিরুদ্ধে চলবার ক্ষমতা চঞ্চলের নেই। তাঁর ইচ্ছে, ছেলে বড়ো ব্যারিস্টার হয়ে তাঁর নাম ভালো করে রাখে। চঞ্চল অবশ্য ভেবেছিলো অন্য রকম। যদি ইংরেজী সাহিত্যে, অক্সফোর্ড কিংবা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারতো তাহলে তার চেয়ে সুখের তার কাছে আর কিছু থাকতো না। কিন্তু সেকথা মুখ ফুটে বাপকে বলে কে! আর বললেও কথা থাকবে না। যদি চঞ্চলের মা থাকতেন তাহলে কি হতো সেকথা আজ বলা কঠিন। কিন্তু

যিনি নেই তাঁর কথা ভেবে আর লাভ কি ! তবু মাঝে মাঝে কারণে অকারণে চঞ্চলের মনে হয়, আজ যদি তার মা বেঁচে থাকতেন !

যাহোক চঞ্চল বিলেতে এলো ব্যারিস্টারি পড়তে এবং যথারীতি লিনকনস্ ইনে বেশ মোটা টাকা খরচ করে ভর্তি হলো। অবশ্য অমল দত্ত তাকে প্রথম থেকেই বলে যাচ্ছে, আর বাপু, এমন কিছু পড়াশুনোর চাপ নেই ব্যারিস্টারির—ইণ্ডিয়া হাউসে ঢুকে পড়ো। কিন্তু চঞ্চল তখন ইতস্তত করেছিলো। বাবা হয় তো চাকরি করায় মত দেবেন না। পয়সার অভাব কি তার। বড় লোকের একমাত্র ছেলে চঞ্চল। ছেলে বিলেতে ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি করছে শুনলে বাপের মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগতে পারে। তাই নানা কথা ভেবে অমলের কথায় রাজী হয় নি চঞ্চল। তার চেয়ে যা তার ছেলেবেলার রোগ, আর যার জন্যে বাপের কাছ থেকে কেবলই খোঁটা খেয়েছে আর বাধা পেয়েছে—এখানে নিশ্চিন্ত মনে অবসর সময়ে সেই সাহিত্য-চর্চা করা যাবে। সাহস করে মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে না পারলেও বিলেতে আসবার সময় চঞ্চলের আসল উদ্দেশ্য ছিলো তাই। সে নানা ভাবে ইউরোপকে দেখবে আর পাঠককে জানাবে তার মতামত। কিন্তু সেকথা বাবা জানতে পারলে হয়েছিলো আর কি ! শুধু বাবা কেন, সাহিত্য করতে বিলেতে যাচ্ছি—একথা শুনলে দেশের কে আর না হেসে থাকতে পারে ! তাই চঞ্চল কাউকেই একথা জানায় নি। জানাবার মতো কথা তো নয়।

লিনকনস্ ইনে ভর্তি হবার পর প্রায় রোজই চঞ্চল একবার করে ইণ্ডিয়া হাউসে আসতো। প্রথমে কাজ না থাকলেও আসতো অমলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। তারপর আলাপ হলো অনঙ্গ দাশ আর সোমনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে, পরিচয় হলো ইণ্ডিয়া হাউসের আরও অনেক অফিসারের সঙ্গে, দিনে দিনে প্রবাসের এই পরিচয়ের মাত্রা বাড়তে লাগলো। আর আশ্চর্য, যেন সকলে ভালোবেসে ফেললো চঞ্চলকে।

কিন্তু আসল পরিচয় হলো প্রায় এক বছর পর। সেকথা মারিয়ার সঙ্গে প্রায়ই চঞ্চল আলোচনা করে। সেকথা কি ভোলা যায় !

গত বছরের কথা। এপ্রিল মাস। তুষারের আবরণ সবে সরে গেছে। রাত্তিরে মৃদু শিশির ঝরলেও ফুলে ফুলে গাছ ভরে গেছে। পথ চলতে চলতে দূরে কোথায় পাখির ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় আনমনা পথিক। আর অলস স্তিমিত মধ্যাহ্নে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রাণপণে সূর্যকে খোঁজে প্রেমিক-প্রেমিকার দল।

ইণ্ডিয়া হাউসে অমলের জন্যে অপেক্ষা করছিলো চঞ্চল। সাড়ে পাঁচটা বাজতে মিনিট কয়েক বাকি। একটু পরেই ছুটি হবে অমল দত্তর।

চঞ্চল প্লেয়ার্স ধরালো।

এই যে ঠিক হাজির হয়েছো, অনঙ্গ দাশ একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলো, ছুটিতে রোজ রোজ যাও কোথায় ?

এই একটু বেড়াই আর কি—

তা ও বোকাটার সঙ্গে বেড়িয়ে কি হবে ? কোন ঝিয়ের খপ্পরে নিয়ে ফেলবে। বিপদে পড়ে যাবে। আরে এই শ্যামসুন্দর ঠায়রো ঠায়রো, অনঙ্গ দাশ শ্যামসুন্দরকে ধরতে ছুটে গেলো।

আজ কোথায় যাবে অমল ?

চলো ক্লাবে।

সেখানে গিয়ে কী হবে ? ঠায় চুপ করে বসে আজেবাজে বক্তৃতা শুনতে ভালো লাগে না।

ওপরে না গেলেই হলো। নিচে বসে আড্ডা মারা যাবে। কিন্তু আগে চলো, এক কাপ চা খাই, বড়ো তেষ্টা পেয়েছে।

তাই চলো।

ইণ্ডিয়া হাউস থেকে বেরিয়ে ডান দিকে কয়েক পা হেঁটে ওরা কিংসওয়েতে পড়লো। তারপর আর একটু হেঁটে হবোর্ন টিউব স্টেশনের কাছে 'লাফিং কাউ' চায়ের দোকানে ঢুকলো চা খেতে।

কাছেই ছোটো ক্লাব। ছাত্রছাত্রীদের ভিড় বেশি। এখানে চঞ্চলের এই প্রথম আসা নয়। এর আগেও অমলের সঙ্গে দু-একবার এসেছে সে। আজ

আস্তে আস্তে হেঁটে মিউজিয়াম-এর পাশ দিয়ে যখন তারা সেখানে পৌঁছলো তখন ওপরে পুরোদমে বক্তৃতা আরম্ভ হয়ে গেছে।

বাঁচা গেলো, রেইন-কোট হাতলে রেখে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে চঞ্চল বললো।

নিচের ঘরে তখন আর কেউ নেই শুধু একজন মেয়ে (চেহারা দেখে মনে হয় ফরাসী) খুব মন দিয়ে কী একটা পড়ছে। চঞ্চলের গলার স্বর শুনে মাথা তুলে তাকালো। চোখাচোখি হলো দুজনের কিন্তু কেউই যেন চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না।

হ্যাল্লো মারিয়া! তাকে দেখে খুশীতে প্রায় চিৎকার করে উঠলো অমল, অনেকদিন দেখি নি, কেমন আছো ?

খুব অসুখ করেছিলো আমার, মধুর ফরাসী উচ্চারণে মারিয়া বললো, প্রায় দেড়মাস ভুগলাম।

তাই নাকি ? এখন একেবারে ভালো তো ? এই যে আমার বন্ধু চঞ্চল, যার কথা তোমাকে বলেছিলাম।

তাই নাকি ? প্রচুর উৎসাহ নিয়ে মারিয়া জিজ্ঞাসা করলো, তুমি তো লেখো, না ?

লজ্জা পেয়ে চঞ্চল বললো, লিখতে চেষ্টা করি বলাই ভালো।

সেই সন্ধ্যায় আলাপ আরও ঘন হলো। ঘন ঘন দেখা করবার প্রতিশ্রুতি দিলো দুজনেই। তারপর দেশ-বিদেশের সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়ে ওরা দুজনেই বুঝতে পারলো জীবন সার্থক করে তুলতে হলে দুজনের এক সঙ্গে ঘর বাঁধা দরকার।

মারিয়া থাকে বেশ দূরে। জায়গার নাম ক্রিস্ট্যাল প্যালেস। রাস্তার নাম কলেজ রোড। সেই পাড়ার কোন ইস্কুলে সে ফরাসী শেখায়। ফ্রান্স থেকে চাকরি ঠিক করে এসেছে। কলেজ রোডের বাড়িতে সে বেশ আরামে আছে। বোর্ডিং হাউস নয়—এক ইংরেজ ভদ্রমহিলার বাড়ি—আর দু-তিন জন বুড়ো বুড়ো ভাড়াটে। মারিয়ার বয়স এদের মধ্যে সবচেয়ে কম।

এক শনিবার বিকেলে চঞ্চল এসেছিলো কলেজ রোডের বাড়িতে। আর সেইদিন কথায় কথায় পাকা কথা হয়ে গেলো। এ ঘটনা ঘটলো আলাপের প্রায় এক বছর পরে।

খুব আস্তে চঞ্চল ডাকলো, মারিয়া।

বলো ?

জানালা দিয়ে দেখা যায় রাস্তার ওপারে বড়ো বড়ো গাছ। আরও দূরে আরও অনেক গাছপালা—গভীর বনের মতো মনে হয়। তখন অপরাহ্নের শেষ।

আমি প্রস্তুত, একটু থেমে চঞ্চল বললো, এবার তোমার কথা বলো।

মারিয়া সহসা উত্তর দিতে পারলো না। শূন্য দৃষ্টিতে চঞ্চলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। এই বোঝা-না-বোঝার পরম মুহূর্তে তার মনে হলো সে যেন নেই।

বলো ?

বলছি, দাঁড়াও আগে ভেবে নি।

এখনও তোমার ভাবনার শেষ হলো না ?

আজ বোধ হয় শেষ হবে, চঞ্চলের চেয়ারের হাতলের ওপর বসে তার ঘাড়ে হাত রেখে মারিয়া বলে গেলো, চঞ্চল, আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে শেষ অবধি তুমি আমাকে অপরাধী করে তুলবে, আর এ অপরাধের ক্ষমা নেই—

তোমার কথা বুঝতে পারছি না মারিয়া।

কেন তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও ?

তোমাকে না হলে আমার চলবে না বলে।

কিন্তু কাল যখন বুঝবে যে একজন সাধারণ মেয়ের জন্যে তুমি সব হারিয়েছ তখন ?

তখনকার কথা তখন ভাববো, আজ নয়, কিন্তু আজ যা সত্য বলে জেনেছি তাকে স্বীকার করে নিতে দাও—

মারিয়া হেসে বললো, আমারও একটা দিক আছে, সে কথা তুমি জিজ্ঞেস করছো না কেন ?

সব কথা জিজ্ঞেস করে জেনে নেবার দরকার হয় না, অমনি বোঝা যায়।

মারিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। জানালা দিয়ে দূরে গাছের সারি দেখা যায়। অল্প অল্প কুয়াশা জমেছে। তবু অন্ধকার হতে এখনও অনেক দেরি।

আমার ভয় হচ্ছে চঞ্চল, সে চঞ্চলের আরও কাছে ঘেঁসে বসলো।

কিসের ভয় মারিয়া?

তোমাকে হারাবার ভয়।

চঞ্চল হেসে বললো, ছি, আজকের দিনে এ কথা বলছো কেন?

আমি জানি চঞ্চল—মারিয়ার চোখে হঠাৎ জল জমে উঠলো—হয়তো হারাবার জন্যেই তোমাকে পাবো।

ও কথা বোলো না তুমি! তোমার দার্শনিক মন বলে এত ভাবছো। আর আমি ভাবছি শুধু যৌবনের কথা, সমস্ত দুঃখ-বেদনা যার স্পর্শে ফুল হয়ে ফোটে। আজ আমাদের শুধু যৌবনের গান গাইবার দিন।

আমি সব জানি চঞ্চল, সব বুঝি। কিন্তু একটা কথা বুঝি যে আজকের জীবনে প্রেমের মূল্য ক্ষণকালের। তুমি তো লেখো চঞ্চল, তুমি কি জানো না, প্রেম জীবনের শুধু একটা অধ্যায়। তাই কেবলই নিজের সঙ্কোচ হয় যে আমার জন্যে তুমি শেষ না হয়ে যাও।

তোমার কথা বুঝতে পারি না। শেষ হবো কেন? আজ যদি বলি, আমার সাহিত্য আমি তোমার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি, পূর্ণতার স্বাদ আমার জীবনে একমাত্র তুমিই এনে দিতে পারো।

মারিয়া হাসলো, মাপ করো, এ তুমি কী বলছো? সাহিত্যিক হয়ে কেমন করে বলো একজন বিশেষ মানুষ তোমার জীবন পূর্ণ করতে পারে? তাই তো আমি একটু আগে বলছিলাম, সে পূর্ণতা তোমার সাহিত্যিক জীবনে পূর্ণচ্ছেদ না টেনে দেয়।

কখনও দেবে না।

আপাতত না হয় সেকথা স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু আরও আছে। তোমার

মুখ থেকে তোমার বাবার কথা যা শুনেছি তাতে মনে হয় তিনি বিয়ের খবর পেলেই টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেবেন, তখন?

তার জন্যে ভাবতে হবে না। ইণ্ডিয়া হাউসে আমি ইচ্ছা করলেই চাকরি পেতে পারি।

পড়াশুনো?

অসুবিধা হবে না, ঠিক চালিয়ে যাবো।

মারিয়া আবার হাসলো, তোমার হবে প্রাণপাত পরিশ্রম, বাবার সঙ্গে সমস্ত যোগ ছিন্ন, আর অর্থকষ্ট তো আছেই! এতোদিক সামলে সাহিত্য করবে কখন?

চঞ্চল হেসে বললো, পৃথিবীর অসংখ্য সাহিত্যিকের ইতিহাস তুমি জানো না?

জানি, কিন্তু—চঞ্চলের একটা হাত কোলে তুলে নিয়ে মারিয়া বললো—তারা কেউ তোমার মতো ছেলেমানুষ ছিলো না যে।

ছিলো বৈকি, সে-খবর হয়তো তুমি জানো না।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। এবার উঠে আলো জ্বালতে হবে। কিন্তু ওদের দুজনেই একটা মধুর আলস্যে যেন অবশ হয়ে বসে ছিল। ইচ্ছে থাকলেও উঠে আলো জ্বালতে পারছিলো না কেউ।

মারিয়া খুব আস্তে আস্তে বললো, ঠিক আছে চঞ্চল। আমি তোমাকে বিয়ে করবো, কিন্তু একটা কথা—

তাকে কাছে টেনে নিয়ে চঞ্চল বললো, রাজী না হয়ে পারো নাকি তুমি? আমি জানতাম। বলো কী কথা তোমাব?

ভবিষ্যতে যদি আমাকে বোঝা বলে মনে করো—যেদিন আমাকে তোমার আজকের মতো অপরিহার্য মনে হবে না—সেদিন তোমার সংসারে আমার প্রয়োজন যত বেশি হোক না কেন—আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো।

খুব জোরে হেসে উঠে চঞ্চল বললো, তাই যেও। কিন্তু জেনে রাখো এমন দিন আমার জীবনে কখনও আসবে না যখন তোমাকে বোঝা বলে মনে হবে।

সব কথা জিজ্ঞেস করে জেনে নেবার দরকার হয় না, অমনি বোঝা যায়।

মারিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। জানালা দিয়ে দূরে গাছের সারি দেখা যায়। অল্প অল্প কুয়াশা জমেছে। তবু অন্ধকার হতে এখনও অনেক দেরি।

আমার ভয় হচ্ছে চঞ্চল, সে চঞ্চলের আরও কাছে ঘেঁসে বসলো।

কিসের ভয় মারিয়া?

তোমাকে হারাবার ভয়।

চঞ্চল হেসে বললো, ছি, আজকের দিনে এ কথা বলছো কেন?

আমি জানি চঞ্চল—মারিয়ার চোখে হঠাৎ জল জমে উঠলো—হয়তো হারাবার জন্যেই তোমাকে পাবো।

ও কথা বোলো না তুমি! তোমার দার্শনিক মন বলে এত ভাবছো। আর আমি ভাবছি শুধু যৌবনের কথা, সমস্ত দুঃখ-বেদনা যার স্পর্শে ফুল হয়ে ফোটে। আজ আমাদের শুধু যৌবনের গান গাইবার দিন।

আমি সব জানি চঞ্চল, সব বুঝি। কিন্তু একটা কথা বুঝি যে আজকের জীবনে প্রেমের মূল্য ক্ষণকালের। তুমি তো লেখো চঞ্চল, তুমি কি জানো না, প্রেম জীবনের শুধু একটা অধ্যায়। তাই কেবলই নিজের সঙ্কোচ হয় যে আমার জন্যে তুমি শেষ না হয়ে যাও।

তোমার কথা বুঝতে পারি না। শেষ হবো কেন? আজ যদি বলি, আমার সাহিত্য আমি তোমার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি, পূর্ণতার স্বাদ আমার জীবনে একমাত্র তুমিই এনে দিতে পারো।

মারিয়া হাসলো, মাপ করো, এ তুমি কী বলছো? সাহিত্যিক হয়ে কেমন করে বলো একজন বিশেষ মানুষ তোমার জীবন পূর্ণ করতে পারে? তাই তো আমি একটু আগে বলছিলাম, সে পূর্ণতা তোমাব সাহিত্যিক জীবনে পূর্ণচ্ছেদ না টেনে দেয়।

কখনও দেবে না।

আপাতত না হয় সেকথা স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু আরও আছে। তোমার

মুখ থেকে তোমার বাবার কথা যা শুনেছি তাতে মনে হয় তিনি বিয়ের খবর পেলেই টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেবেন, তখন?

তার জন্যে ভাবতে হবে না। ইণ্ডিয়া হাউসে আমি ইচ্ছা করলেই চাকরি পেতে পারি।

পড়াশুনো?

অসুবিধা হবে না, ঠিক চালিয়ে যাবো।

মারিয়া আবার হাসলো, তোমার হবে প্রাণপাত পরিশ্রম, বাবার সঙ্গে সমস্ত যোগ ছিন্ন, আর অর্থকষ্ট তো আছেই! এতোদিক সামলে সাহিত্য করবে কখন?

চঞ্চল হেসে বললো, পৃথিবীর অসংখ্য সাহিত্যিকের ইতিহাস তুমি জানো না?

জানি, কিন্তু—চঞ্চলের একটা হাত কোলে তুলে নিয়ে মারিয়া বললো—তারা কেউ তোমার মতো ছেলেমানুষ ছিলো না যে।

ছিলো বৈকি, সে-খবর হয়তো তুমি জানো না।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। এবার উঠে আলো জালতে হবে। কিন্তু ওদের দুজনেই একটা মধুর আলস্যে যেন অবশ হয়ে বসে ছিল। ইচ্ছে থাকলেও উঠে আলো জালতে পারছিলো না কেউ।

মারিয়া খুব আস্তে আস্তে বললো, ঠিক আছে চঞ্চল। আমি তোমাকে বিয়ে করবো, কিন্তু একটা কথা—

তাকে কাছে টেনে নিয়ে চঞ্চল বললো, রাজী না হয়ে পারো নাকি তুমি? আমি জানতাম। বলো কী কথা তোমাব?

ভবিষ্যতে যদি আমাকে বোঝা বলে মনে করো—যেদিন আমাকে তোমার আজকের মতো অপরিহার্য মনে হবে না—সেদিন তোমার সংসারে আমার প্রয়োজন যত বেশি হোক না কেন—আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো।

খুব জোরে হেসে উঠে চঞ্চল বললো, তাই যেও। কিন্তু জেনে রাখো এমন দিন আমার জীবনে কখনও আসবে না যখন তোমাকে বোঝা বলে মনে হবে।

চঞ্চলের হাত খুব শক্ত করে ধরে মারিয়া হাসছিলো কি কাঁদছিলো সেই অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেলো না।

বোঝাপড়া হয়ে গেলো। এবার চঞ্চলের বরণের আয়োজন করবার পালা। অমল দত্তর সঙ্গে কথা বলে সে ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরির বন্দোবস্ত করে ফেললো। অল্পদিন থাকলে হবে কি, অমল দত্ত দুই চোখ খুলে পথ চলে। এর মধ্যে সে এ দেশের অনেক কিছু জেনেছে, অনেক কিছু বুঝেছে।
সমস্ত শুনে চঞ্চলকে সে বেশ ভারীক্কি চালো বললো, ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি তোমার হবেই। আমি তোমাকে কবে থেকে বলে আসছি চাকরি নেওয়ার কথা। তখন আমার কথা শুনলে এখন এতো তাড়াহুড়ো করতে হতো না। যাকগে, কিন্তু খুব সাবধান, বিয়ে করবার কথা এখন যেন কাকপক্ষীও টের না পায়। এদের বলবে, পড়াশুনোর তেমন চাপ নেই, অবসর বেশি, তাই ভাবছি এদেশে নিজে উপার্জন করে দেশের পয়সা বাঁচাবো! তাহলেই তোমার এখানে চাকরি হয়ে যাবে! তারপর যথাসময়ে তুমি বিয়ে করবে।
চঞ্চল বললো, বেশ তাই করবো। এখন তাড়াতাড়ি চাকরিটা পাইয়ে দাও দেখি।
গম্ভীরভাবে অমল দত্ত বললো, দেবো।
কয়েকদিনের মধ্যেই ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি পেয়ে গেলো চঞ্চল। সকাল সাড়ে নটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি সে নিয়মিত অফিস করতে লাগলো। শুধু সোম আর মঙ্গলবার সাড়ে পাঁচটা অবধি কাজ করতে হয়।
হঠাৎ যেন চঞ্চলের সমস্ত শরীর ছেয়ে এক আশ্চর্য দীপ্তি ফুটে উঠলো আর কোথা থেকে তার মনে এলো সমস্ত বাধা জয় করে নেওয়ার প্রচুর উৎসাহ।
জানো মারিয়া, অফিস থেকে ফিরে স্ট্র্যাণ্ডের কাছে এক ছোট চায়ের দোকানে বসে সে বলে, ভাগ্যিস এদেশে এসেছিলাম, তা না হলে কত কি যে জানা হতো না।
হেসে মারিয়া বলে, এতো কি তুমি এর মধ্যে জানলে চঞ্চল?

কত কি, একটু থেমে সিগ্রেট একটা টান দিয়ে চঞ্চল উত্তর দেয়, এই পৃথিবী খুব বড়ো সেকথা তো ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি কিন্তু এতো বড়ো তা তো ভাবতে পারি নি। কত লোক এই পৃথিবীতে—জীবনের কত দিক আজ আমার চোখে বড়ো হয়ে উঠলো।

মারিয়া বললো, বড়ো শক্ত কাজ তোমার সামনে চঞ্চল, এই সব জীবন, তুমি যা দেখলে তা দেখাতে হবে তোমার দেশের পাঠককে—দেখো যেন ভুল কিছু লিখে ফেলো না।

চঞ্চল বললো, এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কি আমার আছে? তবে হ্যাঁ, একটু থেমে ও আবার বললো, যদি কোন ভুল হয় তা সংশোধন করে দেবার জন্যে তো তুমিই রইলে মারিয়া!

সংশোধন, খুব আস্তে উচ্চারণ করলো মারিয়া, একজন লেখকের জীবনদর্শন সংশোধন করবে অন্য আর একজন! খুব সাবধান চঞ্চল, এমন কথা বললে তুমি কিন্তু কোনদিনও লেখক হতে পারবে না, মারিয়া হাসলো।

চঞ্চল শুধু বললো, আচ্ছা সে দেখা যাবে, চলো আজ উঠি।

এই অল্প কয়েকদিনেই মনে মনে হঠাৎ চঞ্চল যেন অনেক বড়ো হয়ে উঠলো! সত্যি ইণ্ডিয়া হাউসে বসে যেন সমস্ত পৃথিবীকে দেখা যায়। কতো জায়গায় ভারত সরকারের কতো বড়ো বড়ো অফিস। আর লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে প্রায় সব দপ্তরের। ফলে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চঞ্চলের সাহিত্যিক মন দেশ-বিদেশের সুবিধা-অসুবিধার কথা জেনে নিলো। আর তার মনে হলো সে বাংলাদেশের নয়, ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র এশিয়ারও নয়, সে এই পৃথিবীর। পৃথিবী! এতোদিন পর কথাটার আসল অর্থ যেন চঞ্চল বুঝতে পারলো।

কিন্তু শেষ অবধি মারিয়ার কথা গোপন রাখা গেলো না আর, চঞ্চল ইণ্ডিয়া হাউসের অন্যান্য ভারতীয় চাকুরেদের কৌতূহলের বিষয়বস্তু হয়ে উঠলো।

প্রথমে তার সামনে দাঁড়িয়ে কোনো সঙ্কোচ না করে কথা তুললো অনঙ্গ দাশ, কি হে চঞ্চল, এদেশে এসেই একটা জুটিয়েছ যে, অ্যাঁ? কিন্তু সাবধান আবার

কাছা খুলে আঁকড়ে ধরো না যেন। এদেশের ছুঁড়িগুলোর ব্যাপার শোনো—ওরা থাকবে যতোদিন, তোমার বাথরুম পরিষ্কার করবে, কার্পেট তুলে ঘর ঝাঁট দেবে কিন্তু যখন ছাড়বে বুঝলে, আর ফিরেও তাকাবে না। বুঝেশুনে চলো; এদেশের ছুঁড়ি কিন্তু বেশিদিন ঘর করে না—আজ হোক কাল হোক ওরা লোক বদলাবেই। তা তোমার এটি কোন দেশের?

অনঙ্গ দাশের স্বভাব এর মধ্যেই চঞ্চল বুঝে নিয়েছে। তাই ওর কথায় তার রাগও হয় না, দুঃখও হয় না। সে হেসে উত্তর দিলো, ফরাসী।

ওরে বাবা, একেবারে বুর্জোয়া ব্যাপার। তা ইংল্যাণ্ডে বসে আবার ফরাসী-টরাসী কেন? একটা ইংরেজ জোটাতে পারলে না?

চঞ্চলের উত্তরের অপেক্ষা না করে অনঙ্গ দাশ সঙ্গে সঙ্গে বলে গেলো, অবশ্য ইংরেজ মেয়ে-বন্ধু পাওয়া শক্ত। এখানে দিশি ব্যাটারা কন্টিনেন্টের ঝি মাথায় নিয়ে নাচে। তাহোক, একটু থেমে অনঙ্গ দাশ হেসে বলে, মেমসাহেব তো।

চঞ্চল অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, ঝি মানে?

তাও জানো না? বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিও। অমল দত্ত এসব বিষয়ে একেবারে পারদর্শী। ঝি মানে আবার কি, ঝি মানে ঝি, হি হি হি, এবার চঞ্চলের প্রায় কানের কাছে মুখ এনে অনঙ্গ দাশ বলে, ইটালি, সুইটজারল্যাণ্ড, জার্মানি এইসব দেশ থেকে অজস্র মেয়ে লণ্ডনে ঝিগিরি করতে আসে। ইংরেজ ওদের দিকে ফিরেও তাকায় না। বুঝলে চঞ্চল, অতি বদমাইশ জাত এই ইংরেজ বেটারা। এই মেয়েরা বলে যে তারা নাকি ইংরেজী শিখতে এদেশে এসেছে। আসলে দেশে খেতে পায় না আর পেটে বিদ্যে নেই বলে চাকরিও পায় না। তাই এদেশে আসে ভালো খেয়ে-পরে ফুর্তি মারবার জন্যে। শেষ অবধি ওরাই ঝুলে পড়ে একেবারে ইণ্ডিয়ানদের গলায়। এদেশে যারা বিয়ে করে আছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগ বাছাধনের ওই কন্টিনেন্টের ঝি-স্ত্রী। এখন অবশ্য ওরা বড়ো বড়ো কথা বলে। বলে তাদের স্ত্রীরা নাকি সব রিসার্চ করতে এসেছিলো—লণ্ডন ইউনিভারসিটির পি এইচ ডি নিতে—

আপনিও তো এদেশে বিয়ে করেছেন?

কিন্তু আমি কি কাঁচা কাজ করবার ছেলে বাপু? আমার স্ত্রী খাঁটি ইংরেজ! বড়ো প্রফেসারের মেয়ে। আর কথা বাড়ায় না অনঙ্গ দাশ, চলে যেতে যেতে বলে, খুব সাবধান। বিয়ে-সাদির মধ্যে তুমি আবার যেও না যেন—তাহলে এই আমাদের মতো পচে মরতে হবে। এই হতচ্ছাড়া দেশে মানুষ থাকে!

ইণ্ডিয়া হাউসের লাউঞ্জে বসেই কথা হচ্ছিল। অনঙ্গ দাস চলে যাবার পর চঞ্চলের কাছে উঠে এসে বসলো এঞ্জিনীয়ার সোমনাথ ব্যানার্জি।

এই যে নমস্কার, ভালো আছেন?

প্রথম দিন থেকেই সোমনাথকে শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করেছিলো চঞ্চল। তাই আজ তাকে নমস্কার জানিয়ে একেবারে প্রথমেই বললো, দয়া করে আমাকে আপনি বলে কথা বললেন না, আর নাম ধরেই ডাকবেন।

আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। কেমন আছো?

ভালো। আপনি?

শরীরটা খুব ভালো নেই। মাঝে মাঝে বড়ো দুর্বল মনে হয়।

একটা ভালো ডাক্তার দেখান না। এখানে তো ভালো চিকিৎসার কোনো অসুবিধা নেই।

না তা নেই বটে, চুপ করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবে সোমনাথ। তারপর বলে অতক্ষণ ধরে কি বোঝাচ্ছিলো অনঙ্গ দাশ?

চঞ্চল হাসলো, এদেশের নিন্দে করছিলেন।

শুধু এদেশের নয়, চঞ্চলের দিকে একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে দিয়ে সোমনাথ বললো, নিন্দে করা ওর স্বভাব। এতোদিন রইলো এখানে কিন্তু এদের ভালো কিছু দাশের চোখে পড়লো না।

উনি বলছিলেন এখানে সকলে নাকি কন্টিনেন্টের ঝি বিয়ে করে।

একথা শুনে শান্তস্বভাব সোমনাথ বললো, তুমি ওর কোনো কথা বিশ্বাস কোরো না।

কিছু মনে করবেন না—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

নিশ্চয়ই!

মিসেস ব্যানার্জি কি ইংরেজ ?

না জার্মান।

চঞ্চল চুপ করে সিগ্রেট টানতে লাগলো। সে ভাবছিলো এদের সঙ্গে দিনে দিনে তার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যাবে। কেননা সে তো তাদেরই একজন হতে চলেছে! এরাই হবে তার আপনার, তার আত্মীয়, তার দলের লোক।

একদিন আপনার বাড়ি বেড়াতে যাবো মিঃ ব্যানার্জি।

বেশ তো, বেশ তো, কবে আসবে ? এই শনিবার ?

তাড়াতাড়ি করবার কিছু নেই, যাবো একদিন।

যেদিন খুশি এসো, শুধু আমাকে একটু আগে থেকে জানিয়ে দিও।

দেবো।

হেসে আবার সোমনাথ বললো, তোমার বন্ধুকেও নিয়ে যেও।

অমলকে ?

না না, তোমার ফরাঁসী বন্ধুকে।

লজ্জা পেয়ে চঞ্চল জিজ্ঞেস করলো, তার কথা আপনি জানলেন কেমন করে ?

এতক্ষণে লণ্ডনে যত বাঙালী আছে বোধ হয় তাদের কারুর আর জানতে বাকি নেই।

আশ্চর্য হয়ে চঞ্চল জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু কেমন করে ?

তুমি বোধ হয় অনঙ্গ দাশের স্বভাব জানো না। সে তোমাদের দুজনকে ছুটির পর দু-একদিন ঘুরতে দেখেছে। ব্যাস আর রক্ষে আছে, জনে জনে বলে বেড়িয়েছে, লোকে জানে আজ বাদে কাল তোমাদের বিয়ে হবে। খোঁজ নিয়ে দেখো, হয়তো এতোদিনে তোমার বাবার কাছেও বেনামী চিঠি চলে গেছে।

চঞ্চল বেশ বিচলিত হয়ে বললো, তাহলে কী হবে ?

হবে আবার কি, সোমনাথ সিগ্রেটটা ছাইদানে চেপে দিতে দিতে বললো, ওর কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, তুমিও ঘামিও না।

কিন্তু উপায় কি। সোমনাথ চলে যাবার পরেও গালে হাত দিয়ে সেই সোফায়

অনেকক্ষণ বসে চঞ্চল নানা কথা ভাবতে লাগলো। তার সবচেয়ে বড়ো ভাবনা তার বাবা। তিনি যদি সত্যি বেনামী চিঠি পান, তিনি যদি অন্য কারুর মুখ থেকে আগে কিছু শোনেন, তাহলে শুধু ক্ষুব্ধ হবেন না, মর্মান্তিক বেদনা পাবেন। চঞ্চল নিজে সমস্ত কিছু খুলে লিখলে তার সঙ্গে তিনি সম্পর্ক রাখবেন না, নিদারুণ আঘাতও পাবেন। তবু পরের কাছে থেকে একথা না জানা মনে হয় তাঁর পক্ষে অনেক ভালো।

সেদিন ছুটির পর অমল দত্তের সঙ্গে আলোচনা করলো চঞ্চল। হাই-কমিশনারকে অমলের বড়ো ভয়। সে শুধু বললো, আর দেরি কোরো না, কোনদিন এইচ. সি'র কানে যাবে ঠিক কি, এরকম দুর্নাম তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। তার চেয়ে বিয়ে করে ফেলা অনেক ভালো। ফিঞ্চলে রোডে তোমার জন্যে বেশ ভালো ফ্ল্যাট পাওয়া যাবে, ল্যাণ্ডলেডিকে আমি খুব চিনি। মারিয়াকে রাজী করাও—

সে রাজী আছে।

তবে আর ভাবনা কি, অবিলম্বে শুভ কাজ সেরে ফেলো।

তাই করলো চঞ্চল। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে সদ্য-আসা বসন্তের এক অপরাহ্নে ঘরে আনলো সিন্ধুপারের বধূ। সাক্ষী হলো মারিয়ার দুই বন্ধু আর অমল। সানাই বাজলো না। কলরব উঠলো না। তবু চঞ্চলের মনে হলো তার এতোদিনের শূন্যতা কানায় কানায় ভরে গেলো।

চঞ্চল আর মারিয়া খুব অল্প সময়ের মধ্যে অমল দত্তর ঠিক করে দেওয়া ফিঞ্চলে রোডের ফ্ল্যাটে বেশ গুছিয়ে বসেছে। দুখানি মোটে ঘর। তা হোক! তার বেশি ঘরের প্রয়োজন কি আর তাদের। একখানি বসবার আর একখানি শোবার। আর বারান্দায় সামান্য একটু জায়গা—সেখানে গ্যাসের উনুন। পাশেই স্নানের ঘর। কিন্তু সেখানে এতো অন্ধকার যে দিনের বেলা আলো না জ্বাললে কিছুই দেখা যায় না। দেখবার দরকারও হয় না। লণ্ডনের লোক চান করে রাত্তিরে, ডিনার খাবার ঘণ্টাখানেক পর। এদেশের মতো দিনের

বেলা চান করে বাইরে বেরুলে নাকি ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করতে পারে। তাই বাথরুমের আলো-অন্ধকার নিয়ে ভাড়াটেরা একেবারেই ভাবনা করে না। আর সে-ঘরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বা কতটুকু। হয়তো সপ্তাহে একবার মাত্র চান করার প্রয়োজন হয় কিংবা তাও নয়।

ফিঙ্কলে রোডের ফ্ল্যাট পেয়ে মারিয়া আর চঞ্চল খুশী হলো। মারিয়া বার বার যথারীতি ধন্যবাদ জানালো অমল দত্তকে। ভালো পাড়া, ভাড়াও বেশি নয়। সেই অল্প আসবাবে সুন্দর করে সে সাজিয়ে নিলো দুখানি ছোটো ছোটো ঘর। দেখলেই মনে হয় কোনো সুরুচির মানুষ নিপুণ হাতের স্পর্শ লাগিয়েছে ঘর দুখানায়।

চঞ্চল অবাক হয়ে বললো, কী সুন্দর !

এই দেখো, এর মধ্যেই যেন সুগৃহিণী হয়ে উঠেছে মারিয়া, এটা তোমার লেখবার টেবিল আর এটা পড়বার। দুই টেবিলের কাগজপত্র কালিকলম আলাদা কিন্তু দেখো কিছুতেই যেন এখানকার জিনিস ওখানে রেখো না।

চঞ্চল হেসে বললো, চেষ্টা করবো।

আর একটা কথা, সকালে তোমাকে আরও ভোরে উঠতে হবে, আমি যখন ব্রেক-ফাস্ট তৈরি করবো তুমি তখন অন্তত ঘণ্টাখানেক লেখাপড়া করবে। তারপর অফিস যাবে। অফিস থেকে কিন্তু সোজা বাড়ি আসতে হবে, বাইরে শুধু লাঞ্চ ছাড়া অন্য কিছু খাওয়া একেবারেই ছাড়তে হবে।

স্ত্রীর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে চঞ্চল বললো, আমাদের বিয়ের পনেরো দিনও হয় নি এখনও, অথচ তোমার কথা-বার্তা শুনে মনে হচ্ছে আমরা যেন কতকাল ঘর করছি।

মারিয়া চঞ্চলের গালে আস্তে আঘাত করে বললো, আমার কিন্তু মোটেই তোমার আর আমার এমন অবস্থায় থাকা নতুন মনে হয় না—মনে হয় আমাদের পরিচয় যেন অনেক দিনের।

আমারও তাই মনে হয়। তাই তো আমরা কেউই উত্তেজনায় দিশা হারাই নি। তুমি যেন কোনোদিন কোনো কারণেই দিশা না হারাও। এসো চঞ্চল আমার

পাশে বোসো এই সোফায়। তোমার সঙ্গে আজ অনেক কথা বলি—সেই যেমন ক্রিস্ট্যাল প্যালেসের বাড়িতে বসে বলতাম।

বলো।

চঞ্চল, তোমার ওপর আমার অনেক আশা। বিয়ের আগে কত কথা তোমায় বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি কিছুই শুনতে চাও নি।

না, কারণ তখন তুমি শুধু অন্ধকারের কথা বলতে, কেবলই আমাকে বোঝাতে চাইতে যে তোমাকে বিয়ে করলে আমার ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হবে না।

মারিয়া হেসে বললো, কিন্তু আজ তোমার ভয় নেই। এখন আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাই একেবারে প্রথমে আমি তোমাকে শুধু একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের খুব সাবধানে চলতে হবে কেননা দুঃসময় এসে গেলো বলে।

চঞ্চল বললো, তোমাকে যতোটুকু জেনেছি তাতে বুঝেছি তুমি বড়ো বেশি সতর্ক, বড়ো বেশি হিসেবী, কিন্তু তোমাকে প্রশ্ন করি যে যৌবনের অফুরান সঞ্চয় কি কিছু নয়? কেন দুঃসময়ের ভয় করছো? যদি কোনোদিন তা আসে, আমাদের মনের তেজ তাকে কি পুড়িয়ে আলো বের করতে পারবে না?

পারবে। তাই তো প্রস্তুত হতে চাই। মানুষের মন বড়ো চঞ্চল। তুমি টেরও পাবে না অথচ দেখো না আস্তে আস্তে কেমন করে মন আগাগোড়া বদলে যায়।

বদলে গেলেও আমার জীবনে তোমার প্রয়োজন অস্বীকার করবো কেমন করে?

মারিয়া হেসে বললো, যেমন করে তোমার জীবনে আজ তোমার বাবার প্রয়োজন অস্বীকার করেছো।

চঞ্চল মাথা নিচু করে রইলো, উত্তর দিতে পারলো না।

মারিয়া আবার বললো, তুমি কি কোনোদিন ভেবেছিলে যে তোমার বাবাকে বাদ দিয়ে তোমার জীবন চলবে—আরও পূর্ণ হয়ে উঠবে? একটু থেমে নিরুত্তর চঞ্চলের চোখের ওপর চোখ রেখে সে বললো, চঞ্চল তোমাকে আমি এই কথাটাই প্রতিদিন বোঝাবো যে আমরা একা এসেছি, আমাদের একাই

যেতে হবে, এ জীবনে কাউকেই চিরকাল প্রয়োজন নেই। জীবনে শুধু অধ্যায়ের পর অধ্যায় আসে। আমি তোমার জীবনের শুধু একটি অধ্যায়।

হ্যাঁ হয়তো তাই, কিন্তু তুমি আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় মারিয়া।

জানি না। তোমাকে আমি বিয়ে করেছি কারণ তুমি বড়ো অসহায়। একজন কারুর ভালোবাসা না পেলে কেবলই ঠকে মরবে। কিন্তু আমি তোমাকে অসহায় থাকতে দেবো না। তোমাকে নিজের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবেই। যদি কোনো দিন আমি না থাকি তাহলেও যেন তোমার কোনো অসুবিধা না হয়।

বার বার ওকথা বোলো না। তোমাকে দেখবার পরই শুধু আমার নিজেকে অসহায় বলে মনে হয়েছিলো। বুঝেছিলাম তোমাকে না হলে আমার চলবে না।

তোমার ভুল শিগগিরই ভেঙে যাবে চঞ্চল।

ভুল ! তার দিকে খোলা চোখে শুধু অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

আর তখন মারিয়া ভাবছিলো ফরাসী দেশের কোনো এক ছোটো গ্রামের কথা যেখানে রয়েছে তার মা-বাবা। প্যারিস থেকে লুআঁ খুব বেশি দূরে নয়। সন্ধ্যেবেলা ট্রেনে চড়লে পরদিন সকাল নটা-দশটায় পৌছোনো যায়।

মারিয়ার মা-বাবা একেবারেই ইংরেজী জানে না। তাই বিয়ের অনেক আগে থেকেই সে চঞ্চলকে বলে আসছে, ফরাসী ভাষাটা শিখে নাও। আমার মতো টিচার রয়েছে ভাবনা কি—

সেই তো আমার ভাবনা, বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে চঞ্চল উত্তর দেয়, তোমার কাছে থেকে আমি জীবনের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালাভ করেছি—আর নয়।

তাহলে অন্য কারুর কাছ থেকে ফরাসী শিখে নাও।

দেখা যাবে।

মারিয়া দু-একবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সে ভেবেছিলো চঞ্চল খুব তাড়াতাড়ি ফরাসী শিখে মধুর আলাপ-আলোচনায় তার মা-বাবা আর আত্মীয়স্বজনকে মুগ্ধ করে দেবে। অবশ্য মারিয়ার আত্মীয়স্বজন বলতে শুধু তার মা বাবা দাদা

বৌদি আর তার এক পিসি। এই পিসিকেই তার সবচেয়ে বেশি ভয়। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বিয়ে করেন নি। সারা জীবন স্কুলে কাজ করে অনেক পয়সা করেছেন। মারিয়াকে তিনি নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসেন। তার বয়স যখন সাত-আট বছর তখন থেকেই নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছেন বলেই সে অতো ভালো ইংরেজী শিখেছে। তাই মারিয়া বেশ ভয়ে ভয়ে আছে। বিয়ের খবর তিনি কিভাবে নেবেন ঠিক বুঝতে পারছে না। চঞ্চলের সঙ্গে আলাপ হবার পর তার সঙ্গে পিসির প্যারিসে কয়েকবার দেখা হয়েছে। জানো পিসি, মাত্র একদিন কথায় কথায় মারিয়া বলেছিলো, আমার সঙ্গে একটি ইণ্ডিয়ান ছাত্রের আলাপ হয়েছে।

তাই নাকি ? পিসি হেসে বলেছিলেন, কী পড়ে সে লণ্ডনে ?

ব্যারিস্টারি, খুব বুদ্ধিমান ছেলে।

শুনেছি, ইণ্ডিয়ানরা নাকি খুব বুদ্ধিমান হয়। একটু চুপ করে থেকে পিসি আবার বলেছিলেন, তবে ওরা যতোদিন এদেশে থাকে ততোদিন ভাল থাকে, দেশে ফিরে খারাপ হয়ে যায়।

মানে ? মারিয়া পিসির কথা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছিলো।

মানে এদেশে ওরা ইউরোপের মেয়েদের সঙ্গে মেশবার সময় বেশ ভদ্রভাবে মেশে, সুন্দর ব্যবহার করে। কিন্তু যদি এ দেশের মেয়েকে বিয়ে করে দেশে নিয়ে যায় তাহলেই সর্বনাশ—সেখানে নিয়ে গিয়ে নাকি বউএর সঙ্গে যা-তা ব্যবহার করে। বাড়ি থেকে বেরোতে দেয় না, কারুর সঙ্গে মিশতে দেয় না, মানে খুব খারাপ ব্যবহার করে।

যাঃ, কে বলেছে পিসি তোমাকে একথা ?

আরে ওই যে, তুই চিনবি না, অ্যালিস স্থরিয়। তার ভাইঝি নাকি এক ভারতীয়কে বিয়ে করে ভারতবর্ষে। কিছুদিন পর পালাতে পথ পায় না মেয়ে। কিন্তু তাও কি ছাড়া পাওয়া সহজ ? অনেক কাণ্ড করে বেচারী ফ্রান্সে পালিয়ে আসে।

একটু গম্ভীর হয়ে মারিয়া বললো, তা এমন তো এদেশেও হতে পারে।

অনেক লোকই তো বিয়ের পর বদলে যায় আর স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে।
তা করে বটে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পিসি বলেছিলো, যাকগে, তোমার সঙ্গে সেই ছোকরার প্রেম-ট্রেম নেই তো?
না না, তখন মারিয়ার মনে চঞ্চল গভীরভাবে রেখাপাত না করলেও সে অকারণে যেন লজ্জা পেয়েছিলো।
আজ হঠাৎ এক ভারতীয়ের সঙ্গে তার বিয়ের খবর শুনে পিসির কী মনে হবে কে জানে। ওদিকে আবার তার দাদা পল আর-এক কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে। পিসি খুব বেশি আঘাত পেয়েছিলেন সে-ব্যাপারে। এমন কি, পলের বউএর মুখ অবধি দেখেন নি। হয়তো কোনোদিনও দেখবেন না।
মারিয়া ভাবে নি যে এই সামান্য ব্যাপারে পিসি এতোখানি কঠোর হয়ে উঠতে পারেন। পল রেডিও এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, তখনো চাকরি ঠিক করে নি। চাকরি করবার বেশি ইচ্ছে ছিলো না তার। সে ভেবেছিলো, ব্যবসা করবে। এমন সময় পলের সঙ্গে ইভলীনের আলাপ হয়। সে ছোটো ঘরের মেয়ে। লেখাপড়া একেবারে জানে না। তার মার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে ঝিগিরি ছাড়া অন্য কোনো কাজ সে করতে পারে না।
পল যে ইভলীনের মতো মেয়েকে কোনোদিনও বিয়ে করতে পারে সে কথা পিসি স্বপ্নেও ভাবেন নি। মারিয়া এসব কিছুই জানতো না। হঠাৎ লণ্ডনে পিসির চিঠিতে খবর পায় যে, ইভলীন বলে একটি মূর্খ ছোটো-লোক মেয়ে বর্তমানে প্যারিসের হাসপাতালে আছে। তার নাকি একটি ছেলে হয়েছে। আর ছেলের বাবা মারিয়ার দাদা পল। সে নাকি ওই মেয়েকে বিয়ে করবে। বিয়ের আগে ছেলে! তা হয় হোক। মারিয়া তাতে বেশি বিচলিত হয় না। কিন্তু এই কথাটা ভাবতে তার সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগে যে—তার আপন দাদা পলের এই কাণ্ড! যাহোক তারপর এক ছুটিতে প্যারিসে গিয়ে সে তার দাদার বউ আর তার ছেলেকে দেখলো। এই ইভলীন! পলের বউএর

চেহারা দেখে যেন মাথা ঘুরে গেল মারিয়ার। এই রূপ দেখে কার না মাথা ঘুরবে। ইভলীনকে সে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলো।

পিসি কিন্তু কিছুতেই একেবারে ক্ষমা করতে পারলেন না পলকে। তখন প্যারিসে বাড়ির সমস্যা প্রবল। প্যারিসে থেকে মাইল দুয়েক দূরে পিসির এক বিরাট বাড়ি ছিলো। সেখানে অনেক ফ্ল্যাট। তারই একটা ফ্ল্যাটে তিনি পল আর ইভলীনকে থাকতে দিলেন। পল মাঝে মাঝে আসে পিসির কাছে। কিন্তু তিনি কিছুতেই ইভলীনের মুখ দেখলেন না।

এখন মারিয়ার ভাবনা যে পিসি চঞ্চলের সঙ্গে তার বিয়ের খবর কিভাবে নেবেন। মা-বাবার কথা সে ভাবে না। সে যা করে সবই তাঁদের ভালো লাগে। কিন্তু পল আর মারিয়া আর এই দুজনকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার জন্যে পিসি অনেক ত্যাগ করেছেন—অনেক কষ্ট করেছেন। বিয়ে করলে পাছে অন্যদিকে তার মন যায় আর এদের প্রতি সামান্য অবহেলা প্রকাশ পায় তাই তিনি বিয়ে করলেন না সারা জীবন। এই দুই ভাই-বোনের জন্যে পিসির ভাবনার শেষ নেই।

চঞ্চল কিন্তু নিশ্চিন্ত। সে জানে এ খবর পেয়ে তার বাবার মনের অবস্থা কেমন হবে আর তিনি কী করবেন। তাই সেকথা না ভেবে বাবার সাহায্য না নিয়ে কেমন করে বেঁচে থাকা যায় সে তাই ভাবছিলো।

কিন্তু তবু ওরা দুজনেই অধীর আগ্রহে চিঠির প্রতীক্ষা করছিলো।

বুধবার

চঞ্চলের এই হঠাৎ বিয়ের খবর শোনবার পর থেকেই অনঙ্গ দাশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। রাগ এখনও পড়ে নি তার ! সে আরও জানবার চেষ্টা করছিলো যে কারা এই বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলো। প্রত্যেককে সে এমন কঠিন কথা শোনাবে যা তারা এর আগে আর কখনও শোনে নি।

অন্য কেউ যদি এখানে এমন বিয়ে করতো তাহলে এতোখানি বিচলিত হতো না অনঙ্গ দাশ। আশ্চর্য রকম ভালো ছেলে চঞ্চল। নম্র, বিনয়ী, কোমলস্বভাব আর গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে জানে। অমল দত্তের মতো দুমদাম যা-তা কথা কারোর মুখের ওপর বলে না। এদেশের একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে দুদিন পরে সে নাকানি-চোবানি খাবে। আর সবকিছু মাথায় উঠে যাবে তার। মেমসাহেবের দাবি মেটাতে ঘটি-বাটি তো বিক্রি হবেই—শেষ অবধি মাথা খারাপ না হয়ে যায়। চঞ্চলের কথা ভাবতে ভাবতে অনঙ্গ দাশ কেবলই নিজের সঙ্গে তার তুলনা করে আর মনে মনে আরও বেশি রেগে যায় তার ওপর।

এদেশের মেয়েরা শুধু ভালোবাসার ভান করতে জানে আর কথায় কথায় নানা রকম ভোল ধরে। ভারতবর্ষের কোনো কিছুর ওপর সামান্য শ্রদ্ধাও নেই তাদের—একজন ভারতীয়ের মন বুঝতে এদের জন্ম কেটে যাবে। সে-চেষ্টাও করবে না কেউ। শুধু যতক্ষণ পারে প্রাণভরে শোষণ করবে। তারপর পুরোনো হলেই ছেঁড়া জুতোর মতো ফেলে দিয়ে চলে যাবে। কান্না কানে তুলবে না, মনের দুঃখের সামান্য ইঙ্গিতও বুঝবে না। বোঝাতে গেলে বলবে, কাঁচা ভাবপ্রবণতা। ভারতীয়রা এমনি হয়।

তাই অনঙ্গ দাশের মতে এবং তার নিজের অভিজ্ঞতায় এদেশের মেয়ে বিয়ে করলে শেষ বয়সে উন্মাদের মতো শুধু পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। কেননা আজ হোক কাল হোক ভারতীয় স্বামীর সঙ্গে এদেশের স্ত্রীর মতের অমিল হবেই আর অবশেষে একদিন সামান্য কারণ নিয়ে বাধবে ঝগড়া। তখন ঘর

ভাঙবেই। কিছুতেই মিটমাট করে একসঙ্গে আর থাকা যাবে না। চলে যাবার সময় ভুলেও পিছন ফিরে তাকাবে না বিদেশী স্ত্রী। কিন্তু সে শুধু হাতেও যাবে না, মামলা করে শিলিং-পেন্সে আদায় করে নেবে তার পাওনা। এদেশের আইন-কানুনের বইএ যতোই বড়ো বড়ো কথা লেখা থাক না কেন, আইন শাদা লোকের পক্ষেই। তা না-না-না করে শেষ অবধি কি হয়ে যায় যে, সত্যি কোনো দোষ না থাকলেও উকিল-ব্যারিস্টাররা প্রমাণ করে দেয় যে যতো দোষ ওই কালো লোকের। ব্যাস শুধু দণ্ড দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না তখন। ধন্যি এদেশের মেয়ে। আহাহা, প্রথম প্রথম তারা কতো ভালো, কী বিনয়ী! মুখে যেন মধু ঝরে। আর তারপর—কিন্তু সেকথা অনঙ্গ দাশের মতো এতো ভালো করে আর কে বুঝবে! তার প্রায় সমস্ত জীবন কেটে গেল এদেশে। তার স্ত্রী ইংরেজ। কিন্তু শুধু একটি মেয়েকে দেখে অনঙ্গ দাশ এদেশের মেয়ের বিচার করে না নিশ্চয়ই। অনেক মেয়ে দেখেছে সে। তার ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, মাথায় নিয়ে নেচেছে। কিন্তু কী পেয়েছে শেষ অবধি। শুধু বুকে জমে উঠেছে একরাশ দীর্ঘশ্বাস, আর বারবার তার হঠাৎ হারিয়ে-যাওয়া সতী-সাধ্বী বাঙালী স্ত্রীর কথা মনে করে চোখের জল ফেলেছে। অনুপমার কথা কি ভোলা যায়! তার অকাল মৃত্যু তো কাল হল অনঙ্গ দাশের! কী যেন খেয়াল হল তার, যে বেদনাভরা হৃদয় নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো পৃথিবী ভ্রমণ করতে! আর পৃথিবী! লণ্ডনে এসে সে সব ভুলে গেল। আর তার এই ভেবে দুঃখ হলো যে কেন ছাত্র হয়ে যথাসময়ে এখানে আসে নি। অর্থের অভাব ছিলো না তাদের। কলকাতার নামকরা ধনী বংশের সন্তান অনঙ্গ দাশ। তাই তো মাঝ বয়সে তার পক্ষে এমন করে বেরিয়ে পড়া সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু হয়, আজও থেকে থেকে মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবে অনঙ্গ, কেন যে সেদিন এমনি করে সুখের ঘর, তার সোনার সংসার ছেড়ে যাযাবরের মতো বেরিয়েছিলো! আর যদি সংসার ছাড়লো তাহলে আবার নতুন করে ছেলেমানুষের মতো ঘর বাঁধবার সাধ হলো কেন! কী ছিলো প্যাট্রিসিয়ার? অনুপমার সঙ্গে তার কি তুলনা

হয়? কেন শুধু শাদা রঙের মোহে ভুলেো অনঙ্গ? বয়স তার তো কম ছিলো না তখন।
কিন্তু তখন এই পৃথিবী যেন অন্য রকম ছিলো। তা না হলে অতো আগ্রহ করে প্যাট্রিসিয়া কেন স্বামীর ভিটে দেখতে চাইবে। কেন ব্যাকুল হয়ে স্বামীকে বার বার অনুরোধ করবে কলকাতায় তার শ্বশুরবাড়িতে বাস করবার জন্যে। আর, সেকথা অনঙ্গ দাশ কখনও ভুলবে না যে একমাত্র প্যাট্রিসিয়ার জন্যেই আবার কলকাতায় ফেরা সম্ভব হলো। আর প্যাট্রিসিয়া কলকাতাকে কি আশ্চর্য রকম ভালোবেসে ফেললো! অনঙ্গ দাশের মা-বাবা তার বিয়ের খবর শুনে একদিন রেগে উঠেছিলেন কিন্তু প্যাট্রিসিয়াকে দেখে অবাক হলেন, মুগ্ধ হলেন। এমনকি অনঙ্গর স্ত্রীকে দেখে পাড়ার লোকেও বলাবলি করতে লাগলো, আমাদের ছেলেরা যদি এমন মেম-বউ বিয়ে করে আনে তাহলে যে বাঙালী বউরা লজ্জায় মুখ লুকোতে জায়গা পাবে না।
রূপে-গুণে লক্ষ্মী প্যাট্রিসিয়া। কে বলবে সে এদেশের মেয়ে নয়—কে অবিশ্বাস করবে সে ভারতীয় রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার জানে না। এমনকি অনঙ্গ দাশও অবাক হয়ে বারবার ভাবছিলো এত তাড়াতাড়ি কেমন করে প্যাট এদেশের সংস্কার নিজের রক্তে গ্রহণ করে নিতে পারলো। সকালবেলা ঘণ্টা-খানেক ধরে সে শ্বশুরকে তেল মাখিয়ে দেয়, মা বলে ডেকে শাশুড়ীর সেবা করবার ত্রুটি করে না, আর কারোর অসুখ করলে বিনা দ্বিধায় রাত জেগে তার সেবা করে। নিজের কথা ভাবে না প্যাট্রিসিয়া, নিজের শরীরের দিকে তাকাবার অবসর পায় না। স্বামীর সংসারের জন্যে নিজেকে সে যেন উৎসর্গ করে দিলো। শ্বশুর বললেন, আহা, ভারি ভারি গয়না দিয়ে বউকে সাজালেন। সিন্দুক খুলে শাশুড়ী দিলেন এ বাড়ির বড়ো বউএর পাওনা যা কিছু গয়না। এসব দেখেশুনে অনঙ্গ দাশ ভাবলো, ইংরেজ বউ না হলে এমন করে প্রেমের জন্যে সর্বস্ব দিতে পারে কোনো মেয়ে!
এই আদর এই আনন্দ এতো সুখের মধ্যে থেকেও কিন্তু অনঙ্গ তৃপ্তি পেলো না। বিলেতে সে তিন-চার বছর বাস করেছে, সেখানে ব্যবসা শুরু করেছিলো, মন্দ

চলছিলো না। আর একটু সহ্য করলে দাঁড়িয়ে যেতে পারতো। কিন্তু একটা কাঁটা যেন তার মনের মধ্যে খচখচ করে উঠতো, আর মনে হতো এমন করে সে প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে এদেশে কেন আছে। তার স্ত্রী তো জানে না সে কোন বাড়ির ছেলে, কেমনভাবে তার থাকা উচিত আর প্যাট্রিসিয়ার তো রানীর মতো থাকার কথা। তাহলে কেন অকারণে এই দুঃখভোগ। দেশ ছেড়ে একদিন অনঙ্গ বেরিয়ে পড়েছিলো অনুপমাকে ভোলবার জন্যে। আজ তাকে ভুলেছে, তাই প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে দেশে ফিরতে বাধা কি। সে বাড়ির বড়ো ছেলে। পৈতৃক বাড়ির সব কিছুতে তার সবচেয়ে বেশি অধিকার।

যা করতে ইচ্ছে হলো সঙ্গে সঙ্গে তা করা অনঙ্গ দাশের চিরকালের অভ্যাস। সে ঠিক করলো ইংল্যাণ্ড থেকে অবিলম্বে তল্পী তুলতে হবে। এই বিয়ের ব্যাপারে মা-বাবা যতোই অসন্তুষ্ট হোন না কেন, ছেলে আর বউকে সামনে দেখলে তাঁদের রাগ পড়ে যাবেই।

আর হলোও তাই। প্যাট্রিসিয়া পেলো দাশ পরিবারে রানীর আসন। শ্বশুর শাশুড়ী যা ননদ দেওর সকলে তাকে যেন মাথায় তুলে নিলো। এতো স্নেহ এতো ভালোবাসা এতো সম্মান প্যাট্রিসিয়া তো এর আগে আর কোনোদিন কোথাও পায় নি। তার নিজেকে ধন্য মনে হলো। আর স্বামীর জন্যে এই পরিবেশে আসতে পারলো বলে তার সমস্ত মনপ্রাণ সঁপে দিলো তার কল্যাণ কামনায়। এ যেন প্যাট্রিসিয়ার নতুন পৃথিবী। মাথায় সিঁদুর কপালে টিপ আর গায়ে নতুন শাড়ি জড়িয়ে বারবার মনে হলো তার যেন নতুন জন্ম হয়েছে। নতুন পৃথিবীতে সে যেন নতুন মানুষ। নিজের দেশের কথা ভুলে গেলো প্যাট্রিসিয়া, মা-বাবার স্মৃতি পীড়া দিলো না তাকে, অতীত দিনে দিনে অস্পষ্ট হয়ে একেবারে যেন তার মন থেকে মুছে গেলো।

এমনি আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে কাটলো কয়েক বছর। অভ্যাস হয়ে গেলো এই জীবনে, উত্তেজনা কমে গেলো। কাটতে লাগলো মন্থর দিন।

কিন্তু প্রথম থেকেই ভারতবর্ষে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি অনঙ্গ দাশ। ঘরে আত্মীয়-পরিজনের কাছে এতো সম্মান পেলেও বাইরে তার নিজেকে মনে

হচ্ছে একান্ত বেমানান। দেশের লোকের সঙ্গে আগের মতো প্রাণ খুলে সে কিছুতেই মিশতে পারতো না। এ যেন মহাসমুদ্র থেকে ডোবায় এসে পড়া। কোথায় যেন তার কেটে গেছে, কোথায় যেন এসেছে আগাগোড়া পরিবর্তন। নিজ বাসভূমে যেন পরবাসী অনঙ্গ দাশ।

তবু তার নিজের কথা বড়ো নয়। আরও বেশি করে তার ভাবনা হতো প্যাট্রিসিয়ার জন্যে। অনঙ্গ জানে ইংরেজ স্ত্রী প্রেমের খাতিরে সমস্ত সহ্য করবে, তবু মুখ ফুটে প্রতিবাদ জানাবে না। কিন্তু অনঙ্গ তো ভালো করেই বুঝতে পারে এ যেন অনেক জলের মাছকে বালতিতে বন্দী করে রাখা। এতো আদরে সম্মানে থেকেও তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে হচ্ছে প্যাট্রিসিয়া। আত্মীয়স্বজন তার প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ, হিন্দু সমাজ তাকে নিয়ে গর্ব করবে। কিন্তু আসলে কী পেলো প্যাট্রিসিয়া! একে একে উৎসর্গ করলো তার সমস্ত কিছু। তার আনন্দ, তার স্বাধীনতা, তার সংস্কার। অথচ মনের দিক থেকে উন্নতি হলো না কোনো। শুধু শ্বশুরকে তেল মাখিয়ে সংকীর্ণ পরিবেশে দিনের পর দিন বন্ধ করে রাখলো মনের প্রসার। ইংরেজ মেয়ের মুক্ত জীবন-ধারার প্রচণ্ড তোড়ের কথা যে জানে সে বুঝতে পারে এ ত্যাগ কতো মর্মান্তিক। অনঙ্গ দাশ প্যাট্রিসিয়াকে তার স্বাধীন মনের জন্যেই বিয়ে করে গর্ব অনুভব করেছিলো। কিন্তু কোথায় গেলো আজ তার সেই চঞ্চল উন্মুক্ত স্বাধীন প্যাট্রিসিয়া! এ যেন অন্য মানুষ। এর তেজ নেই, হাসিতে সে-দীপ্তি নেই, চলায় সে ছন্দ কবে হারিয়ে গেছে। না, এদেশে অনঙ্গ দাশ এই অর্ধমৃত স্ত্রী নিয়ে বাস করতে কিছুতেই পারবে না। আর তার নিজেরও কষ্ট হচ্ছে বেশ। সে যেন বড়ো তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। মাথায় থাক আত্মীয়স্বজনের প্রশংসা আর সমাদর। দেশের সমাজকে সে সহ্য করে, সংস্কার আনন্দে মেনে নেয়, কিন্তু অন্যকে জোর করে কূপে ঠেসে, নিজের সংস্কারের বোঝা অকারণে মাথায় চাপিয়ে করতালি দিতে চায় না। নিজে বাঁচবার জন্যে, স্বাধীন মনের ইংরেজ প্যাট্রিসিয়াকে পরিপূর্ণভাবে পাবার জন্যে অনঙ্গ ঠিক করলো বিলেত ফিরে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে আবার নতুন করে ব্যবসা শুরু করবে।

দেশে মাঝে মাঝে সুবিধামতো বেড়িয়ে যাবে বটে কিন্তু চিরকাল বাস করবার জন্যে আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না।

একদিন সে সটান বললো, প্যাট প্রস্তুত হয়ে নাও, মাস তিনেকের মধ্যে বিলেত যেতে হবে।

সে রসিকতা করছে মনে করে প্যাট্রিসিয়া বললো, শ্বশুরের শরীর ভালো নেই, আমারও বিলেত দেখবার আর ইচ্ছে নেই, যেতে হয় তুমি যাও, শ্বশুরকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না।

ড্যাম ইউর শ্বশুর-ভাসুর, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখছো, কী ছিলে আর কী হয়েছো, সে-খবর রাখো ?

কিছু বুঝতে না পেরে প্যাট্রিসিয়া বললো, তুমি কী বলতে চাও ?

আমি বলতে চাই তুমি এভাবে খাঁটি বাঙালী মেয়ের মতো থেকে শরীর-মন নষ্ট করতে পারবে না !

আমার শরীর-মন দুই ঠিক আছে। এসব বাজে ভাবনা না ভেবে ওকালতিতে আরও ভালো করে মন দাও, মক্কেল বাড়াবার চেষ্টা করো।

এদেশে আমি থাকতে পারবো না।

প্রায়ই তুমি সেকথা বলো। নিজের দেশে যে থাকতে পারে না, আমরা তাকে বলি হৃদয়হীন বর্বর।

থামো, তা তুমি দেশ ছেড়ে আছো যে ?

স্বামীর জন্যে, কর্তব্যের জন্যে।

অনঙ্গ দাশ বললো, আমি বিলেত ফিরে যাবোই।

কেন ? আমার সুখ তোমার সহ্য হচ্ছে না বুঝি ?

সুখ-দুঃখ বুঝি না। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি তিল তিল করে ক্ষয়ে যাচ্ছো। এমন করে বেঁচে থাকবার কোনো মানে হয় না।

একটু ভেবে স্বামীর কাঁধে দুই হাত রেখে প্যাট্রিসিয়া বললো, বেশ বয়স হয়েছে তোমার। অবুঝ হয়ো না। বিশ্বাস করো, দেশে থাকতে আমি বুঝতে পারি নি যে সংসার এতো মধুময় হয়। এতো বুকভরা স্নেহমায়া এতো সহজে

পাওয়া যায়। তোমাদের সংসারে প্রত্যেকের এই ভালোবাসা আমাকে জীবনের অনেক কিছু শিখিয়েছে। আমাকে গড়বার মন্ত্র দিয়েছে। এমন করে বারবার এ সংসার ছেড়ে যেতে বলে তুমি আমাকে শুধু ভেঙে দেবার কথা বোলো না।

আরে দুত্তোর ভাঙা-গড়া। দুদিনেই দেখছি মিনমিনে বাঙালী মেয়ের মতো প্যানপ্যান করতে শিখেছো। ওসব আমি শুনতে চাই না। একপাল কালো কুচ্ছিত লোকের সঙ্গে এমন করে কিছুতেই আর থাকতে পারবো না—

কি বলছ অনঙ্গ! তোমার নিজের—

থামো থামো, তুমি থাকতে চাও, শ্বশুরের গায়ে তেল মাখিয়ে জন্ম জন্ম থাকো আমি তিনমাসের মধ্যে ফিরে যাবো।

আবার বিলেত। সেই শান্তির সংসার ছেড়ে আসতে বুক ভেঙে গিয়েছিলো প্যাট্রিসিয়ার। কিন্তু তার শ্বশুর বোঝালেন, ও আমার পাগলা ছেলে। ওর মতেরও ঠিক নেই, পথেরও ঠিক নেই। তুমি যাও মা। দুদিন পরে ও আবার ফিরে আসবে, তখন আবার এসো। যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে।

কিন্তু দেখা আর হলো না। বিলেতে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়া গেলো যে তিনি আর ইহলোকে নেই। সেই শোকে শাশুড়ীও শয্যা নিলেন। আর উঠলেন না।

অনঙ্গ দাশের বাবা উইল করে গিয়েছিলেন বাড়িতে তিন ভাইদের সমান অংশ। অনঙ্গ দাশ নিজের অংশ বিলেতে বসেই অন্য ভাইদের কাছে বিক্রি করে টাকা আনিয়ে নিলো। আর তারপর ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেলো তার।

হয়তো তখন সেই সমস্ত টাকা ব্যবসায় খাটাতো অনঙ্গ কিন্তু প্যাট্রিসিয়ার অনুরোধে আড়াই হাজার পাউণ্ড দিয়ে ক্যাম্পডেন টাউন অঞ্চলে বাড়ি কিনলো। আশেপাশে অনেক নিগ্রো বাসিন্দা হলেও বাড়ির ভিত ভালো, গাঁথুনি দৃঢ়। আজও সেই বাড়িতেই আছে অনঙ্গ আর প্যাট্রিসিয়া।

ফিরে এসে ব্যবসায় শেষ অবধি কিছু হলো না। অনেক টাকা নষ্ট হলো শুধু! তাই বাধ্য হয়ে এই বাড়িটা ছাড়া আর সর্বস্ব খুইয়ে অনঙ্গ দাশ ইণ্ডিয়া হাউসে কেরানীর চাকরি নিলো।

কিন্তু কেরানী হলে হবে কি, তার দাপটে পাষাণ ফাটে ইণ্ডিয়া হাউসের। স্বয়ং হাইকমিশনার মাঝে মাঝে ঘাবড়ে যায়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর আটতলা ইণ্ডিয়া হাউস লাফিয়ে লাফিয়ে চষে বেড়ায় অনঙ্গ দাশ আর বাঙালী কর্তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে সুযোগ পেলেই জোরে জোরে বলে, যে শালা বাঙালী এবার আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে আসবে, মারবো তার মুখে এক লাথি। দেশ স্বাধীন হবার পরও দেখছি ইণ্ডিয়া হাউসের বাঙালীগুলো ভেড়াই রয়ে গেলো। আমার পাল্লায় পড়লেই টিট হয়ে যাবে।

হয়তো ওই টিট হয়ে যাবার ভয়েই অনেকে সসম্মানে এড়িয়ে চলে অনঙ্গ দাশকে।

ক্যাম্পডেন টাউনের নামে লণ্ডনের বনেদী পাড়ার বাঙালী বাসিন্দারা নাক সিঁটকায়। ওটা নাকি ছোটোলোকের পাড়া। তা হোক, কিন্তু এ পাড়ায় থেকে সুখ আছে। জিনিসপত্রের দাম অন্য পাড়ার তুলনায় কিছু কম। আশে-পাশের লোকগুলো ভালো। ভারতীয়দের সহসা অবজ্ঞা করে না তারা। মাঝে মাঝে রাত্তিরে নিগ্রোরা রাস্তায় একটু বেশি হৈ-হল্লা করে বটে কিন্তু একেবারে মাত্রা ছাড়াবার উপায় থাকে না তাদের। ক্যাম্পডেন টাউনে পুলিসের সংখ্যা বোধ হয় একটু বেশি।

অনঙ্গ দাশের সুন্দর দোতলা বাড়ি। রাস্তার নাম স্ট্রাটফোর্ড ভিলাজ। নিচে দুটি ঘর আর রান্নাঘর, বেশ অনেকখানি উঠোন। ওপরেও দুটি ঘর আর বাথরুম। বাড়ির সামনে অনেকখানি জায়গা। সেখানে সুন্দর বাগান করা হয়েছে।

কেউ কেউ যখন এই ক্যাম্পডেন টাউন পাড়াকে ঠাট্টা করে বলে, নিগ্রোর পাড়া, তখন অনঙ্গ দাশ সেখানে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে মুখভঙ্গি করে তাদের শুনিয়ে দেয়, কী সব সাহেবের দলরে কালো ভূতগুলো, শাদাদের মাঝে যেন

জোনাকির মতো জলে! ওদের আবার সাহেবপাড়ায় থাকা চাই। বদমাইশ ইংরেজ পোঁছে না বেটাদের তবু ওদের পা চাটা চাই। যেন রায় বাহাদুর রায় সাহেব হবে বেটারা। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে সে খেয়াল নেই।
যাহোক বাড়ি কিনে আর ব্যবসায় বারবার লোকসান দিয়ে অনঙ্গ দাসের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে গেলো বৈকি। আগে তার টাকার অভাব একেবারেই ছিলো না। প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে যখন যেখানে খুশি বেড়াতে গেছে, দুহাতে ইচ্ছেমতো খরচ করেছে। কিন্তু এখন বড়ো টানাটানি, খুব সাবধানে চলতে হয়! তাই সে ঠিক করলো পেয়িংগেস্ট রাখবে বাড়িতে। এখানে তো অনেক বাঙালী অমন অতিথি রেখে বেশ দু পয়সা করে নেয়। প্যাট্রিসিয়া উৎসাহ দিয়ে বললো, ভালো কথা, তিন-চারজন গেস্ট তুমি অনায়াসেই নিতো পারো। বাঙালী হলেই ভালো হয়। আমি তাদের দেখাশোনা করতে পারবো।
সহজেই কয়েকজন বাঙালী ছাত্র পাওয়া গেলো। প্রথম কয়েকদিন তারা বেশ থাকে। কিন্তু অনঙ্গ দাশের যা মেজাজ! মাসখানেক পর তারা পালাতে পথ পায় না। আর বাইরে বেরিয়ে বলে বেড়ায়, আরে দূর মশাই, ওখানে অতো খরচ করে কে থাকবে। একে নিগ্রোর পাড়া, তার ওপর একেবারে অমার্জিত ওই অনঙ্গ দাশ। দিনরাত বকবক করে অস্থির করে তোলে, সব বিষয়ে নাক গলিয়ে কেবলই অহেতুক কৌতূহল দেখায়। তবে হ্যাঁ, মিসেস দাস খুব ভালো লোক। তাঁর ব্যবহারের জন্যে তো টিঁকে ছিলাম ওখানে।
এই সব ব্যাপারের পর অতিথি পাওয়া দাশের পক্ষে অসম্ভব হলো। কারোর হাতে-পায়ে ধরবার লোক সে নয়। তাই চোখ বন্ধ করে প্যাট্রিসিয়াকে বললো, আমার বাপের বাড়িতে অনেক বছর দিব্যি আরাম করেছো, এখন একটু কষ্ট করো, উপায় কি!
কোনো উপায় নেই সে কথা খুব ভালো করে জানতো প্যাট্রিসিয়া। সে আরও জানতো যে আর কোনোদিন কোনো উপায় হবে না। দিন দিন ধাপে ধাপে আরও নেমে যেতে হবে। তাই মনে মনে প্রস্তুত হয়ে সে নিজে একটা চাকরির চেষ্টা করছিলো।

প্যাট্রিসিয়া অনঙ্গ দাশকে ইণ্ডিয়া হাউসে এক রকম জোর করেই চাকরি নিতে রাজী করিয়েছিলো। প্রথমে খুব বেশি আপত্তি ছিলো দাশের।

হো হো করে সে হেসে প্যাট্রিসিয়াকে বলেছিলো, যাদের এদেশে কিচ্ছু হয় না তারা ও গোয়ালে ঢোকে।

কিন্তু চলবে কেমন করে? শ্বশুরের দেওয়া সমস্ত গয়না তো তুমি ব্যবসার জন্যে বিক্রি করেছো। আমার তো আর কিছু নেই।

এবার ফাইনানসার খুঁজছি, ইণ্ডিয়ানদের একটা নাচ-গানের ক্লাব খুলবো।

অনেক হয়েছে, চাকরি যদি পাও তো এখুনি নিয়ে নাও। তা না হলে আমি আর চালাতে পারবো না।

প্রথমে কেরানী না হলে ইণ্ডিয়া হাউসে এখান থেকে আর কোনো চাকরি হয় না।

ক্ষতি কি, ভালো কাজ করলে তাড়াতাড়ি উন্নতি হয়ে যাবে। হাইকমিশনার তো তোমার বন্ধু।

আরে আমার বন্ধু তো বিশ্বসুদ্ধ লোক। যার সঙ্গে কথা বলি সেই ধন্য হয়ে যায়। কিন্তু হাইকমিশনার বন্ধু বলেই তো মুশকিল। তার সঙ্গে দুবেলা আড্ডা দিয়েছি কিনা, এখন ওর কেরানী হয়ে ওকে তোয়াজ করি কেমন করে।

তাতে কি হয়েছে, প্যাট্রিসিয়া জোর দিয়ে বলে, চাকরি নাও ডার্লিং, না হলে আমি চোখে অন্ধকার দেখছি।

চাকরি তো শেষ অবধি নিলো অনঙ্গ দাশ। কিন্তু প্যাট্রিসিয়ার তাতে বিশেষ কিছু লাভ হলো না। সপ্তাহে অনঙ্গ পাঁচ পাউণ্ডের কম পায় অথচ তার চলা-ফেরার ধরন দেখে মনে হয় তার আয় পঞ্চাশ পাউণ্ডের কাছাকাছি। আসলে অনঙ্গ কাউকে জানাতে চায় না যে সে টাকার জন্যে বাধ্য হয়ে চাকার করছে। কেউ যখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, ওকি আপনি এখানে চাকরি করছেন? তাড়াতাড়ি অনঙ্গ দাস তার ঘাড়ে হাত রেখে বুঝিয়ে দেয়, শখ করে ভাই, দেখি না গোয়ালটা কি রকম, শীগগিরই ছেড়ে দেবো।

ব্যবসা কি হলো আপনার?

বড্ডো খাটুনি। আর এই জাত বেনেদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সোজা? বুঝলে না, আমরা হলাম বড়ো ঘরের লেখাপড়া-জানা ছেলে।

আর বেশি কথা বাড়ালে অনঙ্গ দাশের কাছ থেকে প্রচণ্ড তাড়া খেয়ে সরে পড়ে সেই লোক।

অত খবরে তোমার দরকার কি হে গাঁইয়া ভূত? যেন হুই বারৈপুর থেকে এই এলে। নিবাস কোথায়? পিতার নাম কি? চালের মন কত? খুঁটিয়ে হাঁড়ির খবর নেওয়া—যতসব এসে জোটে এই হাই কমিশনারের গোয়ালে!

হয়তো অনঙ্গ দাশ মাইনের পুরো টাকা প্যাট্রিসিয়ার হাতে তুলে দিলেও তার পক্ষে সহজভাবে সংসার চালাবার অসুবিধা হতো। বাড়িভাড়া লাগে না বটে কিন্তু মাত্র চার পাউণ্ড কয়েক শিলিংএ দুজনের সমস্ত খরচ চালানো লণ্ডনে সম্ভব নয়। অনেকদিন আগেও ছিলো না। তাই স্বামীকে কিছু না বলে প্যাট্রিসিয়া নানা জায়গায় চাকরির চেষ্টা করতে লাগলো।

ভারতবর্ষ থেকে ঘুরে না এলে, স্বামীব আয় বেশি হলেও প্যাট্রিসিয়া আরও আগে চাকরিতে ঢুকতো! ছেলেপিলে নেই সংসারে, এমন কিছু কাজের চাপও নেই। লেখাপড়া-জানা ইংরেজ মেয়ে হয়ে শুধু শুধু ঘরে বসে স্বামীর অন্ন ধ্বংস করতে তার বেধে যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে গিয়ে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কেমন যেন স্বামীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে সাধ জাগে। তাই প্রথমে চাকরি করবার কথা সে ভাবতে পারে নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে ভাবতে হলো। চাকরি হলো তার এক আমদানি-রপ্তানি আপিসে। প্যাট্রিসিয়া ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছে শুনে, খুশি হয়ে ম্যানেজার বললো, তোমার মতো লোকই আমরা খুঁজছিলাম।

সন্ধ্যেবেলা খবর শুনে জলে উঠলো অনঙ্গ দাশ, স্বভাব যাবে কোথায়? ঘরে আর মন টিকছে না বুঝি? আপিসের নাম করে বেরিয়ে এখন নিত্য নতুন লোক জোগাড় করতে হবে।

কথা শুনে প্যাট্রিসিয়া চিৎকার করে বললো, বাজে কথা বোলো না। চাকরি না করলে চলবে কেমন করে শুনি?

সেকথা তোমাকে ভাবতে হবে না। যা হয় আমি করতাম—
তোমার দৌড় আমার জানা আছে। খালি বড়ো বড়ো কথা বলে তোমার দিন চলতে পারে, আমার চলে না!
থামো, দুদিন কষ্ট করে একেবারে মরে যাচ্ছিলে নাকি?
শুধু শুধু কষ্ট সহ্য করতে যাবো কেন? লেখাপড়া শিখেছি, সংসারে তেমন কাজ নেই, চাকরি করতে বাধা কোথায়?
সব বুঝি আমি, হাত-পা নেড়ে মুখভঙ্গি করে অনঙ্গ দাশ বললো, তোমাদের স্বভাব আমার নখদর্পণে। চাকরি না করলে লোক জোটাবার সুবিধা হচ্ছে না বুঝি? টু হ্যাভ এ নাইস টাইম?
সকলের স্বভাব তোমার মতো নয়। আর জেনে রাখো যে তোমার সঙ্গে এতোদিন ঘর করে পুরুষজাতের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।
ওসব কথা আমাকে শোনাতে এসো না, পুরুষের ওপর ঘেন্না ধরবে তোমাদের দেশের মেয়েদের? এই আজ লিখে দিচ্ছি, দুদিন পরং তুমি এসে বলবে, অমুকের সঙ্গে আজ আপিসে আলাপ হলো, কাল আমাকে নেমন্তন্ন করেছে, নাইস ম্যান। ব্যাস তারপর শুরু হবে গলা জড়িয়ে পার্কে পড়ে থাকা, না হয় নাকাল ধরে নাচা—জাতের স্বভাব যাবে কোথায়?
বেশ, আমার যা খুশি আজ তাই করবো।
সেই কথাটা প্রথমে স্বীকার করলেই তো হতো।
প্যাট্রিসিয়া উত্তর দিলো না। কি কথা বলবে সে এমন স্বামীর সঙ্গে—এতোটুকু সহানুভূতি নেই যার। কেবলই খুঁত ধরবার চেষ্টা। সংসারের ভাবনায় ঘুম হয় না প্যাট্রিসিয়ার সেকথা কি কোনোদিন বুঝবে অনঙ্গ! যদি বুঝতো তাহলে এমন করে অকারণে বার বার তাকে আঘাত করতে পারতো? এমন মানুষ জীবনে দেখে নি প্যাট্রিসিয়া। তার চোখে হঠাৎ কখন জল জমে ওঠে।
প্যাট্রিসিয়ার চাকরি পাবার খবর অনঙ্গ দাশের বুকে বড় আঘাত দিলো। অবশ্য মুখে একথা প্রকাশ করবার লোক সে নয় কিন্তু মনে মনে বেশ ভালো করে বুঝলো যে তারই অক্ষমতার জন্যে এই এমন কাণ্ড ঘটলো। সে জানে যে

সত্যি তার যৎসামান্য উপার্জনে দুজনের সংসার-চলা কঠিন। কিন্তু এই অবিচারের জন্যে অনঙ্গ দাশ কী করতে পারে। লেখাপড়া সে যথেষ্ট শিখেছে, ওকালতিও পাশ করেছে আর তাছাড়া আরও নানা অভিজ্ঞতা তার আছে। এতো সব গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে হাই কমিশনারের কি উচিত হয়েছে ছেলে ছোকরাদের মতো তাকেও এক সাধারণ কেরানীর চাকরি দেওয়া। সে আবার এক কালে অনঙ্গ দাশের বন্ধু ছিলো। ইচ্ছে করলে কী-না করতে পারতো সে। উপায় নেই, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেক শান্ত হয়ে গেছে অনঙ্গ দাশ, তাই নিঃশব্দে এই অপমান সহ্য করলো সে। সে যদি দৈবদুর্বিপাকে এমন করে কাদায় না পড়তো তাহলে এই অপমানের প্রতিশোধে তুলো ধুনে দিতো হাইকমিশনারের। কার ধার ধারে সে এই লণ্ডন শহরে। অমন একটা গোটা বাড়ি কজন বাঙালীর আছে এখানে। অনঙ্গ দাশ শুধু সুযোগের অপেক্ষা করে। তার দৃঢ়বিশ্বাস সুযোগ একদিন আসবেই। আর তখন সে দেখে নেবে—হাইকমিশনার থেকে আরম্ভ করে আজ তাকে নিয়ে যারা ঠাট্টা তামাসা করে তাদের প্রত্যেককে। কিন্তু এখনও যখন সুযোগ এলো না আর তার পক্ষেও একেবারে মুখ বুজে বসে থাকা সম্ভব নয় তখন তার সমস্ত রুদ্ধ আক্রোশ পড়লো প্যাট্রিসিয়ার ওপর।

ওদিকে প্যাট্রিসিয়া আর স্বামীর রোজগারের ভরসায় বসে নেই। সে মহা উৎসাহে নিয়মিত অফিসে বেরোতে লাগলো। আর এই বাইরের জীবন যেন তার ক্ষতবিক্ষত মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিলো বার বার। হঠাৎ সে নতুন করে উপলব্ধি করলো যে কাজের চেয়ে বড়ো বন্ধু মানুষের আর কেউ নেই। দৈনন্দিন কলহ অশান্তি, নিরন্তর ভুল-বোঝাবুঝি, অলীক অহঙ্কারে সংকীর্ণতার দেওয়ালে মাথা ঠোকাঠুকি কাজের স্রোতে সমস্ত কিছু যেন তৃণের মতো ভেসে যায়। তাই সবকিছু ভুলে অশান্ত আগ্রহে প্যাট্রিসিয়া সেই কাজের সমুদ্রে ডুব দিলো। কিন্তু তবু মুক্তি নেই। সংসারে প্রবেশ করলেই অনঙ্গ দাশ যেন তাকে টেনে ওপরে তুলে আবার তুচ্ছতার প্রাচীরে আছাড় মারে। আবার সেই জ্বলুনি, প্যাট্রিসিয়ার সারা মন ঠিক তেমনি করে জ্বলতে আরম্ভ করে। চাকরি

হবার পর থেকে সে লক্ষ্য করছে যে তার স্বামী অফিস থেকে সোজা বাড়ি আসে। আগে রাত্তির আটটা-নটার আগে তার দেখা পাওয়া যেতো না। হঠাৎ অনঙ্গর এই সুবোধ বালক হয়ে ওঠার কি কারণ সেকথা প্যাট্রিসিয়া প্রথমে বুঝতে পারে নি। অবশ্য খুব অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

একদিন সন্ধ্যায় সে বাড়ি আসতেই কঠিন স্বরে অনঙ্গ দাশ জিজ্ঞেস করলো, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

অফিসে, শান্তস্বরে উত্তর দিলেও প্যাটিসিয়ার মনে ততক্ষণে আগুন ধরে গেছে।

তোমার চাকরিটা কি শুনি? নাইট ক্লাবের নাচিয়ে নাকি?

সেই চাকরি পেলে ভালো হতো। তোমার যোগ্য স্ত্রী হলে তা ছাড়া আর কী করতে পারতো বল?

শাট আপ ইউ আগলি বিচ্।

গলার স্বর আর একটু তুললেই আমি পাড়ার লোক ডেকে সাহায্য চাইবো।

ডাকো তোমার পেয়ারের পাড়ার লোকদের। এক-এক লাথি মেরে শেষ করে দেবো সকলকে। বুড়ো বয়সে মিন্সে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লজ্জা করে না? একদিন নয়, আমি নিজের চোখে চার পাঁচদিন দেখেছি। বল কে সে, চার্জ অব অ্যাডালটারি এনে চাবুক মেরে বাড়ি থেকে বের করে দি।

মামলা তোমার আগে আমিও আনতে পারি, পাগলের প্রলাপ নিশ্চয়ই কোর্ট শুনবে না। তুমি যদি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও, ঠাণ্ডা মাথায় স্থির হয়ে জিজ্ঞেস করো।

কার সঙ্গে তুমি রোজ সন্ধ্যেবেলা ঘোরো?

কারো সঙ্গে আমি রোজ সন্ধ্যেবেলা ঘুরি না।

আবার মিথ্যা কথা। আমি নিজে দেখছি—

রোজ তুমি দেখতেই পারো না, ঠিক দুদিন দেখেছো—

আরে হ্যাঁ, সে কে তাই বল না ছাই?

আমাদের ম্যানেজার হার্বাট ক্রাই। তুদিন তিনি নিজের মোটরে কি কারণে আনতে পারেন নি; তাই শুধু আমি একা নই, অফিসের আরও তুএকজন তিনি ট্যাক্সি না পাওয়া অবধি তার সঙ্গে থাকতাম গুড নাইট জানাবার জন্তে। একটু থেমে টিপে হেসে প্যাট্রিসিয়া বললো, তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছিলে যে অতো ছেলে-বন্ধু নিয়ে আমি খুব ফ্লার্ট করে বেড়াচ্ছি!

সেকথা কানে না তুলে মুখ বেঁকিয়ে অনঙ্গ বললো, কিন্তু আজ বাড়ি ফিরতে এতো রাত্তির হলো কেন?

রাত্তির এমন কিছু হয় নি, এখনও আটটাও বাজে নি।

আরে দূর, তাই বা বাজলো কেন বলো না ছাই?

অফিসারদের মিটিং ছিলো তাই থাকতে হয়েছিলো!

বাজে কথা বলবার জায়গা পাওনি, অফিসারদের মিটিংএ কেরানীরা থাকে নাকি!

তুমি বোধ হয় একটা খবর জানো না, মুচকি হেসে প্যাট্রিসিয়া বললো, আমি আর কেরানী নই, মাস খানেক আগে অফিসারস গ্রেডে প্রমোশন পেয়েছি।

কথা শুনে অনঙ্গ দাশের মুখে একটা কালো ছায়া নেমে এলো, কিন্তু পরমূহূর্তেই দ্বিগুণ জ্বলে উঠে সে বললো, তা আর পাবে না? বিয়ে হয়ে গেছে যে—খেয়াল থাকে নাকি তোমার? ম্যানেজারের সঙ্গে অতো ঘোরাঘুরি আর এটা-ওটা করে উন্নতি করতে লজ্জা করে না তোমার?

না।

কী বললে?

কিছু না। দয়া করে তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো না! আমাকে বিশ্রাম করতে দাও, হঠাৎ করুণ চোখে প্যাট্রিসিয়া অনঙ্গ দাশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সামান্ত ছুতো নিয়ে এমনি তর্কাতর্কি প্রায়ই হতে লাগলো। এবং বলা বাহুল্য তুজনে যেন পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যেতে লাগলো। অনঙ্গ দাশ যাই ভাবুক না কেন, প্যাট্রিসিয়া স্বামীর কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাবার

কথা বারবার ভাবলো। এই চিড়-খাওয়া সম্পর্ক নিয়ে কিছুতেই তার পক্ষে অনঙ্গর সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। আর তার নিজেরও মেজাজ যা হয়েছে যে কোনোদিন হয়তো একটা খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। তার আগে সতর্ক হয়ে সরে যাওয়া ভালো।

কিন্তু কেমন করে যাবে প্যাট্রিসিয়া! আজও তার মনের কোনায় কী যেন জমা করা আছে অনঙ্গের জন্যে। সে চলে গেলে অনঙ্গ বাঁচবে কেমন করে। না, মনের মাঝে যা আছে তাকে নিশ্চয়ই কেউ প্রেম বলবে না, মনের সে কোমল অনুভূতি অবুঝ বর্বরের মতো বার বার আঘাত করে করে চুরমার করে দিয়েছে অনঙ্গ দাশ। হয়তো প্যাট্রিসিয়ার কর্তব্য-জ্ঞান প্রবল বলে আজ এত কাণ্ডের পরও হঠাৎ সংসার ছেড়ে চলে যেতে তার বেধে যায়। সে নিশ্চিত জানে এই পৃথিবীতে একটি লোকও সহ্য করবে না অনঙ্গকে, কোনো বন্ধু সহানুভূতি জানাবে না কোনো দিন। কেমন করে মানুষের স্নেহ প্রেম ভালোবাসা পেতে হয় তা জানে না তার স্বামী। তাই সে চলে যেতে ইতস্তত করে। কিন্তু আস্তে আস্তে সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো ভাঙবার সময় এসেছে—অনঙ্গ বাঁচুক কি মরুক সে ভাবনা ভাবলে আর চলবে না তার। তাকে বাঁচতে হবে। জোড়াতালি দিয়ে জোর করে আর কিছুদিন একসঙ্গে থাকবার চেষ্টা করলে প্যাট্রিসিয়া নিজে নিঃসন্দেহে শেষ হয়ে যাবে। তাই বাঁধন ছিন্ন করবার জন্যে সে মনে মনে প্রস্তুত হতে লাগলো।

চঞ্চলের বিয়ের খবর পেয়ে অনঙ্গ দাশ ভাবলে সটান তার বাড়ি গিয়ে দু-এক ঘা মেরে আসে। কিন্তু সেই শাদা মেয়েটা রয়েছে যে। ওদের মুখ দেখতে চায় না অনঙ্গ। টেলিফোনে গালাগাল করে মনের সাধ মিটবে না, তাই নম্বর জানা থাকলেও সে রিসিভার তুললো না। একজনকে দিয়ে খবর পাঠালো চঞ্চলের বাড়িতে কিন্তু সে এসে জানালো ওদের দেখা পাওয়া গেল না, বাড়িতে চিঠি লিখে রেখে এসেছে। এ ব্যাপারের পর চিঠি পেয়ে চট করে দেখা করবার ছেলে চঞ্চল নয়। সে নিশ্চয়ই জানে যে অনঙ্গ দাশ তার স্ত্রীকে

'বৌমা' বলে বরণ করবে না বরং ঠেলা মেরে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। চঞ্চলকে যখন কিছুতেই হাতের কাছে পাওয়া গেল না তখন অনঙ্গ দাশের যতো রাগ গিয়ে পড়লো প্যাট্রিসিয়ার ওপর।

বুধবার সন্ধ্যেবেলা সে যথাসময়ে বাড়ি এলো। তার আগে প্যাট্রিসিয়া ফিরে এসেছে। সেকথা বুঝতে পেরে বাড়িতে ঢুকেই অনঙ্গ দাশ আপন মনে চেঁচাতে আরম্ভ করলো—নাঃ, এ হতচ্ছাড়া দেশে চরিত্র ভালো রেখে চলাফেরা করা যায় না, বদমাইস মেয়েমানুষগুলো শিকার ধরবার জন্যে স্কার্ট তুলে চারপাশে দিনরাত ঘুর ঘুর করছে—

প্যাট্রিসিয়া লেডিজ হোম জার্নাল পড়ছিলো। অনঙ্গ দাশের কথা যেন সে শুনতে পায়নি এমন ভাব করে মাথা না তুলে শুধু পাতা ওলটালো। তাকে ভ্রূক্ষেপ করলো না দেখে অনঙ্গ গলার স্বর আরও এক পর্দা চড়ালো, বেশ্যার দল সব, এদেশের প্রত্যেকটি মেয়ে সারা জীবনে কত দেশের কত লোককে পার করে তার ঠিক নেই। হারামজাদীরা যেন জ্যান্ত লীগ অব নেশন্স—তবু কথা বললো না প্যাট্রিসিয়া।

সিগ্রেট হাতে অনঙ্গ দুই এক মিনিট পায়চারি করে আবার আরম্ভ করলো, তা যা খুশি নিজের দেশের লোকের সঙ্গে কর, আমাদের দেশের ভালো ভালো ছেলেদের মাথা চিবিয়ে কী লাভ হয় তোদের? একটু থেমে প্যাট্রিসিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ও বললো, না না, তা না খেলে চলবে কেন, শালীদের মাথায় নিয়ে এদেশের শালারা তো আর ইণ্ডিয়ানদের মতো নাচবে না। কন্টিনেন্টের সবচেয়ে বড়ো হোটেলে রাখবে, দামী দামী সিটে বসিয়ে ব্যালে থিয়েটার সিনেমা দেখাবে—এদেশের অভদ্র বাড়ির বেশ্যাগুলোকে অতো সুখে রাখতে দায় পড়েছে হুঁশিয়ার বেনে ইংরেজ বাচ্চার।

হঠাৎ রাগে প্যাট্রিসিয়ার চোখ লাল হয়ে গেল। মাথা তুলে অনঙ্গ দাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বললো, শোনো, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমার সামনে অভদ্রের মতো যা-তা গালাগাল করতে পারবে না—বুঝেছো? কী সুখেই মাথায় করে রেখেছো আমাকে বুঝতে পারছো না?

লাথি মেরে বের করে দিচ্ছি না তাই ঢের। আমার বাড়িতে থেকে অন্য লোকের সঙ্গে শুতে লজ্জা করে না তোমার ?
শাট আপ। সকলে তোমার মতো লম্পট নয় যে স্ত্রীর গয়না চুরি করে বেশ্যা নিয়ে ফুর্তি করবে—চোর বদমাইস জোচ্চোর—
কী—কী বললে ? কে কার গয়না চুরি করেছে বলো ? নাহলে আমি আজ খুন করবো তোমাকে—
ব্যবসার নাম করে আমার সমস্ত গয়না আত্মসাৎ করো নি তুমি ?
গয়নাগুলো তোমার বাপের বাড়ি থেকে এনেছিলে বুঝি ? তোমার চৌদ্দ পুরুষের কেউ অমন জিনিস চোখে দেখেছে ?
না, আর আমার চৌদ্দ পুরুষের কোনো মেয়ে তোমার মতো পশু দেখে নি। কিন্তু গয়নাগুলোয় তোমারও কোনো অধিকার ছিলো না, আমার শ্বশুর-শাশুড়ী নিজের হাতে আমায় দিয়েছিলেন।
যা ভোল্ ধরেছিলে দেশে গিয়ে—কয়েক বছর সেই ভোল্ দেখে তাঁরা গলে গিয়েছিলেন। বেঁচে থাকলে আজ একবার তোমার আসল স্বরূপ দেখে যেতে বলতাম।
তাঁরা তোমার মতো অমানুষ ছিলেন না! ওই বাপ-মায়ের এমন রত্ন ছেলে কেমন করে হয় তাই ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই। একটা কথা তখন তোমাকে বলিনি কিন্তু আজ বলছি। আমাকে দেখে তোমার বাবা কী বলেছিলেন জানো ? কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো প্যাট্রিসিয়া, বলেছিলেন, এমন লক্ষ্মী প্রতিমা তুমি, কী দেখে ও বাঁদরটাকে বিয়ে করলে ? ওর হাতে পড়ে তোমাকে যে সারা জীবন জ্বলতে হবে মা।
যখন মামলা করবে তখন ওসব কথা বানিয়ে বানিয়ে কোর্টে গিয়ে বোলো, এখানে ওসব কথা বলে কোনো লাভ নেই।
বানিয়ে বলতে হবে না, তোমার এখানকার ইণ্ডিয়ান বন্ধুবান্ধব আমার হয়ে সত্যি কথা বলে আসবে।
তা তো বলবেই। মুখে মধু ঝরিয়ে লোক হাত করবার কায়দা তোমাদের চেয়ে

ভালো আর কারা জানে! ওই সব বন্ধুবান্ধব যখন তোমাকে বিয়ে করেছিলাম তখন আমাকে বাড়ি এসে এদেশের মেয়ে বিয়ে করতে বারবার বারণ করেছিলো।

আমারও আত্মীয়স্বজন আমাকে ছেড়ে কথা বলে নি। তোমার জন্যে মা-বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছেদ করতে হয়েছে। আর জেনে রেখো, বিয়ে করে তোমার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি আমার হয়েছে!

থামো থামো, তোমাদের আবার ক্ষতি কি? একটা ছেড়ে আর একটা ধরতে কতক্ষণ সময় লাগে তোমাদের? তোমাদের আবার বিয়ে! আজ আছো কাল নেই। ভারতবর্ষে তো গিয়েছিলে, নিজের চোখে দেখে আসো নি বিয়ে কাকে বলে? ইতিহাসে পুরাণে অনেক সতীলক্ষ্মীর কথা লেখা আছে, স্বামীর জন্যে জীবনের শেষ দিন অবধি তারা অসাধ্য সাধন করে গেছে।

প্যাট্রিসিয়া বললো, আমার বিদ্যা তোমার চেয়ে কিছু কম নয়। ওসব বড়ো বড়ো কথা আমাকে শুনিও না। তেমনি স্বামী হলে যে কোনো দেশের স্ত্রী তার জন্যে সব করে থাকে। সীতার মতো স্ত্রী রামের মতো স্বামী না হলে হয় না—বুঝেছো। আর বর্বর স্বামীর জন্যে ভারতবর্ষের স্ত্রীরা দায়ে পড়ে কষ্ট সহ্য করে। উপায় থাকলে কিছুতেই করতো না। অক্ষম লম্পট স্বামীর হাতে লাথি-ঝাঁটা খেয়েও যারা মুখ খোলে না তারা মূর্খ—পুরাণ ইতিহাস কোথাও তাদের কোনো উল্লেখ থাকতে পারে না।

তা যাও না, বেরিয়ে গিয়ে একটা রামা শ্যামার মতো স্বামী যোগাড় করে নাও। ভূতের মুখে রাম-নাম। যত্তো সব—গট গট করে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে অনঙ্গ দাশ অন্য ঘরে গেল।

কিন্তু আজ পাট্রিসিয়ার যে খুন চেপে গেছে। সে সহজে থামতে চাইলো না, অনঙ্গকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগলো, দিন-রাত্তির আমার চরিত্র তুলে খোঁটা দেওয়া! কী ভাবো তুমি আমাকে? তোমার নিজের মতো? আমি কিছু জানি না নাকি? কেন আবার ফিরে এলে তুমি? আমার কষ্ট দেখে তোমার বুক একেবারে ফেটে যাচ্ছিলো! কী দরদ! স্কাউণ্ড্রেল, তুমি

নিজে ফুর্তি করতে ফিরে এসেছিলে। বাপ-মায়ের সঙ্গে থেকে সেখানে তোমার বদমাইশির স্থবিধা হচ্ছিলো না। ব্যবসা করবেন। উঃ ক্ষমতা কতো! আমার গয়না বিক্রি করে ব্যবসার জন্তে উনি প্যারিস গেলেন। আমি খবর পাই নি নাকি? সঙ্গে গেল পিকাডিলির সেই বার-মেইড। যতো ছোটলোক বাজে মেয়েমানুষের সঙ্গে মিশে মিশে তাদের সঙ্গে কথায় কথায় আমার তুলনা করতে লজ্জা করে না তোমার?

শাট আপ, পাশের ঘর থেকে অনঙ্গ দাশ যেন হুঙ্কার ছাড়লো।

না চুপ করবো না। রোজ রোজ তুমি শুধু একা গালাগাল করে যাবে আর আমি চুপ করে থাকবো।

গেট আউট অব মাই হাউস।

যাবো বৈকি, নিশ্চয়ই যাবো, প্যাট্রিসিয়া উঠে দাঁড়াতে গেলো। কিন্তু পারলো না। দারুণ যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীর টলছে। আবার শব্দ করে সে সোফায় বসে পড়লো। আর হঠাৎ যেন তার নিজের অজ্ঞাতে এতদিনের রুদ্ধ অশ্রু কখন নিঃশব্দে দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলো।

ঈশ্বর কেন এমন হলো—আমার কেন এমন হলো—

সেই সোফায় মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো প্যাট্রিসিয়া!

বৃহস্পতিবার

চঞ্চলের বিয়ের ব্যাপার শুনে একটুও আশ্চর্য হয় নি সোমনাথ ব্যানার্জি। বরং চঞ্চল যদি এদেশে বিয়ে না করতো, যদি আর পাঁচজনের মতো কাজ গুছিয়ে সুবোধ বালকের মতো যথাসময়ে দেশে ফিরে যেতো তাহলেই সে অবাক হতো।

সোমনাথ চঞ্চলকে স্নেহ করে। সে বার বার লক্ষ্য করেছে যে চঞ্চলের সমস্ত শরীর ভরে যেন দুর্দম যৌবনের দীপ্তি ফুটে ওঠে। তারপর তার সঙ্গে কথায় বার্তায় আলাপ আলোচনায় সোমনাথ বুঝেছে যে চঞ্চল সেই কথা ভাবে যে ভাবনা তাকে একদিন জীবনের পরিধি বাড়াবার ইঙ্গিত দিয়েছে।

তাই সোমনাথ মনে মনে ঠিক করলো চঞ্চলের সঙ্গে অনেক আলোচনা করতে হবে, তাকে নানা নির্দেশ দিতে হবে। কেন না সোমনাথ নিজে অভিজ্ঞ। তার জীবন প্রায় শেষ হয়ে এলো এদেশে। কাজেই তার কথার দাম আছে বৈকি!

এখন থেকে চঞ্চলকে সতর্ক করে দিতে হবে। তা না হলে অনঙ্গ আর আরও নানা লোক যাদের মতামত সংকীর্ণ, যারা যুক্তি দিয়ে কথা বলে না শুধু ভাব-প্রবণতার আবেগে একতরফা বিচার করে, তারা হয়তো একেবারে প্রথম থেকেই চঞ্চলের মন দুঃখ আর অবসাদের ভারে ম্লান করে দিতে পারে।

না, একটি লোকও সাহায্য করে নি সোমনাথকে। তারা তার নিন্দে করেছে, মাথা খারাপ বলেছে আর কেউ কেউ ব্রিটিশের ধামাধরা বলে এড়িয়ে গেছে।

এসব নিয়ে অবশ্য সোমনাথ দুঃখ করে না। বড়ো কাজ করতে গেলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর নানা বাধা তো আসবেই। আর সে যা করতে চায় তা তো একটি মানুষের কাজ নয়। কতো জীবন এমনি ব্যর্থতায় শেষ হয়ে যাবে তার ঠিক কি!

সোমনাথ যা চায়, যা ভাবে আর আজ সে যা পেয়েছে তা যদি এই পৃথিবীর অন্য সকলে চাইতো ভাবতো আর পেতো তাহলে কতো কঠিন

সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হয়ে যেতো। মানুষ আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারতো! কিন্তু কে বুঝবে, কে শুনবে সোমনাথের কথা!
তাই আজকাল মাঝে মাঝে সে শুধু নিজের কথা ভাবে। হয়তো তার চিন্তাশীল মন নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চায় সে কী দিলো, কী পেলো আর কী হারালো। এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সোমনাথের সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে যায়, মাথা হেলে যায় অব্যক্ত যন্ত্রণায়। অনন্ত-কালের জন্যে তার শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। কিছুতেই সে বুঝতে পারে না কেন এই ভাবনা যন্ত্রণা অবসাদ!
দৈবদুর্বিপাকে যখন আর দেশে ফিরে যাবার উপায় রইলো না তখন সোমনাথ দুঃখ করে নি, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফেলে ভারি করে তোলে নি তার লণ্ডনের রঙীন দিনগুলি। নিত্যনতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করে ক্ষণকালের জন্যে তার নিজেকে প্রবাসী বলে মনে হয় নি। সিন্ধুপারের নতুন আলাপীদের তার বড়ো আপনার বলে মনে হতো।
চোখ খুলে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো সোমনাথ, কতো কী জানবার আছে, কতো কী ছাড়বার আছে আর কতো কী দেবার, কত কী নেবার তার হিসাব রাখে কে। যৌবনের উৎসাহ আর তরুণ মনের প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে সোমনাথ চেয়েছিলো সংস্কৃতির বিনিময়। সোমনাথ সেই বয়সে মনপ্রাণ দিয়ে শুনেছিলো মহামিলনের গান। দুঃখ, দৈন্য, জাতিগত অহঙ্কার, রাজনৈতিক সমস্যা, চিরন্তন সংকীর্ণতা—সকল কিছুর উর্ধ্বে মানুষের স্বাধীন মন। সেই মন দিয়ে সোমনাথ তখন দেখেছিলো পৃথিবীকে। আর তেমনি করে সেই মহাদেশের মানুষ-গুলিকে দেখাতে চেয়েছিলো ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ আর ইউরোপ পাশাপাশি দাঁড়াবে।
কিন্তু তার আগে সে যে দেশে আছে, যে সমাজ তার কাছে একেবারে নতুন সে সমাজের অলিগলির সন্ধান নিতে হবে, সে দেশের মানুষের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিশে যেতে হবে—তারা যেন প্রবাসী মনে করে কোনোদিনও সোমনাথকে সঙ্কোচে আর শঙ্কায় দূরে সরিয়ে না দেয়।

তখনও প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতি লাভ লোকসানের হিসেব-নিকেশের শেষ হয় নি। সমগ্র ইউরোপে শুধু অশান্তি আর হতাশা। যে দিকে তাকানো যায় চোখে পড়ে ক্লান্ত অবসন্ন মুখ। নানাভাবে মৈত্রীর গান শোনাতে আরম্ভ করেছে অনেক প্রতিষ্ঠান। এই ভাঙাচোরা জীবন, এই জোড়াতালি-দেওয়া সংসার আর এই আপাদমস্তক-অবশ-করা অবসাদ—বেশিদিন থাকবে না যদি জাতিতে জাতিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। অপরিচয়ের ভীতি আর অজ্ঞতা দূর করে পরিচয়ের পথ সুগম করে দেওয়ার একজন স্বাধীন দূত বলে সোমনাথের নিজেকে মনে হলো। তার কোনো দায় নেই বন্ধন নেই, মুক্ত স্বাধীন মন নিয়ে সে পৃথিবীকে শোনাবে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির আশ্চর্য ইতিহাস! হঠাৎ নিয়তি তাকে যেন এই মহাকাজের ভার দিয়ে এদেশে থাকবার সুযোগ করে দিলো।

তারপর আস্তে আস্তে একদিন সোমনাথ উপলব্ধি করলো কোথা থেকে যেন প্রচণ্ড শক্তি এসেছে তার দেহে আর আশ্চর্য রকম প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে তার মন। সকলকেই যেন চেনা মনে হয়। পুরনো সস্তা ফেল্টহ্যাট পরে যে বুড়ো লোকটি খবরের কাগজ ঘাড়ে নিয়ে রাস্তায় চেঁচায় তাকে তো প্রবাসী বলে মনে হয় না। যে মেয়েরা ছুটে ছুটে নিজের কাজে যায় তারা যেন বিদেশী নয়। যাকে দেখে সোমনাথ তাকে তার বড়ো আপনার মনে হয়, বড় পরিচিত যেন। দূরের মানুষরা একে একে যেন নতুন আলো হাতে নিয়ে তার কাছে এলো বন্ধুর মতো, ভায়ের মতো, আর দুই বাহু প্রসারিত করে তাদের বুকে টেনে নিলো সোমনাথ।

কিন্তু এদের মধ্যে সোমনাথের সবচেয়ে কাছে যে এলো তার নাম অ্যানালিসা। সে যদি সে-সময় তার পাশে দাঁড়িয়ে তেমনি করে তার সাহস আর মনের জোর বাড়িয়ে না দিতো তাহলে কে জানে হয়তো দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সোমনাথের কর্মক্ষমতার অনেক অপচয় হতো।

ইচ্ছে করে জার্মানি ছেড়ে অ্যানালিসা ইংল্যাণ্ডে আসে নি। সে এসেছিলো দায়ে পড়ে। যুদ্ধে শেষ হয়ে গিয়েছিলো তার মা-বাবা। সেই অল্পবয়সে

অনাহার অনিদ্রা অশান্তি আর দারুণ দারিদ্র্যে অ্যানালিসা যেন পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলো। ইংরেজের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা আর আক্রোশ থাকলেও বাধ্য হয়ে লণ্ডনে এলো অন্নের সন্ধানে।

শুধু সে একা নয়। তার সঙ্গে তার বয়সী আরও অনেক মেয়ে এসেছিলো জার্মানি থেকে লণ্ডনে। অ্যানালিসা অবাক হয়ে দেখলো তারা খুব সহজেই সমস্ত অভিমান আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে সুখের সহজ জীবন বেছে নিলো। জার্মানের চরিত্রগত তেজ আর বৈশিষ্ট্য অতি অল্প সময়ে অন্তর্হিত হলো উত্তাল উদ্দাম জীবনের প্রচণ্ড তরঙ্গে। নিত্য-নতুন ক্ষণিকের বন্ধু যোগাড় করে তারা সুখে গা ভাসিয়ে দিলো।

অ্যানালিসার সেইসব বান্ধবীদের মধ্যে বিশেষ করে একজনের কথা আজও তার থেকে থেকে মনে পড়ে। তার নাম মেরিয়েটা। সুন্দর দেখতে ছিলো মেয়েটি। দেশে থাকতে কী শান্ত স্বভাব ছিলো তার। এমন মেয়ের এই অধঃপতন চোখে দেখতে অ্যানালিসার দারুণ কষ্ট হয়েছিলো। মেরিয়েটা তার চোখের সামনে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। তার বেশভূষা, চলাফেরা, কথাবার্তা সবই যেন বদলে গেছে ; লণ্ডনে তাকে চিনতে কষ্ট হয়েছিলো অ্যানালিসার।

তবু একদিন সুযোগ পেয়ে তার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে দৃঢ় দীপ্তস্বরে স্পষ্ট বলেছিলো, এ কি করছো মেরিয়েটা, তোমার লজ্জা করে না ?

কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে মেরিয়েটা বলেছিলো, কিসের লজ্জা ?

এমন করে চলাফেরা করতে ? যার তার সঙ্গে ঢলাঢলি করতে ? তুমি কি ভুলে গেলে তুমি জার্মান ?

দুএকমিনিট চুপ করে থেকে মাথা তুলে মেরিয়েটা উত্তর দিয়েছিলো, না ভুলবো কেন ! কিন্তু আমিও বাঁচতে চাই।

কিন্তু এমনি করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া সে অনেক ভালো। জানো না তোমাকে দেখে শয়তান ইংরেজি কী মনে করে ?

না।

তারা মনে করে জার্মানির সব মেয়ে বুঝি এই রকম! ছুটো খেতে দেবার লোভ দেখালে তারা সব দিতে প্রস্তুত?

অন্য কারোর কথা জানি না, কিন্তু অ্যানালিসা, আমি স্বীকার করছি আমার খাওয়া-পরার ভাবনা যে ঘুচিয়ে দেয় তাকে আমি সব দিতে প্রস্তুত।

ছি ছি, এতো সুলভ তুমি?

হ্যাঁ, বাধ্য হয়ে হতে হয়েছে। আমার মতো বয়সে কোনো মেয়ে ক্ষিধের জ্বালায় ছটফট করে পথে বেরিয়ে আসে? মনে নেই দেশে এক টুকরো রুটির জন্যে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি নাড়ী মোচড় দিয়েছে—

আমরা সকলেই তো সে-কষ্ট সহ্য করেছি। কিন্তু দেশের সে অবস্থা কাদের জন্যে হয়েছিলো?

যাদের জন্যেই হোক আমার তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অতো কথা ভেবে আমার কী লাভ? তুমি সতী হয়ে ঝিগিরি করে উপোস করে মরতে পারো আমি পারবো না। আমি ভালো খেয়ে-পরে ঘুরে বেড়াতে চাই। যদি মনের মতো লোক পাই বিয়ে করবো। কিন্তু তা যতোদিন না পাচ্ছি জীবনকে পুরোপুরি চেখে নিতে কার্পণ্য করবো না।

কিন্তু তাহলে কোনোদিনও তুমি বিয়ে করবার লোক পাবে না। ভদ্রঘরের মেয়ে হয়ে শেষে কি বেশ্যা হয়ে মরবে?

ক্ষতি কি, খিল খিল করে হেসে মেরিয়েটা বলেছিলো, বেঁচে মরে থাকতে আমি কিছুতেই পারবো না।

মেরিয়েটার কাছ থেকে সেদিন কঠিন আঘাত পেয়েছিলো অ্যানালিসা। সে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভেবেছিলো শুধু। এমনি করেই কি এতো শিগগির জার্মানির সমস্ত শক্তি, অনেক যুগের সম্পদ ধুলিসাৎ হয়ে যাবে! ইংরেজের সেবা করে আর তাদের মুখ চেয়ে কি কাটবে বলিষ্ঠ শক্তিমান জার্মানের অসহায় দিন! চোখে জল জমে উঠেছিলো অ্যানালিসার। না এ কিছুতেই হতে পারে না। এ দুঃসময় ক্ষণকালের। এ গ্লানি বিপুল শক্তির প্রচণ্ড তরঙ্গে নিঃশেষে একদিন ধুয়ে মুছে যাবে। আজ

থেকে অ্যানালিসা শুধু সেই দিনের অপেক্ষায় থাকবে। সে নিশ্চিত জানে হৃত-শক্তি ফিরে পাবে জার্মানি। বুকে ভারি কান্না চেপে দেশ ছেড়ে আসবার সময় সে তো আগুন দেখে এসেছে তার দেশবাসীর চোখে। সে-আগুন ইংরেজকে একদিন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। ইংল্যাণ্ডে বসে দিনরাত্তির অ্যানালিসা তাই ভাবে। কবে—কবে আসবে সেই দিন।

লণ্ডন একটুও ভালো লাগে নি অ্যানালিসার। এতো হিসেব করে চলতে শেখে নি তারা। এ দেশের লোকেরা হাসতে জানে না, প্রাণ দিয়ে রস গ্রহণ করতে পারে না কোনো কিছুর। তার ওপর সে কাজ করে এক ইহুদী পরিবারে। সংসারে মাঝবয়সী স্বামী-স্ত্রী আর একটি ছোটো ছেলে। ঘরের কাজ সেরে সেই ছেলেটির দেখাশোনার ভার অ্যানালিসার। কিন্তু কর্তা-গিন্নীর ব্যবহার খুব খারাপ। এতো খারাপ যে অ্যানালিসার মনে হয় ছুটে আবার জার্মানীতে ফিরে যায়। এখানে এভাবে দিনরাত গালাগাল খেয়ে ঝিগিরি করবার চেয়ে তার নিজের দেশে না খেয়ে দিন কাটানো অনেক ভালো। কিন্তু উপায় নেই। থেকে থেকে গিন্নী বলে, তোমরা এক একটা ডাইনি, তোমাদের খুন করতে ইচ্ছে করে, জার্মান মাত্রেই অসৎ, ভীরু—

সারাদিন এমনি আরও অনেক কথা অ্যানালিসা শোনে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও উত্তর দিতে পারে না। উত্তর দিয়েও লাভ নেই। বিপদে পড়ে যাবে তাহলে। তবু তার রক্ত হঠাৎ যেন গরম হয়ে ওঠে আর মনে হয় সত্যি ওই ইহুদী কর্তা-গিন্নীকে খুন করে প্রমাণ দেয় যে সব কিছু হারালেও আজও জার্মানীর আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে।

যেন বন্দিনীর মতো অ্যানালিসা দিন কাটাতে লাগলো। খুব খারাপ লাগে তার, বড়ো কষ্ট হয়। কী করবে সে? পড়াশোনা করা কি আর কোনোদিনও সম্ভব হবে না? মা-বাবার একমাত্র আদুরে মেয়ে ছিল অ্যানালিসা। তার বাবা ছিলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপক। ছেলেবেলা থেকে তারও ইচ্ছে ছিলো বাবার মতো অনেকদূর লেখাপড়া করবার। কিন্তু এই অস্বস্তিকর পরিবেশে তা সম্ভব হবে কেমন করে!

তবু অ্যানালিসা স্থির করলো যেমন করে হোক সে কিছু কিছু লেখাপড়া করবে। এ বাড়ির লোকগুলো মূর্খ। এদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। তাই অ্যানালিসা ভাবলো ছুটি পেলেই সে বেরিয়ে পড়বে। হয় কোনো লাইব্রেরিতে গিয়ে বসবে, না হয় পছন্দমতো বই কিনে নিজেই বুঝে বুঝে পড়বার চেষ্টা করবে। সে একমুহূর্তের জন্যেও ভোলে না যে সে জার্মান, ইচ্ছে থাকলে অসাধ্য সাধন করা তার পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। হ্যাঁ, অ্যানালিসা ঠিক করলো সে তাই করবে। বাধা দৈন্য অস্বস্তিকর পরিবেশ তার জ্ঞানের আকুল পিপাসা কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না!

আর ঠিক সেই সময় অ্যানালিসার সঙ্গে সোমনাথের আলাপ হলো। সোমনাথের তখন শোচনীয় অবস্থা। চাকরি হয় নি কোথাও। ওদিকে বাড়ি থেকে সাহায্য বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু আছে তার মনের প্রবল জোর। সোমনাথের একমাত্র সম্বল। সে বেশির ভাগ সময় পথে পথে কাটায়। না খেয়ে কেটে যায় কত রাত কত দিন। বাড়িতে থাকলেই ল্যাণ্ড-লেডীর তাগাদায় অস্থির হয়ে পড়ে। লণ্ডনে ভারতীয় তখন ভয় বিস্ময় আর কৌতূহলের বস্তু। এমনিতেই বাড়ি পাওয়া কঠিন, তার ওপর ভাড়া ঠিক-মতো দিতে না পারলে তো কথাই নেই। একটা ছুতো পেলেই ল্যাণ্ডলেডী তাড়িয়ে দেবে।

সোমনাথকে অ্যানালিসা প্রথম প্রশ্ন করেছিলো, আমাদের মতো কি তোমাদের দেশেও এখন খুব বেশি খাবার কষ্ট?

সোমনাথ হেসেছিলো, আমার জামাকাপড় আর চেহারা দেখে তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি?

না না, তবে তোমাকে দেখে তো আর ছাত্র বলে মনে হয় না, তাই ভাবলাম তুমি হয় তো চাকরি করবার জন্যে এখানে এসেছো।

ছাত্র হয়ে এসেছিলাম, অ্যানালিসার গম্ভীর বিষণ্ণ মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সোমনাথ বলেছিলো, ছাত্রজীবন শেষ হয়ে গেছে, এখন চাকরির চেষ্টা করছি।

কিসের ছাত্র ছিলে তুমি ?

এন্‌জিনিয়ারিংএর।

তাহলে এদেশে ভালো চাকরি পাবে তুমি।

আমাদের দেশে নিশ্চয়ই পেতাম, এদেশে কী হবে বলতে পারি না।

দেশে যাবে না ?

না, সেখানে আমার কেউ নেই, হেসে সোমনাথ অ্যানালিসাকে বললো, আমার কথা তো হলো, এবার তোমার কথা কিছু বলো ? তুমি এদেশে কেন এসেছো ?

ছুটো খেতে পাবার জন্যে।

কী করছো ?

ঝিগিরি ছাড়া এখানে আমার আর কী করবার আছে !

ছি ছি, ও কাজ তোমার জন্যে নয়।

আর কী আমি করতে পারি বলো ?

জার্মানরা ইচ্ছে করলে কী না করতে পারে ?

সোমনাথের কথা শুনে নিদারুণ অনুপ্রেরণায় অ্যানালিসার চোখ জ্বলে উঠলো যেন। উজ্জ্বল মুখে সে বললো, তুমি জার্মানিতে গেছো ?

না, কিন্তু তাদের কথা এই পৃথিবীতে কে আর না জানে বলো ?

সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো অ্যানালিসা। সে দেখছিলো, লম্বা চেহারা সোমনাথের, কালো চুল, বলিষ্ঠ শরীর আর প্রশান্ত মুখে দুঃখের লেশমাত্র নেই, শুধু দৃঢ়তার সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে। এমন লোককে যে কোনো লোকের নিশ্চিত নির্ভর মনে হয়।

স্বরে গভীর আগ্রহ নিয়ে অ্যানালিসা জিজ্ঞেস করলো, বলো এদেশে আমি আর কী করতে পারি ?

তুমি কী করতে চাও অ্যানালিসা ?

পড়াশুনো করতে চাই।

হেসে সোমনাথ বললো, সে তো সোজা, সকলেই করতে পারে, তুমি তো পারবেই।

কিন্তু আমার পক্ষে একাজ করা খুব কঠিন, অ্যানালিসা সোমনাথকে তার বর্তমান অবস্থার কথা আগাগোড়া জানিয়ে তার মতামত শোনবার জন্যে বসে রইলো।

কী ভেবে সোমনাথ বললো, আমি দুএকদিন ভেবে দেখি কেমন করে তোমাকে সাহায্য করতে পারি, তারপর অন্যদিন তোমাকে সমস্ত জানাবো।

তোমার অসুবিধা হবে না তো ?

উত্তর না দিয়ে শুধু হেসে সোমনাথ অ্যানালিসাকে বুঝিয়ে দিলো যে তাকে সাহায্য করতে তার এতটুকু অসুবিধা হবে না। তারপর সারাদিন সোমনাথ অ্যানালিসার কথা ভাবলে। দীর্ঘ ঘন সোনালী চুল তার, অনাহার অনিদ্রায় স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় নি, গম্ভীর মুখ। সে মুখে দম্ভের ছাপ নেই, আছে মানুষের শ্রদ্ধা পাবার ইঙ্গিত। পরদিন সোমনাথ লণ্ডনের এক ছোটো কারখানায় চাকরি পেলো। মাইনে সামান্য আর কাজও পাঁচজনকে বলবার মতো নয়। যাহোক সেই চাকরি নিলো সোমনাথ। না নিয়ে উপায় নেই। তার নিজের খরচ বেশি লাগে না। কোনোরকমে ওই মাইনেতে চালিয়ে নিতে হবে। যদি আস্তে আস্তে ভবিষ্যতে নিজ গুণে উন্নতি করতে পারে তাহলে অবস্থা ভালো হবার আশা রইলো।

হোক ছোট চাকরি ক্ষতি নেই। চাকরির চেয়ে সোমনাথের আরও বড়ো কাজ আছে, সে-কাজে যদি সামান্য সফল হয় তার চেয়ে আনন্দের আর কিছুই নেই। কারখানায় সকলের সঙ্গে সে প্রাণ খুলে মিশতে লাগলো। ম্যানেজার থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি কুলিমজুর তাকে খুব অল্প দিনে আপনার লোক বলে মনে করলো। খুব শিগগিরই উন্নতি হলো সোমনাথের। আর বোঝা গেল টিকে থাকলে একদিন হয়তো সে এই কারখানার ম্যানেজার হতে পারে! অন্তত পাঁচজনে সেকথা বলাবলি করতে লাগলো।

ওদিকে অ্যানালিসার সঙ্গে পড়াশুনোর মধ্যে দিয়ে সোমনাথের আলাপ ঘন হলো। সময় পেলেই তারা দুজনে নিয়মিত দেখা করতে লাগলো। প্রচুর উৎসাহে সোমনাথ এই পৃথিবীর যা কিছু জানে, বলতে আরম্ভ করলো

অ্যানালিসাকে। জার্মান মেয়ে অ্যানালিসা এইসব কথা শুনতে শুনতে যেন তন্ময় হয়ে গেলো আর দুর্বার আকর্ষণে পরম ভক্তিতে সোমনাথকে মনে মনে গুরু বলে মেনে নিলো। সে স্পষ্ট বুঝলে যে এই বিরাট পৃথিবীতে সে শুধু একটি মানুষকেই জানে, তার নাম সোমনাথ।

কিন্তু অ্যানালিসার মতামত সোমনাথকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছিলো। সে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বুঝেছে যে মনে প্রচণ্ড বিদ্বেষ পুষে অ্যানালিসা দিন কাটাচ্ছে। আর ইংলণ্ডে যতো দিন যাচ্ছে ইংরেজের উপর তার আক্রোশ যেন ততো বেশি বেড়ে যাচ্ছে। দুঃখ হলো সোমনাথের। কেন না যে মেয়ে জ্ঞান বাড়াবার পিপাসায় আকুল তার মন এতো সংকীর্ণ হলে চলবে কেন। শুধু তাই নয়, অ্যানালিসার নিজের পক্ষেও এটা ক্ষতিকর। মন থেকে এই বিদ্বেষ দূর করতে না পারলে সে কোনোদিনও শান্তি পাবে না। সোমনাথ ঠিক করলো আপাতত অন্য বিষয়ে আলোচনা করা বাদ দিয়ে অ্যানালিসাকে যেমন করে হোক বোঝাতে হবে যে অন্য চোখে ইংরেজকে, শুধু ইংরেজকে কেন পৃথিবীর সব জাতকে দেখতে না পারলে তাকে দিয়ে কোনো দেশের কোনো প্রয়োজন মিটবে না বরং ক্ষতি হবে। এমনকি অ্যানালিসার নিজের দেশেরও মঙ্গল হবে না। যে যুগ অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে সে যুগে শুধু তাদেরই প্রয়োজন যারা সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করবে। যে জাত তা রক্ষা করবে না, স্বার্থ আর বিদ্বেষ নিয়ে অন্যকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করবে ভবিষ্যতে তার পরাজয় আর অপমান নিশ্চিত।

বুঝেছো অ্যানালিসা, সোমনাথ বেশ দরদ দিয়ে বলেছিলো, তুমি ইংরেজকে অত ঘৃণা কোরো না, এতে তোমারই ক্ষতি, তুমি নিজে কোনোদিনও শান্তি পাবে না।

আমি শান্তি পেতে চাই না সোমনাথ।

ছি, ও কি কথা, প্রত্যেক মানুষ শান্তি চায়। শান্তি না থাকলে কেউ কি সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে ?

কিন্তু তুমি জানো না ওরা আমাদের কী সর্বনাশ করেছে। কত শান্তির সংসার

ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, যার জন্যে আমার মতো মেয়েকে আজ বাপ-মা হারিয়ে বিদেশে বিভুঁয়ে ঝিগিরি করতে হচ্ছে—

তার জন্যে শুধু ইংরেজ দায়ী নয়।

না, আমি জানি আমরাও দায়ী।

না, তোমরাও নও অ্যানালিসা।

তাহলে ? চোখে কৌতূহল নিয়ে অ্যানালিসা মাথা তুলে জিজ্ঞেস করেছিলো।

মানুষের হিংস্র প্রবৃত্তি। পৃথিবীর খুব কম মানুষ এই প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত। বস্তুত, স্বার্থের জন্যে, অহঙ্কারের জন্যে আমরা সব কিছু করতে পারি, কেন না আমরা শুধু নিজেদের সুখের কথা ভাবি, সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ কেমন করে হবে তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই না অর্থাৎ পরের সুখদুঃখ আমাদের কাছে কিছুই নয়।

ইংরেজ কি আমাদের কথা ভেবেছিলো ?

তারা ভাবে নি বলে তোমরা ভাববে না কেন ? পৃথিবীর সম্পদ জার্মানি কতভাবে বাড়িয়েছে তার তো হিসেব নেই। সঙ্গীত, দর্শন, বিজ্ঞান—এসব কথা তুমি তো জানো।

অ্যানালিসা উত্তর দিলো না।

সোমনাথ আবার বললো, আমরা সকলেই জানি ইংরেজ স্বার্থপর, বড়ো বেশি হিসেবী। কিন্তু তাদের মতো আমরা হতে যাবো কেন ? আমরা কেন আমাদের সংস্কৃতির কথা ভুলে যাবো ? কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সোমনাথ বললো, আজ ইংরেজ পরের সুখসুবিধার কথা হয়তো গ্রাহ্য করছে না, কিন্তু আমি তোমাকে বলছি অ্যানালিসা, সমস্ত পৃথিবীতে এই যুদ্ধ যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে সে-আগুনে ইংরেজকেও পুড়তে হবে—তারাও শান্তি চায়। শান্তি আসবেই।

অ্যানালিসা চুপ করে বসে রইলো।

তাই আজ আমাদের কাজ হলো স্বার্থ বিদ্বেষ অহঙ্কার ভুলে পরকে জানা, নিজেকে জানানো। দূর থেকে, বাইরে থেকে আমরা কাউকে ভালো

করে বুঝতে পারি না। সমস্ত অভিমান বাদ দিয়ে খুব কাছে যেতে হবে আমাদের। ভূগোলের বাধা থাকলেও অপরিচয়ের বাধা যেন মানুষে মানুষে না থাকে। দূরের মানুষকে আমরা আমাদের মনের কাছে নিয়ে আসবো! মহাশান্তির প্রধান মন্ত্র হলো, বিনিময়। অ্যানালিসার দিকে তাকিয়ে হেসে সোমনাথ বললো, তাই তো চিরকালের জন্যে আমি এদেশে থেকে গেলাম অ্যানালিসা, আর তার জন্যে আমার এতোটুকুও দুঃখ নেই।

হয়তো আমাকেও থেকে যেতে হবে, দেশে আর কার কাছে ফিরে যাবো, কে আছে আমার, মাথা নিচু করে অ্যানালিসা বললো, কিন্তু দুঃখ এই যে যারা আমার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, তাদের দেশে ঘর ভিক্ষে চাইতে এলাম!

সোমনাথ অ্যানালিসার হাত স্পর্শ করলো, অ্যানালিসা, চেয়ে কিছুই পাওয়া যায় না, সবই গড়ে নিতে হয়। যা গেছে তা নিয়ে কেঁদে লাভ নেই, যা রইলো, ভাবতে হবে তা থেকে কেমন করে সোনা ফলানো যায়।

খুব শক্ত করে সোমনাথের হাত ধরে অ্যানালিসা বললো, তোমার কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে, আমি বড় শান্তি—সে থেমে গেল।

বলো অ্যানালিসা, হেসে সোমনাথ বললো, শান্তির কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছ কেন? আমি জানি, প্রত্যেকেই শান্তি চায়। পৃথিবীতে এমন একটি লোকও নেই যে তা চায় না।

বলো সোমনাথ, আমাকে অনেক নতুন কথা শোনাও।

হয়তো সেই বিশেষ দিনে সব কথা বলা হয় নি। কিন্তু দিনে দিনে অ্যানালিসাকে কতো নতুন কথা শোনালো সোমনাথ। ইংল্যাণ্ডে না এলে হয়তো এসব কথা জীবনে তার শোনা হতো না। হঠাৎ অ্যানালিসার লণ্ডনকে যেন বড়ো ভালো লাগলো। সোমনাথকে এখানে পেয়েছে সে। ভারতবর্ষ! সেই দেশ কতো বড়ো! সোমনাথের মতো আশ্চর্য জ্ঞানী লোক যে দেশের মানুষ সে-দেশ দেখবার সাধ হলো অ্যানালিসার। গান্ধীর নাম অবশ্য সে দেশে থাকতে শুনেছিলো। কিন্তু তিনি যে এতো মহৎ সেকথা ভাবতে পারে নি। তাঁর কথা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যায় অ্যানালিসা।

বলো কি, কখনও কারোর ওপর রাগ হয় না তাঁর ?
না, প্রসন্ন হাসি তাঁর মুখ থেকে কখনও মিলিয়ে যায় না।
কিন্তু কেউ যদি তাঁকে আঘাত করে, অন্যায় অপমান করে ?
একটা গল্প শোনো অ্যানালিসা, সোমনাথ তার মুখের দিকে তাকিয়ে আরম্ভ করে, আমাদের দেশের লোক তাঁকে বলে মহাত্মা। মহাত্মা গান্ধী। তিনি বলেন, পথ চলতে চলতে যদি কখনও সাপ আমার চোখে পড়ে আর আমার হাতে যদি তখন লাঠি থাকে তাহলে পাছে আমার সাপকে আঘাত করার ইচ্ছে জাগে তাই আমি তাড়াতাড়ি লাঠি ফেলে দেবো। এমন অহিংসার মন্ত্রে যিনি দীক্ষিত তাঁকে কে অপমান করতে পারে বলো ?
মহাত্মা গান্ধীর কথা আরও বলো সোমনাথ, অ্যানালিসার চোখে অপরিসীম কৌতূহল ফুটে উঠলো।
একটু ভেবে নিয়ে সোমনাথ বলতে আরম্ভ করলো, সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের আজ আর কিছুই নেই, আমরা যেন ব্রিটিশের খেলার পুতুল। ব্রিটিশ সভ্যতার জাঁকজমকে, তাদের শাসনে আমাদের দেশের লোক যেন ক্রীতদাসের মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। আমরা মনুষ্যত্বও হারাতে বসেছি—
তারপর ?
এমন সময় মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব। না, তাঁর হাতে অস্ত্র নেই, শূন্য হাতে ভরা প্রাণ নিয়ে তিনি এলেন। তাঁর চালচলন বেশভূষা সন্ন্যাসীর মতো। চেতনার দীপ জ্বালিয়ে দিলেন তিনি। আক্রমণ নয়, সংগ্রাম নয়, তাঁর একমাত্র অস্ত্র মনের জোর, তাঁর দাবি মনুষ্যত্বের মর্যাদা। অসীম সহ্যশক্তি নিয়ে তিনি চালিয়ে যাচ্চেন অহিংস সংগ্রাম। ভারতবর্ষ যখন গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন তখন তিনি জনতার হাত ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে চলেছেন আলোর দিকে। ভারতবর্ষ জেগে উঠছে অ্যানালিসা—আমি মহাত্মা গান্ধীর দেশের মানুষ—সেই আমার পরিচয়।
গান্ধীর কথা শুনতে শুনতে আমার শুধু ক্রাইষ্টের কথা মনে হয় সোমনাথ।

হ্যাঁ, ইউরোপের কেউ কেউ বলে তিনি নাকি দ্বিতীয় ক্রাইষ্ট। এই তো কয়েক বছর আগে বিনা অস্ত্রে তিনি অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে গেলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার সময়ও তাঁর মুখের ভাব কঠিন হয় না। এই পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষকে তিনি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেছেন। আমাদেরও তাই দেখতে হবে অ্যানালিসা, নাহলে উপায় নেই। ক্ষমা করতে না পারলে মঙ্গল কল্যাণ শান্তি কিছুই আসে না।

খুব আস্তে অ্যানালিসা বললো, হয়তো তাই।

দেখতে দেখতে অ্যানালিসার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেলো। সোমনাথের কথা মেনে নিয়ে নতুন চোখে পৃথিবীকে দেখতে আরম্ভ করলো সে। আর তার মন গভীর শান্তিতে ভরে উঠলো।

তারা দুজনেই যেন একসঙ্গে বুঝতে পারলো তাদের পরস্পরের চেয়ে আপনার জন আর কেউ নেই। কোনো বাধা ছিলো না, তাই বিলম্ব হলো না।

শুধু সোমনাথ একবার বলেছিলো, আমার মাইনে বড় কম, ঘরও ভালো নয়, তোমার খুব কষ্ট হবে অ্যানালিসা।

যেখানে আছি তার চেয়ে অনেক ভালো থাকবো, আর তোমার যখন সেখানে কষ্ট হয় না, আমার হবে কেন ?

আমার সব সহ্য করা অভ্যাস আছে।

আমারও আছে, তুমি যা করো আমিও তা করতে চাই। একটা কথা তুমি জানো না সোমনাথ, তোমার সঙ্গে মিশে আমার নতুন জন্ম হয়েছে।

আর তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো বলে আমিও যেন কাজ করবার নতুন শক্তি পেয়েছি।

অর্থ নেই। আয়োজন সামান্য। শুধু কোনো রকমে বেঁচে থাকা। তবু প্রাণ আছে, বিরাট আদর্শ আছে, তাই অভাব হার মানে। যা সকলের কাম্য, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সোমনাথ আর অ্যানালিসার সংসারে সেই শান্তি আছে। অ্যানালিসা যেন ধন্য হয়ে গেছে। পৃথিবীতে বেঁচে থেকে এতো

সুখ পাওয়া যায় সেকথা তো তার জানা ছিলো না। মানুষ এতো ভালো হয়, এতো মহৎ হয়, এতো সমবেদনায় আর একজনকে বুঝতে পারে সোমনাথকে বিয়ে না করলে হয়তো কোনো দিনও সে নিজে তা বুঝতে পারতো না। শুধু একটি বিশেষ পুরুষকে নয়, অ্যানালিসাকে সোমনাথ যেন পৃথিবীকে ভালোবাসতে শেখালো।

সংসারে দারিদ্র্য যতো কঠোর হোক না কেন, বিয়ে করে নিজের ব্যাপক আদর্শ নিয়ে সামনে এগিয়ে চলবার সাহস সোমনাথের যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। আর ভাবনা কি তার, অ্যানালিসা যেমন করে তাকে বুঝলো, তার মত মানলো তেমন করে একদিন নিশ্চয়ই সমস্ত পৃথিবীর লোক তাকে বুঝবে, তার কথা ভেবে দেখবে আর সেই দিন সফল হবে সোমনাথের সাধনা, সার্থক হবে তার বিদেশবাস। তাই হাজার বাধা আসুক সে কখনও ভেঙে পড়বে না, বিচলিত হবে না, অসীম ধৈর্য নিয়ে শুধু কাজ করে যাবে।

অ্যানালিসাকে দেখতে দেখতে সোমনাথ অবাক হয়ে যায়। কী অসামান্য পরিশ্রম করে সে সকাল থেকে রাত্তির অবধি। সংসারের কাজ নয়, বাইরের ছোটোখাটো যা কিছু কাজ, বাজার করা, ওষুধ আনা, কার্পেট কেনা, অল্পের মধ্যে সুন্দর করে সংসার সাজাতে হলে যা কিছু করা দরকার হাসি মুখে সে সব করে। কোনো অনুযোগ নেই, কোনো অভিযোগ নেই অ্যানালিসার।

সোমনাথ দিনেদিনে অ্যানালিসার উপর নির্ভর করতে আরম্ভ করলো। তার মনে হলো তাকে বিয়ে না করলে মনে এতো জোর কিছুতেই পেতো না সে।

দিন কাটতে লাগলো। মাসের পর মাস চলে গেলো। দেখতে দেখতে কতো বছর ঘুরে গেলো। এর মধ্যে সংসারের যে নতুন মানুষ এলো ওরা তার নাম দিলো, মিলন।

ইচ্ছে থাকলেও আজও বাড়ি কিনতে পারে নি সোমনাথ। দেশের যা অবস্থা এখন তাতে মনে হয় আর কোনোদিনও লণ্ডন শহরে সোমনাথের বাড়ি কেনা সম্ভব হবে না।

কারখানায় উন্নতি যে এই দীর্ঘ বছরে তার হয় নি তা নয়। কতো কারখানা বদলালো সোমনাথ, কতো রকম কাজ করলো, উপার্জনও বাড়লো তার। কিন্তু ওদিকে সংসারের খরচও বাড়তে লাগলো। কাজেই বলতে গেলে অবস্থা তার প্রায় একই রয়ে গেলো। বাড়ি কেনা দূরের কথা, তার একমাত্র সাধ ছেলেকে হ্যারো কিংবা ইটনে ভর্তি করে পড়াবে। শেষ অবধি কিছুতেই সে-সাধ পূর্ণ করতে পারলো না সোমনাথ। সংসারের নানা অভাব-অভিযোগে তা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেলো।

তবু মিলন বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেলো, এ ছেলে লেখাপড়ায় ভালো হবে। সুন্দর চেহারা তার। ফরসা রঙ, কালো চুল, কালো চোখের মণি।

সোমনাথ মাঝে মাঝে তার মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কথা ভাবে। মিলন আরো বড় হবে। এতো বড় হবে যে সারা পৃথিবীতে ছড়াবে তার নাম। অন্তত শেষ বয়সে সোমনাথ এই ভেবে সান্ত্বনা পাবে যে যদি তখন তার কাজ শেষ না হয় সে-ভার বহন করবে মিলন। ছেলে তার বড় হবেই! মা জার্মান, বাবা ভারতীয় আর সে বড় হয়ে উঠছে ইংলণ্ডে। এত সৌভাগ্য কজনের হয়। পৃথিবীর সংস্কৃতির ছাপ থাকবে মিলনের চোখেমুখে। সোমনাথ দেবে তাকে বিনিময়ের মন্ত্র।

কিন্তু অ্যানালিসা আজকাল মাঝে মাঝে মিলনকে নিয়ে প্রবল আপত্তি তোলে, ও কি বাংলা শিখবে না একেবারে?

সোমনাথ হেসে বলে, বড়ো হয়ে যখন দেশে যাবে তখন নিজেই শিখে নেবে।

আমার মনে হয় না এটা ঠিক হচ্ছে, তুমি ওকে যেভাবে মানুষ করছো তাতে মনে হয় না ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওর কোনোদিন কোনো কৌতূহল হবে।

তা না হয়ে পারে? ওর শরীরে যে ভারতীয় রক্ত আছে, আর আমি তো ওকে ভারতবর্ষের অনেক কথা শোনাই।

তাতে ও বিশেষ কান দেয় না দেখেছো তো?

বড়ো হয়ে যখন বুঝতে শিখবে তখন দেবে বৈকি!

আর দিয়েছে, অ্যানালিসা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে, তোমার পরিবর্তন দেখেও আমার বড়ো কষ্ট হয়—

কেন ? আমার কী পরিবর্তন দেখে তোমার কষ্ট হয় অ্যানালিসা ?
তুমি একেবারে পুরো ইংরেজ হয়ে গেছো, ভারতবর্ষকে তুমি যেন ভুলে গেছো, কোনো কথাই তো তুমি আজকাল আর আমাকে বলো না।
তোমাকে তো আমি সব কথাই বলেছি অ্যানালিসা। সময় হলে আবার বলবো, কিন্তু একথা তুমি কেমন করে বললে যে ভারতবর্ষকে আমি ভুলে গেছি ? আমি কি এতো বড়ো অমানুষ ? কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গভীর দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সোমনাথ বললো, ভারতবর্ষকে আমি ভুলবো ?
না, অ্যানালিসা যেন লজ্জা পেলো, ছি ছি, আমি তোমাকে আঘাত দেবার জন্যে সেকথা বলি নি। নিজের দেশকে কেউ কি ভুলতে পারে ? আমি কি জার্মানিকে ভুলেছি ? কিন্তু তবু আজ একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না—
বলো। থামলে কেন ?
আমাদের সকলের জীবনে পরিবেশ অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। যার জন্যে তুমি আর আমি দুজনে ইংল্যাণ্ডের নিয়মকানুন মেনে নিয়ে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছি। এমনকি ইংরেজের ছোটোখাটো নানা অভ্যাস আজ আমাদেরও অভ্যাস হয়ে গেছে—
হোক না, ক্ষতি কি অ্যানালিসা ?
কিছু ক্ষতি আছে বৈকি। এরা আমাদের প্রায়ই মনে করিয়ে দেয় যে আমরা এদের নই আর আমরা মনে মনে জানি যে মনে-প্রাণে আমরা আমাদের দেশেরও নই। কাজেই আমরা কী পেলাম ?
লাভ-লোকসানের হিসেব করবার সময় এখনও আসে নি।
জানি। কিন্তু মাঝে মাঝে বড়ো কষ্ট হয় তাই তোমায় বলি।
এত সহজে ধৈর্য হারিও না। যদি কোনো বিশেষ লোক তোমাকে আঘাত দেয় তার জন্যে গোটা জাতটাকে ছোটো কোরো না।
আমি কাউকেই ছোটো করতে চাই না, কিন্তু বারবার এদের কাছে যখন নিজেকে ছোটো করতে হয় তখন—

না না অ্যানালিসা, কাউকে ছোটো করবার ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। তোমাকে আমি যেকথা এতোদিন ধরে বলে এসেছি আজ আবার সেই কথাই বলছি, নিজেদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা সমস্ত জাতির কল্যাণের জন্যে আমাদের ভুলতে হবে!

ভুলেছি তো। না ভুললে চলবে কেন। এতোদিন কোনো কথাই আমি বলি নি। কিন্তু আমরা শুধু একা আর পাঁচজনের মঙ্গল কামনা করলে ফল হবে না যদি তারাও না তাই চায়।

তারা নিশ্চয়ই চাইবে।

দেখা যাক।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কয়েক বছর আগে থেকেই হিটলারের দুর্দমনীয় শক্তির কথা শোনা যাচ্ছিলো। এবং জার্মানির আভ্যন্তরীণ নানা খবর পেয়ে জনসাধারণ বুঝেছিলো শিগগির একটা প্রচণ্ড ওলোটপালট হবে। কিন্তু কেউ কেউ জার্মানির অভ্যুদয়ে খুশী হয়েছিলো, কেউ কেউ ভীষণ ভয় পেয়েছিলো আর কেউ কেউ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেছিলো, ওসব লাফালাফি সার, ব্রিটিশ একটা হাল্কা ধাক্কা মারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কঠিন ধাক্কা মারলো আধুনিক জার্মানির সর্বময় কর্তা অ্যাডলফ হিটলার। লণ্ডনে তখন কী সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া! জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলো খাবার দুর্লভ হলো। তরুণ-তরুণী মহলে সাজসাজ রব পড়ে গেলো। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এই সাজ-সজ্জায় তারা যেন জোর করে উৎসাহ আনছে। মনে তেমন সাহস পাচ্ছে না। অনেক রাজনীতিজ্ঞর মুখ শুকিয়ে গেছে। এবার যেন কোনো মহানায়কের সঙ্গে সংগ্রাম। বলা শক্ত যুদ্ধের ফলাফল কী হবে। তবু সাবধানের মার নেই। তাই যতো রকম সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব সবই করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর মাস। আর কিছু দিনের মধ্যেই শীত এসে পড়বে। একের পর এক গাছের অসংখ্য পাতা ঝরে যাচ্ছে প্রতিদিন। আগামী বছর কে জানে এই পাতাঝরার ক্ষণে তারা উপস্থিত থাকবে কিনা। তাই করুণ চোখে ইংল্যাণ্ডের

জনসাধারণ মূক শূন্যপত্র গাছগুলির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনে সাহস আনবার চেষ্টা করে। আর কেউ কেউ ঘরসংসার ছেড়ে আনন্দে গা ভাসিয়ে দেয়। ছেলেরা যা খুশি তাই করে, মেয়েরা যাকে পায় তার সঙ্গে আনন্দ পেতে দ্বিধা করে না। কে জানে আর কদিন তাদের আয়ু!

ওদিকে এক এক দিন হিটলারের আশ্চর্য বিজয় অভিযানের খবর আসতে লাগলো। পোলাণ্ডের পতন হলো, ডেনমার্ক নরওয়ে গেলো, মাত্র কয়েক দিনে হল্যাণ্ড হার মানলো, বেলজিয়ামও হিটলার অতি সহজে অধিকার করলো। কিন্তু তখনও অনেক বাকি ছিলো। কে ভেবেছিলো হিটলার ম্যাজিনো লাইন অমন করে ভাঙবে। কে ভেবেছিলো ফরাসী জয় করবে। সেদিন সমগ্র ব্রিটিশ জাতির মনের অবস্থা আর কেউ না জানুক, যারা তখন ইংল্যাণ্ডে ছিলো তাদের অজানা নেই।

অ্যানালিসা, মিলনকে জড়িয়ে ধরে ভীতস্বরে সোমনাথ বলেছিলো, মরবার জন্যে প্রস্তুত হও, এবার ইংল্যাণ্ডের পালা।

ভয়—লণ্ডনের ঘরে ঘরে অলিতে গলিতে মৃত্যুর আতঙ্ক যেন ভীষণভাবে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠলো।

ডনকার্ক থেকে ভীত মূষিকের মতো ইংরেজ সৈন্য পশ্চাদপসরণ করছে। আর আশা নেই। শিগগিরই হিটলারের বোমায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে বাকিংহাম প্যালেস, টাওয়ার অব লণ্ডন—সমগ্র দেশ। এবার কে রক্ষা করবে, কে যুদ্ধ করবে দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর সঙ্গে।

শুরু হলো ব্লিৎস ক্রীগ্—

লণ্ডন শহরের উপর জার্মান প্লেনের অবিশ্রাম বোমাবর্ষণ। বাইরে বার হওয়া বন্ধ, ঘরে খাবার নেই, শুধু ভয়। কোথায় গেলো সকলের এতো সাহস, শক্তি, ঐতিহ্য। মৃত্যুর কবলে সকলের অবস্থা বোধ হয় এক রকমই হয়—ব্যক্তিত্ব কোথায় মিলিয়ে যায় কে জানে।

এই যুদ্ধে জার্মানির লাভ কিংবা ইংরেজের ক্ষতির বিশ্লেষণ করবার মনের অবস্থা সোমনাথের নয়। সে একেবারে ভেঙে পড়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তার

বয়স অল্প ছিলো, যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রূপ কল্পনা করবার শক্তি ছিলো না। প্রথম বিলেতে এসে যখন পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় হলো তখন সে মোটামুটি গত মহাযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি লাভ-লোকসানের কথা বুঝতে পারলো। তখন মনে হয়েছিলো আর কোথাও অশান্তির আগুন জ্বলে উঠবে না কোনোদিন। গ্লানি ক্লান্তি ক্ষতি অবসাদ মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে কঠিন সংগ্রামের পর বেঁচে থাকা কতোখানি কষ্টকর। যুদ্ধে শুধু জীবনের পরিপূর্ণ দিনের অপচয় হয়, বর্বর হয়ে যায় সুসভ্য মানুষ। অন্তত ইংল্যাণ্ডের চারপাশে তাকিয়ে সোমনাথের মনে হয়েছিলো হয়তো অভিধান থেকে যুদ্ধ কথাটি উঠে যাবে। আমাদের উত্তর-পুরুষ ইতিহাসে এই মারামারি-কাটাকাটির কথা সুদূর ভবিষ্যতে যখন পড়বে তখন আমাদের বর্বরতার কথা ভেবে অবাক হবে আর মনে মনে কল্পনা করবার চেষ্টা করবে, সভ্যতার দোহাই দিয়ে আমরা কী নীচ প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তার সমস্ত কিছু গোলমাল করে দিলো। সে জানে এরপর কী হবে। হয়তো মানুষের কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। যদি কিছু থাকে, তার পরিমাণ এতো সামান্য হবে যা নিয়ে মিলনের গান গাওয়া দূরের কথা, হয়তো সুস্থ মন নিয়ে বেঁচে থাকাই সম্ভব হবে না।

কিন্তু জয়ের ব্যাপারে সোমনাথ এক রকম নিশ্চিন্ত ছিলো। সে জানতো, হিটলারের হার হবেই। আজ সে যাই করুক না কেন, যতোখানি শক্তির পরিচয় দিক, সোমনাথের দৃঢ় বিশ্বাস দুর্জনের হাতে বেশিদিন কিছুতেই ক্ষমতা থাকে না। নিজের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের ব্যাপারে সে অনেকবার দেখেছে যারা ক্ষমতার অপব্যয় করেছে, যারা দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয় নি, আর পাঁচজনের মঙ্গল কল্যাণের কথা চিন্তা না করে শুধু ক্ষণিকের স্বার্থ আর নিজের লাভ বড়ো করে দেখেছে, খুব অল্পদিনের মধ্যেই তারা নিঃশেষে শেষ হয়ে গেছে। যার অর্থ ছিলো, সে নিঃস্ব হয়েছে, যার ক্ষমতা ছিলো সে একেবারে শক্তিহীন হয়েছে, যে অন্যকে তাচ্ছিল্য করে সব সময় নিজের সুবিধা দেখেছে, আজ পরের কাছে হাত পেতে তার দিন চালাতে হচ্ছে।

এমনি হয়। এমনি হবেই। তাই হিটলারের জয় সম্পর্কে আজ যদি সমস্ত পৃথিবী নিশ্চিন্ত হয়, সোমনাথ হবে না। হিটলারের দম্ভ, হিংস্র স্বার্থপরতা, অমানুষিক আত্মজাহির বসুন্ধরা কিছুতেই বেশিদিন সহ্য করবে না। অ্যাডলফ হিটলারের আস্ফালন সমগ্র পৃথিবীর জনগণের মিলিত শক্তিতে বন্ধ হবেই। আর তার হয়তো খুব বেশি দেরি নেই। সংগ্রাম-সঙ্কুল গম্ভীর অন্ধকারেও সোমনাথ সহসা যেন আশার আলো দেখতে পেলো।

অ্যানালিসা, একদিন একটু ভারীস্বরে ডাকলো সোমনাথ।

কী বলো ?

একটা কথা সত্যি বলবে ?

হেসে অ্যানালিসা বললো, কোন কথা তোমার কাছে সত্যি বলি নি ?

এই যুদ্ধে হিটলারের জয়ের খবর যখন তুমি পাও, তোমার মনের অবস্থা তখন কেমন হয় ?

অ্যানালিসা সহজে উত্তর দিতে পারলো না।

চুপ করে আছো কেন, বলো ?

সোমনাথের দিকে না তাকিয়ে অ্যানালিসা বললো, মাঝে মাঝে আনন্দ হয়, মাঝে মাঝে কষ্ট হয়, মাঝে মাঝে ভয় লাগে।

আনন্দ হবেই, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সোমনাথ বললো, তোমার জার্মানি আজ পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান জাত হতে চলেছে।

সোমনাথের মনের ভাব বুঝতে পেরে তার একটা হাত ধরে অ্যানালিসা বললো, ও কথা বোলো না। সত্যি বলছি তোমাকে, আমার আজকাল প্রায়ই মনে থাকে না যে আমি জার্মান, তোমার কাছ থেকে এতোদিন ধরে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি তাতে হিটলারকে আমি সমর্থন করতে পারি না। কিন্তু তবু এদের কাছ থেকে যখন জার্মান বলে দুর্ব্যবহার পাই, যখন এরা নিজেদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত মনে করে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে তখন হিটলারের কথা ভেবে গর্ব করতে ইচ্ছে হয় বৈকি। আজ বয়স হয়েছে, ছেলেও বারো বছরের হলো, আজ আরও বেশি বুঝতে শিখেছি, তাই মাঝে মাঝে তোমার কথার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে

করে। মনে হয়, মনুষ্যত্বের অধিকার চেয়ে পাওয়া যায় না, জোর করে আদায় করে নিতে হয়।

তোমার কথা আমি মানতে পারছি না অ্যানালিসা। যারা তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান, আমার মনে হয় তাদের কাছ থেকে যে কোনো অধিকার প্রেম দিয়ে নিতে হয় কারণ জোর প্রকাশ করতে গেলে যে দুর্বল সে হেরে মরবে।

অ্যানালিসা বললো, প্রেম দিয়ে চাইতে গেলে যে অধিকার তুমি পাবে তার সঙ্গে অপর পক্ষের দয়া মেশানো থাকবে, আর সে যদি দয়াবান না হয় তাহলে কোনো অধিকার তুমি পাবে না ; তাই সবচেয়ে আগে নিজের শক্তিমান হওয়া দরকার।

তাহলে তো সেই সংগ্রাম হবে শুধু।

কী জানি কেন, আজকাল আমার কেবলই মনে হয়, সংগ্রাম না হলে কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

অ্যানালিসার কথায় মনে মনে খুব বেশি আঘাত পেয়ে সোমনাথ বললো, এ তুমি কী বলছো অ্যানালিসা। এতোদিন তাহলে আমি তোমাকে যা বলেছি সব ভুল ?

কখনও না। কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে অ্যানালিসা বললো, কিন্তু অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার কথা তুমি তো আমাকে কোনোদিনও বলো নি।

না, আমি তোমাকে শুধু পৃথিবীর সকল জাতির মিলনের কথা বলে এসেছি, তা সম্ভব হলে প্রেমের মধ্যে দিয়ে শান্তি আসে, অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার কথা ওঠে না। অধিকার প্রতিষ্ঠা যে করতে চায় সে নিজের শক্তি দিয়ে অন্যকে বঞ্চিত করে, দাবিয়ে রাখে, অন্যায় লোভ করে।

অ্যানালিসা হাসলো, তাই হিটলারের মত আমি আগাগোড়া সমর্থন করতে পারি না।

আমি জানি, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে স্থির মুখের দিকে তাকিয়ে সোমনাথ বললো, আজ হিটলার তোমার মনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে বলে তোমার মাথার

ঠিক নেই। কিন্তু অ্যানালিসা, যদি আমার সামান্য দূরদৃষ্টি থাকে তাহলে কিছুতেই শেষ অবধি হিটলার জয়ী হবে না—তার হার হবেই। যদি তার জয় হয় তাহলে পৃথিবীর সভ্যতার মান অনেক নিচে নেমে যাবে। আর যতোদিন হিটলারের ক্ষমতা থাকবে ততোদিন পৃথিবীর কোথাও শান্তি থাকবে না, জার্মানিতেও নয়।

অ্যানালিসা বললো, অতো কথা বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। কি জানি, হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু তুমি এতো অশান্তিতে আছো কেন? তোমাকে এমন দিশাহারা হতে আমি তো আর কখনও দেখি নি।

অশান্তিতে নয় অ্যানালিসা, যুদ্ধের জন্যে আমি বড়োই অস্বস্তিতে আছি, ঠিক বুঝতে পারছি না কবে এর শেষ হবে।

কিন্তু খুব বেশি দিন অস্বস্তিতে থাকতে হলো না সোমনাথকে। কয়েক বছর মাত্র। তার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলো। শুধু হিটলারের হার হলো না। তার এমন আকস্মিক অন্তর্ধান বিস্ময়ের কথা বৈকি।

সেকথা যাক। সোমনাথ চারপাশে তাকিয়ে প্রাণপণে খোঁজবার চেষ্টা করলো আর কী অবশিষ্ট আছে যা নিয়ে বেঁচে থাকা যায়। শুধু ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু সুবিধা কিছু হয়েছে বৈকি। এই যুদ্ধ হাজার ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে দিয়ে অনেক কঠিন পরিচয়ের পথ সুগম করে দিয়েছে। আর একবার স্বপ্ন দেখলো সোমনাথ। এবার হয়তো তার সাধনা অনেকাংশে সফল হবে।

রাস্তায় চলতে চলতে সে দেখে বোমার আঘাত খাওয়া কতো অট্টালিকা, কতো ধ্বসেপড়া দেয়াল, এপাশে-ওপাশে জমে-ওঠা কতো ইট কত কাঠ লোহালক্কড়—বড়ো বড়ো ঢিবি। তারই ফাঁকে ফাঁকে সে শোনে নিপুণ কারিগরের মতো তৈরি করার গান। এই নিশ্চয়ই পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ। এবার হয়তো মানুষ চোখ খুলে দেখবে এই ভয়াবহ চিহ্ন, দরদ দিয়ে শুনবে কতো মায়ের কান্না, প্রেমিক কিংবা প্রেমিকার আর্তনাদ, বিচলিত হবে অনেক বিধবার অশ্রুজলে। সভ্যতা অগ্রসর হচ্ছে প্রতিদিন, সমৃদ্ধ হচ্ছে নানা মনীষীর নানা দানে, ভবিষ্যতে আর

হয়তো কোনোদিন শিক্ষিত সভ্য মানুষের বর্বর পৈশাচিক রূপ প্রকট হয়ে উঠবে না। কি জানি কেন হঠাৎ সোমনাথ যেন পরম আশ্বাস পায়।

এমনি অবস্থার মধ্যে দিনে দিনে শুধু মিলন বড়ো হতে লাগলো, অ্যানালিসার মুখের হাসি তেমন করে আর ফুটে উঠলো না আর সংসারের দারিদ্র্য তো আছেই। তবু সোমনাথ হতাশ হলো না। কেউ তার পাশে না থাক, একা সামনে এগিয়ে যাবার মতো সাহস আর শক্তি দুই-ই তার আছে আর আছে এই বিশাল পৃথিবী। ভয় কি তার!

অনেক কথা মনে হচ্ছে সোমনাথের, অনেক স্মৃতি জেগে উঠছে, কত ছবি ফুটে উঠছে মনের মাঝে তার হিসেব মেলে না।

সেপ্টেম্বর মাসের অপরাহ্ন। গ্রীষ্মের মতো গোধূলি দীর্ঘকালস্থায়ী নয়। আর মিনিট পনেরোর মধ্যে সোমনাথ বাড়ি পৌছে যাবে। ইচ্ছে করেই একটু দূরে থাকে সে। নির্জনতার মাঝে নিজেকে খুঁজে পায় আর বড়ো ধনী মনে হয় যেন। গোল্ডার্স গ্রীন থেকে দুশো চার নম্বর বাস ধরে সে আসে হেণ্ডনে। সে-পাড়ায় ছোটো একটা গোটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে সোমনাথ। কোথাও কোনো কোলাহল নেই। সামনের উঠোনে ফুলের বাগান করেছে অ্যানালিসা। গ্রীষ্মকালে ওরা তিনজন সেখানে প্রায়ই শুয়ে থাকে। যুদ্ধের পর ঘরে বাইরে নানা অভাবের জন্যে অ্যানালিসা ঝিমিয়ে গেছে, মিলন সাধারণত কম কথা বলে কিন্তু সোমনাথ লক্ষ্য করছে আজকাল হঠাৎ যেন তার মুখের বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। সে ভাবতে শিখছে, তার নিজের মত গড়ে উঠেছে। তাই সোমনাথ তাকে কাছে বসিয়ে প্রায়ই নানা আলোচনা করে, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার কথা বোঝাবার চেষ্টা করে। এই তো মিলনের ঠিক বয়স—এখন তাকে তার চলবার পথ না চিনিয়ে দিলে চলবে কেন। কিন্তু মিলনকে অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারে না সোমনাথ। তার কথা শোনায় মিলনের যেন বিশেষ উৎসাহ নেই। অথচ বাপের সঙ্গে তর্কও করে না সে। কিন্তু সে কী চায়, কী ভাবে, কী বিশেষ মত এর মধ্যেই গড়ে নিয়েছে সে, সেকথা কিছুতেই সোমনাথ ভেবে পায় না। নিজের ছেলেকে মাঝে মাঝে

তার বড়ো অচেনা মনে হয়। ও যেন দূরের মানুষ, কেন ও সোমনাথের বুকের কাছে এগিয়ে আসে না?

এমনি অবস্থায় হঠাৎ একদিন সোমনাথ যেন নতুন জীবন পেলো, তীব্র প্রাণ-শক্তিতে ঝলমল করে উঠলো তার সমস্ত শরীর। মনে মনে সে বার বার প্রণাম জানালো মহাত্মা গান্ধীকে। ভারতবর্ষ নাকি স্বাধীন হয়ে যাবে। কে আনলো এই স্বাধীনতা? কে দিলো সমগ্র ভারতবাসীকে বিনা যুদ্ধে এই জয়ের উল্লাস? ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে কে শোনালো পৃথিবীকে অহিংসার এই নতুন মন্ত্র? শুধু সেই নাম দূরদূরান্তে ধ্বনিত হয়, মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজি কি জয়!

পনেরোই আগস্ট, উনিশশো সাতচল্লিশ।

আজকের সূর্য যেন অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল। অকৃপণ আলোর সমারোহে চারপাশ ঝলমল করছে। ইণ্ডিয়া হাউসের সামনে অসংখ্য মানুষের ভিড়। লাউড স্পীকারে ধ্বনিতে হচ্ছে জাতীয় সংগীত, 'জনগণমন-অধিনায়ক জয়-হে!'

ইণ্ডিয়া হাউসের সামনে আজ গাড়ি চালাচল বন্ধ। রাস্তা ভরে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি অশ্বারোহী শিখ সৈন্য, তাদের কৃপাণে পড়েছে হাল্কা রোদ্দুর।

মাইক্রোফোনে ভেসে এলো, কার সরস কণ্ঠস্বর। একে একে পাঠ করা হলো দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর অভিনন্দন, শ্রদ্ধা জানানো হলো ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথ যাঁরা সুগম করেছেন তাঁদের আত্মাকে, শোনা গেলো কতো বিপ্লবের ইতিহাস, কতো সমস্যা সমাধানের আশ্চর্য কাহিনী, ধ্বনিত হলো স্মরণীয় কতো নাম।

লণ্ডনে ভারতীয়দের কাছে এ যেন বিস্ময়। তারা অবাক হয়ে শুনলো হাই-কমিশনারের বক্তৃতা, চোখ মেলে দেখলো জনতার আশ্চর্য ভিড়, আর উত্তেজনায় তাদের সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। এ যেন বিশ্বাস করা কঠিন।

যাদের কাছে দেশের স্মৃতি ম্লান হয়ে এসেছে, অস্পষ্ট হয়ে এসেছে আত্মীয় পরিজনের কথা আজ সহসা তাদের দেশে ফেরবার আগ্রহে মন ব্যাকুল হলো।

তারা যেন ভারতবর্ষের বড় কাছে আছে, পথের ব্যবধান মুছে গেছে, মাঝখানে সমুদ্র নেই, কোনো বাধাই নেই প্রত্যাবর্তনের—স্বাধীন ভারতের প্রতি ধূলিকণা যেন বারবার বলছে, ফিরে আয় ফিরে আয়! কিন্তু কবে—কবে?

আর কিছু চোখে পড়ে না। সামনে অসংখ্য মানুষের ভিড়, ইণ্ডিয়া হাউসের ভেতরে আনন্দের কোলাহল, প্রত্যেকের চোখে ফুটে উঠেছে দুরন্ত উল্লাস। চারপাশে অজস্র আলোর আলোড়ন, মাথার উপর হালকা মেঘে ভরা শরতের উজ্জ্বল আকাশ।

হাওয়ায় দুলছে ইণ্ডিয়া হাউসের উপর ভারতবর্ষের নতুন পতাকা। সেদিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করছে না কারুর—চোখের পলক পড়ছে না।

বিলেতে এসে কারুর কারুর নাকি নতুন জন্ম হয়। মনে হয়, আহা কী দেখলাম। এমন আর হয় না। কারুর কারুর মাথা ঘুরে যায়, ভাবে আর কোনোদিন পোড়া দেশে ফিরে যাবো না। কেউ কেউ ভাবে এ আবার একটা দেশ নাকি, এতো হিসেব করে মানুষ চলে কেমন করে—এখন কাজ শেষ করে ফিরতে পারলে বাঁচি।

কিন্তু আশ্চর্য, বোধহয় অমল দত্ত একমাত্র ব্যতিক্রম। তার ওসব কিছুই মনে হলো না। মনে হলো যেন কলকাতা থেকে বোম্বে কিংবা দিল্লীতে এলো।

অমল দত্ত বুঝেছে, পৃথিবীর যেখানেই থাকা যাক না কেন, সবচেয়ে আগে দেখতে হবে কোথায় পয়সা বেশি পাওয়া যায়। পয়সা যার আছে তার সব আছে। ওসব সংস্কৃতি অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ফাঁকা কথার কোনো মূল্য নেই তার কাছে আর পয়সা খরচ করে কোনোরকম জ্ঞান বাড়াবার তার এতোটুকুও ইচ্ছে নেই।

তাই বিলেতে এসেই সে সটান ঢুকে পড়লো ইণ্ডিয়া হাউসে। ইস্কুল অব ইকনমিক্স তার কাছে গৌণ। আর খুব শিগগিরই সে ইস্কুল থেকে বিদায় নিলো। মানে বিদায় নিতে বাধ্য হলো। অর্থাৎ অমল দত্ত সব বিষয়ে আশ্চর্য কম নম্বর পেয়ে ফেল করেছে। খবর শুনে সে মোটেই বিচলিত হলো না। মনে মনে বললো, দুত্তোর, বুড়ো বয়সে আর কী হবে পড়াশুনো করে। বাবার টাকা নষ্ট করছি না, উলটে রীতিমতো রোজগার করছি। কাজেই এখন যাতে চাকরিতে উন্নতি হয় তার চেষ্টা সবচেয়ে আগে করা দরকার।

তার ফেল করার খবর পেয়ে চঞ্চল তাকে অনেক বোঝালো, দেখো অমল, আর একবার চেষ্টা করো, পাশ না করে দেশে ফিরবে কেমন করে?

আরে রাখো তোমার দেশ, এখানে যেমন চাকরি পেয়েছি তেমন চাকরি পাবো তোমার হতভাগা দেশে ?

তা কেরানীগিরি একটা পাবে বৈকি।

পাবো ? বললেই হলো। ইংল্যাণ্ডে কেরানীর মাইনে কত জানো ? সপ্তাহে সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড। আর তোমার দেশে আমাদের মতো গুণবান ছেলেদের মাইনে মাসে পাঁচ পাউণ্ড হয় কিনা সন্দেহ।

তাই তো বলছিলাম পাশ করে দেশে ফিরতে, তাহলে ভালো চাকরি অনায়াসেই পাবে।

অমল দত্ত মাথা দুলিয়ে বললো, দরকার নেই আমার ভালো চাকরি পেয়ে। পাশ করতে গেলে চাকরি করা চলে না—অনেক পড়াশুনো করা দরকার। আমার অতো সময়ও নেই, পয়সাও নেই।

তাহলে এলে কেন এদেশে ?

চাকরি করতে, অনেক বছর লেগে থাকবো, উন্নতি করবো। তারপর এরা দিল্লীতে বদলী করে ভালোই, না করে সাত-আট বছর পরে ছুটি নিয়ে কয়েক মাসের জন্যে দেশে বেড়িয়ে আসবো। ব্যাস ফুরিয়ে গেলো—

আর যদি এরা বদলী না করে তাহলে ?

সেকথা পরে ভাববো। এখন পয়সার ভাবনা করাই সব দিক থেকে বুদ্ধিমানের কাজ।

চঞ্চল অমলের একমাত্র বন্ধু হলেও তারই সঙ্গে সব সময় তর্কাতর্কি করতে হয়। চঞ্চল যতোই অমলকে ভালোভাবে নানা কথা বোঝাতে যায় অমল দত্ত ততোই ক্ষেপে ওঠে, হাজার বোঝালেও কিছুই বুঝতে চায় না। তার সব সময় ভয় নানা মোহে ফেলে পাছে চঞ্চল তার পয়সা খরচ করিয়ে ফেলে।

দেখো অমল, বিদেশে আসবার সৌভাগ্য সকলের হয় না, তুমি যখন আসতে পেরেছো তখন কেন পাঁচজনের সঙ্গে মিশে পাঁচ রকম অভিজ্ঞতা বাড়াচ্ছো না ?

কী দরকার ? ওসব করতে গেলেই তো পয়সা খরচ।

তা না হয় একটু হলো পয়সা খরচ। পয়সা জীবনের সবচেয়ে বড়ো জিনিস নয়।

বাজে কথা বোলো না, পয়সা সবচেয়ে বড়ো জিনিস। যাও না কারুর কাছ থেকে দু পাউণ্ড চেয়ে দেখো না, লোকের মুখের চেহারা কেমন হয়ে যায়।
অনেকের আবার হয় না। বন্ধুবান্ধবের জন্যে অকাতরে কতো লোক কতো ত্যাগ করে।
হ্যাঁ, কিন্তু সেকাজ যারা করে তারা সকলেই পরে অনুতাপ করে। মোট কথা তুমি ভালো করে জেনে রাখো চঞ্চল, আমি বিলেতেই আসি কি মঙ্গল গ্রহেই যাই পয়সা বাড়ানোর জন্যেই যাবো, খরচ করবার জন্যে নয়।
তোমার মতো বয়সের ছেলের মুখে একথা মানায় না বলেই আমি তোমাকে বারবার সাবধান করে দিচ্ছি, একটা সিগ্রেট ধরিয়ে চঞ্চল বললো, এদেশে এসেছো, একবার চোখ খুলে চারপাশে তাকিয়ে দেখো—
বাধা দিয়ে অমল দত্ত বললো, আমি চোখ খুলেই তাকাই চঞ্চল।
না, একটু রেগে বেশ জোর দিয়ে চঞ্চল বললো, তুমি তা করো না অমল। তা যদি করতে তাহলে কিছুতেই এই দীন মন নিয়ে কৃপণের মতো এদেশে দিন কাটাতে পারতে না। যৌবন বেশিদিন থাকে না। জীবনে সোনার সময় যৌবন। যারা সেই সময় হিসেব করে কাটালো, যৌবনের আহ্বানে সাড়া দিতে পারলো না, তারা দুর্ভাগা। তুমি সেই দুর্ভাগাদের একজন। আমরা বড় বেশি হিসেবি, সারা জীবন হিসেব-নিকেশের পালা চলে। যৌবন ক্ষণ-কালের জন্যে আমাদের আনমনা করে দেয়, অফুরান প্রাণশক্তি সব কিছু গোলমাল করে দেয়—
আরে দূর, এসব শুনে কি হবে? শেষ অবধি সেই পয়সা খরচের কথা এসে পড়বে, আমি ওর মধ্যে নেই বাপু।
তোমার কিচ্ছু হবে না, মাঝ-বয়সে খাটে শুয়ে শুধু নানা রকম রোগে ভুগবে।
সে তো সকলেই ভোগে বাপু।
চুপ করো, তোমার মাথায় কিছু ঢুকবে না।
ঢোকে, কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই ওসব ঢোকাতে চাই না, বুঝলে না, ওসব মাথায় ঢুকলেই কিছু খরচ হয়ে যাবে, মুচকি হেসে অমল দত্ত বললো, তোমার কথা

ভেবে আমি মাঝ-রাত্তিরে ভাবনায় খাটের ওপর উঠে বসি, কি সাংঘাতিক খরচ করো তুমি, আজেবাজে ব্যাপারে হুট হুট করে পাউণ্ডের পর পাউণ্ড ওড়াও—
বেশ করি। খরচ করতে করতে আমি যদি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাই তাহলেও আমার দুঃখ থাকবে না, খেতে না পেলেও আমার মনে হবে, জীবনে আমি অনেক দেখেছি, অনেক জেনেছি, অনেক পেয়েছি—
পয়সা নষ্ট করে ওসব আজে-বাজে কথা ভেবে লাভ কি ?
সেকথা তুমি বুঝতে পারবে না মূর্খ।
দরকার নেই আমার বুঝে।
সুযোগ পেলেই এমনি অনেক কথা চঞ্চল অমল দত্তকে বোঝায় কিন্তু সে ভুলেও এসব কথায় কান দেয় না। চঞ্চলের সঙ্গে অন্য রসিকতা করে কথা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে।
এখন অমল দত্তর একমাত্র কাজ অফিসে উন্নতি করা। তাই বন্ধুবান্ধব আর সমসাময়িক কেরানীরা হাজার বিদ্রূপ করলেও গ্রাহ্য করে না, অফিসে উন্নতি করতে হলে যে প্রচলিত সনাতন রীতির অনুসরণ করতে হয় সে পরম উৎসাহে তাই করে। অর্থাৎ পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে আদর্শ গোলামি। যারা জীবনে উন্নতি করতে চায় কিংবা উন্নতি করে, তাদের নিন্দে করা একদল মানুষের স্বভাব। তাই অমল দত্তর ধারণা হলো তাকে যতো বেশি লোকে নিন্দে করবে সে অফিসে ততো বেশি উন্নতি করবে।
আর হলোও তাই। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে ইণ্ডিয়া হাউসের কেষ্ট-বিষ্টুর চোখে পড়ে গেল। তাকে চিনলো সকলে। এমনকি মাঝে মাঝে স্বয়ং হাই-কমিশনার তাকে ডেকে পাঠায়। অমল দত্ত মনে মনে খুশী হয়ে ভাবে, আর দেরি নেই, হাইকমিশনারের চোখে যখন সে পড়েছে তখন শিগগিরই সে একটা জুনিয়ার এক্সিকিউটিভ হয়ে বসবে।
কি হে, একদিন চোখ পাকিয়ে অনঙ্গ দাশ বললো, এবার মন কয়েক তেল আনাও দেশ থেকে, খাঁটি সরিষার তিল তৈল। এক হাতে কফি খাওয়াও আর এক হাতে কষে তৈল মর্দন কর। ওই করে দেখ যদি উন্নতি করতে

পারো। মগজে তো কিছু নেই তোমার, কাজে কর্মে বাহাদুরি দেখাতে পারবে না।

একটু কঠিন কণ্ঠে অমল দত্ত বললো, নিজের ভাবনা ভাবুন, আমার কথা ভাবতে কে বলেছে আপনাকে।

এর মধ্যেই মুখে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা যে। শোনো ছোকরা, ওসব ধামা ধরে এখানে কিছুই স্থবিধা করতে পারবে না, বুঝেছো? এতো বুদ্ধিমান হয়ে আমারই কিছু হলো না এখানে, তা তুমি তো একটা পুচকে গাধা।

আর কথা না বাড়িয়ে অমল দত্ত এড়িয়ে গেল অনঙ্গ দাশকে। শুধু হাই-কমিশনারের নয়, ইণ্ডিয়া হাউসের অফিসারদের মধ্যে যারা কাজের লোক বলে নাম করেছে এমন দিন যায় না যেদিন অনঙ্গ দাশ তাদের নিন্দে না করে। আর ইণ্ডিয়া হাউসের নিন্দে করা তার যেন অভ্যাস হয়ে গেছে। এখানে কিছু হয় না। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি প্রচারের ভার যাদের উপর তারা নিজেরা এক-একটা অপদার্থ। দেশের কী জানে তারা যে বিদেশে প্রচার করবে—এক একটা বাঁদর। স্থযোগ পেলেই ভারতবর্ষের নিন্দে করে তারা। সে দেশ অনেক পেছিয়ে আছে, সে দেশের মেয়েরা স্বামীর গলগ্রহ, সে দেশের লোকেরা নোংরা, অকারণ কৌতূহলী, হিংস্থক ইত্যাদি নানা কথা।

এতো কথা অনঙ্গ দাশ যদি ইণ্ডিয়া হাউসের ভিতর বসে সেখানকার চাকুরেদের মধ্যে বলাবলি করতো তাহলেও না হয় তাকে ক্ষমা করা যেতো। কিন্তু অমল দত্ত শুনেছে এসব কথা সে সর্বত্র বলে বেড়ায়। হাইকমিশনারও একথা নাকি শুনেছে। কিন্তু রাগ না করে হেসে অনঙ্গ দাশের নাম করে বলেছে, ও তো পাগল, ওর কথা কেউ ধরে না। কাজেই যা খুশি বলুক ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

খুব ভালো লোক হাইকমিশনার। অমল দত্ত মনে মনে ভাবে, তাই বেঁচে যায় অনঙ্গ দাশের মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্বর। পাগল! কথা শুনে অমল দত্তর রক্ত গরম হয়ে ওঠে, অমন সেয়ান পাগলকে গারদে শেকল দিয়ে বেঁধে না রাখলে সমস্ত দেশের দুর্নাম।

এই ধরনের লোকদের দুচোখে দেখতে পারে না অমল দত্ত। আর এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে প্রচুর—যারা যেখানে কাজ করে সেখানকার নিন্দে করে বেড়ায়। অক্ষমতার জন্যে নিজেরা উন্নতি করতে পারে না, নিজগুণে যারা উন্নতি করে কেবলই তাদের দোষ ধরে পাঁচজনকে বোঝায় যে তারা নানা হীন কাজ করে সেই প্রতিষ্ঠানে নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করছে। আসলে তাদের কোনো বুদ্ধি নেই, গুণ নেই, ক্ষমতা নেই। তারা আরও বলে যে তারা নিজেরা গুণী লোক। ক্ষমতা হাতে পেলে তারা নাকি একাই আপিস চালাতে পারে। শুধু অন্যায় আর অবিচার দিয়ে তাদের মতো প্রতিভাবান লোককে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে।

অমল দত্তর মতে অনঙ্গ দাশ এমন একজন লোক। শুধু অনঙ্গ দাশ নয়, ইণ্ডিয়া হাউসে এমন আরও অনেকে আছে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না অমল দত্ত, দেখা হলে কথাও বলে না। শুধু অনঙ্গ দাশকে নিয়ে তার মুশকিল, তাকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই, কথা না বললেও গায়ে পড়ে তর্ক করে।

অমল দত্তর মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে অনঙ্গ দাশকে স্পষ্ট বলতে যে যদি সে বোঝে যে এখানে তার উপর অবিচার করা হচ্ছে, সক্ষম হলেও ইচ্ছে করে উন্নতি বন্ধ রাখা হয়েছে তাহলে কেন সে ইণ্ডিয়া হাউস ছেড়ে অন্য কোথাও যাচ্ছে না যেখানে কর্তারা তার মর্ম বুঝে তাকে মাথায় তুলে রাখবে। কিন্তু সেকথা ওই গোঁয়ার লোকটাকে বলে কে! বয়স হলো তবু সামান্য গাম্ভীর্য নেই, যার তার সঙ্গে যা-তা রসিকতা করে জীবন কাটালো।

মাঝে মাঝে তর্ক করলেও তার মতো লোকের কথা গ্রাহ্য করে না অমল দত্ত। সে শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সে জানে শুধু অফিসে ঠিকমতো কাজ করলে তাড়াতাড়ি উন্নতি হয় না, অফিসের বাইরেও কতকগুলো কাজ নিয়ম করে করতে হয়।

তাই সে অবসর সময়ে নানা ভাবনা ভাবে। কী করা যায়? অনেক ভেবে ভেবে সে ঠিক করে, একটা সভা-সমিতির পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে গান-বাজনা সাহিত্য ইত্যাদি করা হবে। খুব বেশি দরকার নেই,

মাসে একবার করে সভা করলেই হবে। হ্যাঁ, খুব চমৎকার হবে তাহলে। সকলে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে। আর এটা করে দেখিয়ে দিতে পারলে হাইকমিশনার নিঃসন্দেহ হবে যে গড়ে তোলবার ক্ষমতা অমল দত্তর আছে। তাছাড়া—কথাটা ভাবতেই শরীরে শিহরণের ঢেউ খেলে গেলো অমল দত্তর। চঞ্চলের উপর বিনা নোটিশে সভার সাহিত্যের ভার অমল দত্ত দিয়ে দিলো। নিজেই হলো সেক্রেটারি। তারপর সটান হাজির হলো ইণ্ডিয়া হাউসের বাঙালী, বোম্বেওয়ালা, মাদ্রাজী ছত্রিশ জাতের কর্তাদের স্ত্রীর কাছে। একটুও ভূমিকা না করে সে বললো, দেখুন মিসেস রামানি, এই সভায় আপনাকে সেতার বাজাতে হবে।

বলো কি অমল? আমি যে খুব অল্প শিখেছি, মেডিকেল অ্যাডভাইসারের স্ত্রী একটু পুলকিত হলো যেন।

কী যে বলেন, যা জানেন তাই যথেষ্ট, এদেশের লোককে আমাদের দেশের বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে কিছু জানানো দরকার, আপনি ছাড়া এতো বড়ো শক্ত কাজ করবার মতো লোক এই লণ্ডন শহরে এখন আর কে আছে বলুন।

তবু নখ খুঁটে মৃদু হেসে মিসেস রামানি বলে, কিন্তু আমি কি পারব? ভাবটা আর একবার সাধিলেই খাইব গোছের।

এবার কথা বললো ডাঃ রামানি, মেডিকেল অ্যাডভাইসার স্বয়ং, কেন পারবে না রানী, নিশ্চয় পারবে আর অমল যখন বলছে অতো করে—সত্যি বড়ো ভালো ছেলে অমল। কতো বড়ো একটা কাজ করতে যাচ্ছে একবার ভেবে দেখো তো? তোমরা পাঁচজন ওকে সাহায্য না করলে ও বেচারা একা সমস্ত দিক সামলাবে কেমন করে?

স্যার, একটু ইতস্তত করে অমল দত্ত বললো, আর আপনাকে একটা ছোটো বক্তৃতা দিতে হবে।

আমাকে? জোরে হেসে ডাঃ রামানি বললো, সাহিত্য-সভায় আমি বক্তৃতা দোবো কি হে?

তাতে কি হয়েছে স্যার, শরীর সম্বন্ধে দুকথা সব জায়গায় বলা যায়। এক মিনিট

থেমে অমল বললো, এতো সুন্দর বক্তৃতা করতে পারেন আপনি—সেদিন ইণ্ডিয়া হাউসের মিটিংএ যা বললেন—

না না, আমি পারবো না, তুমি রানীকে নিয়ে যাও।

তাহলে কথা দিন স্যার, পরের মিটিংএ আপনি একটা বক্তৃতা করবেন?

সে পরে দেখা যাবে এখন, ডাঃ রামানি হেসে চুপ করে রইলো।

ঠিক এমনি করে অমল দত্ত ইণ্ডিয়া হাউসের প্রত্যেক বড়ো বড়ো চাঁইএর বাড়ি গিয়ে হানা দিলো। অসুবিধা হলো না কোথাও, সকলকে খুব সহজে রাজী করানো গেলো। যে ভারতীয় অফিসারের স্ত্রী ইংরেজ তাকেও রেহাই দিলো না অমল দত্ত।

ব্যাকুল অনুরোধ করে বললো, টেগোরের একটা কবিতা আপনাকে দয়া করে আবৃত্তি করতেই হবে।

কিন্তু আমি তো ও সব করি নি কখনও, লোকজনের সামনে বড়ো ঘাবড়ে যাই যে?

কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না, আমি সব ঠিক করে দেবো। দেখে দেখে রিডিং পড়বেন তাতে আর ঘাবড়াবার কি আছে। এই যে, আপনাকে ইংরেজীতে পড়তে হবে টেগোরের উর্বশী। খুব চমৎকার কবিতা, নিন বইটা রাখুন আপনার কাছে! ভয় পাচ্ছেন কেন মিসেস বিশ্বাস? হেসে অমল দত্ত বললো, এ তো আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার—

একে একে সব ঠিক হয়ে গেলো! বাহাদুরি আছে বৈকি অমল দত্তর। সমস্ত বন্দোবস্ত সে একাই করে ফেললো।

ওদিকে খবর জানতে কারোর বাকি রইলো না। অনঙ্গ দাশ তো হেসেই অস্থির। বলো কি? এ যে গাধা-বাঁদরের কনসার্ট পার্টি। ওহে অমল দত্ত, শোনো শোনো, কি ব্যাপার অ্যাঁ মতলবখানা কি তোমার?

অতো কথায় আপনার কি দরকার?

হাসতে হাসতে অনঙ্গ দাশ বললো, একেবারে তাজ্জব ব্যাপার হবে লণ্ডন শহরে, অমল দত্ত দেখাবে বটে। ভগবান তুমি যুগে যুগে ভূত পাঠায়েছো লণ্ডনে—

খবর শুনে কে একজন অমলকে বলতে এসেছিলো, শুনুন, মিঃ ঘোষকে খবর দিন, ওরা দেশ থেকে বেড়াতে এসেছেন, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সুন্দর গাইতে পারেন। সেকথায় কান না দিয়ে অমল দত্ত বললো, অমন হাজার হাজার লোক আসে রোজ দেশ থেকে, সকলে গাইতে এলে জায়গা হবে কেমন করে? ব্যাপারটা আমি শুধু ইণ্ডিয়া হাউসের মধ্যেই রাখতে চাই, বুঝলেন না?
বক্তৃতা দেবার মতো বিদ্যা নেই অমল দত্তর। কাজেই সে চঞ্চলের শরণ নিলো, বললো, তুমি না থাকলে কিছুতেই চলবে না, এই একটু ভূমিকা করে সকলের প্রশংসা করে দেবে আর কি।
চঞ্চল হেসে বললো, দেবো।
একটা ছোটো হল ভাড়া করলো অমল। ভালো খাবার-দাবার ব্যবস্থা করলো। বলা বাহুল্য সকলের কাছ থেকে চাঁদা সে বহুদিন আগে থেকে তুলতে শুরু করেছিলো।

সভা হয়ে গেলো অমল দত্তর। ভারি খুশী ইণ্ডিয়া হাউসের বড়ো বড়ো অফিসাররা। তারা অমলের পিঠ চাপড়ে দিলো। কিন্তু নিন্দে করবার লোকের তো অভাব নেই লণ্ডনে। তারা বাঁকা হাসি হেসে নানা কথা বলতে লাগলো। কিন্তু তাতে ভারি বয়ে গেল অমল দত্তর। যাদের খুশী করবার জন্যে এই সভার আয়োজন তারা তো খুশী হয়েছে। সার্থক হলো তার পরিশ্রম, উদ্দেশ্য সফল হলো। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তার সত্যিই অফিসে উন্নতি হলো। তিন নম্বর কেরানী থেকে একেবারে এসটেবলিস্ট ক্ল্যারিকেল অফিসার।

উন্নতি হবার পর অমল দত্তর একটু পরিবর্তন হলো মনে, এতোদিন পর হঠাৎ যেন সে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবার সময় পেলো। খুব বেশি আনন্দ হয়েছে তার। অথচ তার কেউ নেই যে পরিপূর্ণভাবে এই আনন্দের ভাগ নিতে পারে। বড়ো ফাঁকা-ফাঁকা মনে হলো যেন চারপাশ। চঞ্চল ঠিক কথাই বলেছিলো তাকে একদিন, সত্যিই সে বড়ো দুর্ভাগ্য।

সারাদিন বাইরে কাটানোর পর ক্লান্ত পাখিও নীড়ে ফিরে এসে বিশ্রাম করে। সঙ্গীও তো থাকে তার। কিন্তু নীড় কোথায় অমল দত্তর? কেনটিস্ টাউনের একখানি নোংরা সস্তা ঘর। নিজেই সমস্ত করে সে। বাজার, রান্না, বাসন মাজা। একটি লোকও নেই তাকে সাহায্য করবার। আজ এই আকস্মিক উন্নতি হওয়ার পর নিজেকে বড়ো ক্লান্ত মনে হলো অমল দত্তর।

কিন্তু যতোই ক্লান্তি আসুক, তা অপসারণ করবার জন্যে এদেশের মেয়ে কিছুতেই বিয়ে করতে পারবে না সে। যদি শেষ অবধি বিয়ে করতেই হয় তাহলে ছুটি নিয়ে দেশে গিয়ে খাঁটি বাঙালী মেয়ে বিয়ে করে আনবে। বিলেতের মেয়েদের সঙ্গে ফূর্তি করা যায়, দুদিন খেলা করা যায় কিন্তু কিছুতেই বিয়ে করা যায় না। অমল দত্তর ধারণা ইউরোপের একটি মেয়েও তাদের দেশের বেশির ভাগ মেয়েদের মতো বিয়ের আগে পর্যন্ত খাঁটি থাকে না। তার ভাষায়, কৌমার্যের অহঙ্কার এদেশের কোনো মেয়েই করতে পারে না। আর তেমন মেয়েকে নিয়ে ঘর করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে চঞ্চলের সঙ্গে তার অনেকদিন তুমুল তর্ক হয়ে গেছে। বুঝেছো অমল, অনেক কষ্টে রাগ সামলে চঞ্চল বলে, তুমি শিক্ষায় সভ্যতায় এযুগের চেয়ে এতোদূর পেছিয়ে আছো যে তোমার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে করে না।

কেন, কেন? সত্যি কথা বলি বলে?

জীবনকে তুমি বড়ো ছোটো করে দেখো, বড়ো কম বোঝো জীবনের।

তা তর্ক করে বুঝিয়ে দাও না দেখি? কিছু বোঝাতে না পেরে আমাকে শুধু শুধু গালাগাল করে কী হবে?

এদেশের মেয়েদের বিরুদ্ধে এতো বড়ো কথা তুমি বলো কেমন করে?

বড়ো কথা আবার কি? আমি ঠিক কথাই বলি। এদেশের সব মেয়ের বিয়ের আগেই কৌমার্য ঘুচে যায়, সেকথা তুমি অস্বীকার করো?

নিশ্চয়ই, আমার প্রথম প্রশ্ন হলো এদেশে তুমি কজন মেয়ের সঙ্গে মিশেছো যে সব মেয়ের সম্বন্ধে তুমি এমন কথা বলো?

নাও, একথা জানতে আবার একটার পর একটা মেয়ের পেছনে ঘুরতে হয়

নাকি ? এ তো সবাই জানে যে এদেশে যে কোনো মেয়ের সঙ্গে একটু আলাপ হলেই তাকে ঘরে নিয়ে যাওয়া যায়, সমুদ্রতীরে বেড়াতে নিয়ে হোটেলের এক ঘরে থাকা যায়, যা ইচ্ছে তাই করা যায় আর সবাই তো তাই করে থাকে বাপু, হেসে অমল দত্ত বলে, মাছ দিয়ে শাক ঢেকে তোমার কী লাভ চঞ্চল ?

অমল তুমি এদেশে বৃথাই এতোদিন কাটালে। কিছুই জানলে না, বোকাব মতো শুধু শুনে বিচার করতে শিখলে। তুমি যা ভাবো এদেশের মেয়েরা তা করে না—

নাঃ করে না ? বললেই হলো ?

হ্যাঁ, আমি ঠিক কথাই বলছি। চুপ করে শোনো। তুমি ঠিক কোন শ্রেণীর মেয়েদের কথা শুনেছো আমি জানি না। বলা বাহুল্য যে তেমন কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার এখনও আলাপ হয় নি। আমি যাদের সঙ্গে মিশেছি তাতে শুধু এইটুকু বুঝেছি যে তারা ঠিক আমাদের দেশের মেয়েদের মতো—

ফিক করে হেসে অমল দত্ত বললো, হাসালে বটে চঞ্চল।

শোনো চুপ করে, চঞ্চল বললো, প্রেম হলে বিয়ের আগে অনেক দেশের অনেক মেয়ে প্রেমিকের সঙ্গে হয়তো রাত কাটায়, তুমি শুধু এদেশের মেয়েদের কথা তুলছো কেন অমল ?

রাখো তোমার প্রেম, প্রেমের কথাই তোলবার দরকার হয় না, একদিন লাঞ্চ খাওয়ালেই হলো।

তোমার বুদ্ধি বড়ো স্থূল অমল।

যা চোখে দেখছি তাই বলছি, তুমি আছো তোমার কল্পনার রাজ্যে তাই এদেশের মেয়েদের বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করছো। ওই ক্লাব থেকে রাজ্যের ছোকরারা এক-একদিন একটা মেয়ে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, ওদের সকলের প্রেম আছে নাকি ?

না থাকলেও তুমি যাদের কথা বলছো ওসব ছেলেরা প্রেমের ভান করে নিশ্চয়ই, তা না হলে কোনো ভদ্র মেয়ে কিছুতেই কোনো পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে না।

আচ্ছা ধরে নিলাম তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু তাহলেও আমি প্রথমে যা বলেছি সেই কথাই শেষ অবধি থেকে যাচ্ছে কিন্তু।

কি বলেছো বলো, আমার মনে নেই।

তা থাকবে কেন, সত্যি কথা কি না। আমি বলেছি যে প্রেমের জন্যে হোক কি প্রেমের ভানের জন্যে হোক এদেশের মেয়েদের বিয়ের আগে কৌমার্য ঘুচে যায়। কারুর কারুর হয়তো যায় কিন্তু সকলের যায় না। আর আমাদের দেশের মেয়েদের বেলায়ও ঠিক সেই কথাই খাটে।

ফিকফিক করে হেসে অমল দত্ত বললো, তুমি হাসালে বটে চঞ্চল।

তুমি হাসতে পারো কিন্তু তোমাকে দেখে আমার কান্না পাচ্ছে, জীবনের তুমি কিছুই জানো না। এদেশের মেয়েদের তুমি যতো সুলভ মনে করো তারা ঠিক ততোখানি সুলভ নয়। আর অনেক ক্ষেত্রে দায়ে পড়ে হয়তো অনেক মেয়ে নিজেদের বিলিয়ে দেয় কিন্তু আমি বলি তাদেরও সংখ্যা কম।

আচ্ছা আমি তোমাকে প্রমাণ করে দেবো।

দাও। তাহলে আমি নিশ্চয়ই আমার মত বদলাবো।

হ্যাঁ, ইংরেজ মেয়েরা একটু চালাক বটে কিন্তু শেষ অবধি সকলেই এক।

কোনো ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে আজ অবধি তুমি মিশতে পেরেছো ?

চেষ্টাই করি নি।

করে দেখো, পারবে না। যারা তোমার মতো কথা বলে তারা কণ্টিনেণ্টের দুস্থ অসহায় মেয়েদের ধাপ্পা দিয়ে বোকা বানায় আর তারাই তোমার মতো কথ বলে। হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি, এদেশের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিে বাইরের সমস্ত কাজ করে বলে তাদের জীবনধারণের রীতিনীতি একটু অন্ রকম, কিন্তু তারা সকলে কখনই সুলভ নয়। তোমার মতামত এমন হলে আজ আমি তোমাকে বলে দিলাম অমল, তুমি কোনোদিন কোনো ভদ্র-মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারবে না।

এখানে মেয়েদের সঙ্গে কে না মিশতে পারে ? আমি না মিশে পয়সা বাঁচাচি বলেই তো আমার বাহাদুরি !

তুমি চেষ্টা করলেও মিশতে পারবে না। আর যদি পারো, একদিন কোনো মেয়ের কাছ থেকে ভীষণভাবে অপমানিত হবে।

আরে থামাও তোমার বক্তৃতা, একবার বাজার ঘুরে দেখো তাহলেই আমার মতো কথা তোমার মুখ থেকেও বেরিয়ে আসবে।

আমি দেখেছি অমল। আর বুঝেছি এরা শুধু জীবনকে ব্যাপকভাবে দেখে। তোমার মন সংকীর্ণ, তোমার দৃষ্টি স্থূল তাই তুমি এদের ছোটো করে দেখো।

আবার কী করে দেখবো? বিয়ের আগে যে মেয়েরা গণ্ডায় গণ্ডায় প্রেম করে তারা কি সতীলক্ষ্মী নাকি?

আমার মনে হয়, চঞ্চল অমলের দিকে তাকিয়ে বললো, আমার মনে হয় তুমি সতী কথাটা জানো না। এরা বিয়ের আগে প্রেম করে বটে কারণ সেটা এদেশের নিয়ম। কিন্তু খবর রাখো প্রেম ভাঙেই বা কেন?

কেন আবার? একস্বরে অমল দত্ত বললো, কিছুদিন ফুর্তি করবার পর এ লোকটা পুরোনো হয়ে যায় তখন আর একটা নতুন লোক ধরবার ইচ্ছে জাগে।

তোমার সেকথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আসলে ঠিক তা নয় অমল। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে তারা হয়তো হঠাৎ একদিন বুঝতে পারে তাদের কোথায় একটা গলদ দেখা গেছে যার জন্যে বিয়ে করলে তারা সুখী হতে পারবে না। পাছে সারাজীবন ধরে দুজনে দুজনকে প্রবঞ্চনা করে চলে এই ভেবে তারা প্রথমেই সতর্ক হয়ে সম্পর্কের ছেদ টেনে দেয়।

বাঃ, এমন টানা যদি দশ-বারো বার চলে তাহলে সে-মেয়ের আর রইলো কি?

আসল সতীত্ব রইলো। অর্থাৎ সে তার প্রেমিককে প্রবঞ্চনা করে নি। সত্যি কথা বলে কঠিন আঘাত সহ্য করেছে তবু মিথ্যা সম্পর্ক গড়ে তুলে নিজেকে বঞ্চনা করে নি।

এদেশের মেয়েরা তোমার এসব বড়ো বড়ো কথার মানে বুঝবে?

বুঝবে বৈকি, হেসে চঞ্চল বললো, জীবনের সঙ্গে আসল পরিচয় হলে তুমিও বুঝবে অমল।

দরকার নেই আমার বুঝে, বার কয়েক মাথা চুলকে অমল দত্ত বললো, বিয়ের

আগে যদি এতো বুঝে-শুনে প্রেম করে তাহলে বিয়ের পর আবার ঘটা করে ডিভোর্স হয় কেন ?

দূর থেকে আমরা যতো বেশি শুনেছিলাম, কাছে এসে দেখছো তো ঠিক ততো বেশি বিচ্ছেদ এদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয় না।

আরে তবু হয় কেন তাই বলো না ছাই ? এই তো একটু আগে বললে বিয়ের আগেই গলদ পেয়ে ঘাড় থেকে নেমে যায়।

হয়তো অনেকে বিয়ের পর সেটা বোঝে।

বাঃ বাঃ, তাই ঘর ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে ?

সম্পর্ক মিথ্যা হলে বেরিয়ে আসতে হবে বৈকি। প্রবঞ্চনা করে পাঁচজনের খাতিরে মিথ্যার অভিনয় এদেশের লোক করে না।

না, তাই বিয়ের পরেও দেখেছি, স্বামীর আড়ালে প্রেম করে যখন ধরা পড়লো তখন স্ত্রী বেরিয়ে এসে বিচ্ছেদের মামলা আনলো। তারপর মামলা চুকে গেলে আবার ধাঁ করে বিয়ে করে বসলো—এটা কি প্রবঞ্চনা নয় ?

না। প্রবঞ্চনা হলে সে বেরিয়ে এসে মামলা করতো না। আর সকলে তো লুকিয়ে প্রেম করে না। আগেই স্বামীকে জানিয়ে দিয়ে সরে যায়।

অর্থাৎ খুব একটা বাহাদুরি করে। আর ভোগ করবার ইচ্ছে এতো প্রবল যে কিছুতেই প্রবৃত্তি দমন করতে পারে না বলে বেরিয়ে আসে। এদের তুমি কোন বুদ্ধিতে সতী বলো বুঝতে পারি না।

চঞ্চল রেগে বললো, তুমি বাজে কথা বলছো অমল। এসব কথা পৃথিবীর যে কোনো দেশের মেয়ের বেলায় খাটে। এসব নিয়ে তর্ক করে কিছু বোঝানো যায় না। তুমি শুধু এদেশের মেয়েদের উদাহরণ দিচ্ছো কেন ? কার জীবনে কী কারণে কী বিপর্যয় ঘটে তা নিয়ে কথা বলবার আমাদের কারুর কোনো অধিকার নেই ; আর তার জন্যে কাউকে ছোটো করাও চলে না।

তোমার কিছু বলবার নেই বলো ? অমল দত্ত মুচকি হাসলো।

আছে। কিন্তু তোমাকে বোঝানো শক্ত।

হ্যাঁ, মুখ বেঁকিয়ে অমল দত্ত বললো, বোঝানো শক্ত। নিজে খালি বই পড়ে

বিচার করো, কিছু খবর রাখো না বাইরের জগতের। কতো মেয়েকে দেখেছি আজ একজনকে নিয়ে হৈ হৈ করছে, কাল তাকে হারিয়ে কাঁদছে, পরের দিন আবার একটাকে জুটিয়ে নাচতে নিয়ে চলেছে। এদের আবার প্রেম! বন্ধু ছাড়া এদেশের কোনো মেয়ের চলে না।

সেটা তো ভালোই, জীবনকে এরা পুরোপুরি উপভোগ করে।

তা আমি তো সেই কথাই বলছিলাম বাপু এতোক্ষণ ধরে যে ভোগ করতে পেলে এরা আর কিছু চায় না।

সব মানুষই ভোগ করতে চায় অমল। আমাদের দেশের লোক কি সুযোগ পেলে ভোগ করবে না?

করে। কিন্তু বিচ্ছেদের যন্ত্রণাও তাদের কম নয়। প্রিয়জনকে হারিয়ে তারা অন্তত কিছুদিন শোক করে। আর এরা? আজ বিচ্ছেদ হলে কাল আর একজনকে ধরে ফুর্তি করে।

এসব কথা বললে অনেক ভেবে বলতে হয়। তুমি ভালো করে বুঝে দেখো যে মনের সম্পর্ক যদি না থাকে তাহলে শোক করবার কোনো মানে হয় না। কিন্তু যদি সে সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ দুজনের মধ্যে একজনের ইচ্ছেয় বিচ্ছেদ হয় তাহলে এরাও নিশ্চয়ই শোক করে।

ছাই করে। এসব কথা ওরা বোঝেও না।

কিন্তু এরা যা বোঝে তোমার তা বোঝবার ক্ষমতা নেই! তুমি শুধু মানুষকে ছোটো করে দেখতে শিখেছো।

বললেই হলো? তোমার মতো আমি ছোটো জিনিসকে বড়ো করে দেখতে শিখি নি বলতে পারো।

চঞ্চল হেসে বললো, মানুষকে বড়ো করে দেখতে শিখলে শান্তি পাওয়া যায় অমল।

বাজে কথা ভেবে অমন বোকার মতো শান্তি পেয়ে আমার দরকার নেই। জানো চঞ্চল, অমল দত্ত হঠাৎ রেগে উঠলো, এরা অতীতকে একেবারে অস্বীকার করে। আমাদের দেশের বিধবারা যে কৃচ্ছ্রসাধন করে তা শুনে হেসে

বলে, কি বোকা! এসব করে কি লাভ হয় তোমাদের? আর উত্তরে কিছু বোঝাতে গেলেও এরা কিছুতেই বুঝবে না যে ত্যাগ করবার আনন্দ কতখানি!

চঞ্চল হেসে বললো, এই যেমন আমি কিছুতেই তোমাকে এদের কথা বোঝাতে পারছি না। কয়েক মিনিট কি ভেবে চঞ্চল আবার বললো, আমরা সকলেই জানি যে দুই দেশের নিয়ম-কানুন একটু আলাদা। কাজেই দুই দেশের ছেলে-মেয়েদের একরকম দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। আমাদের দেশের মেয়েরা বেশি ত্যাগ করে, স্মৃতির পূজা করে, বিধবারা নানা রকম কষ্ট সহ্য করে—সব কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তবু একথা না বলে থাকতে পারছি না যে আমাদের দেশের অনেকে, যা যা নিয়মকানুন তাদের ঘাড়ে চাপানো হয় তাতে হয়তো তাদের মনের সায় থাকে না কিন্তু উপায় নেই বলে সমাজের খাতিরে বাধ্য হয়ে মেনে নেয়। আমি সকলের কথা বলছি না। কিন্তু প্রেমের অনেক রূপ অমল। প্রেমের খাতিরে কেউ সংসার ছাড়ে, কেউ রাজা-রানী হয়, কেউ হাসিমুখে সারা জীবন দুঃখ ভোগ করে। যে বাঙালী বিধবাদের কথা তুললে, তুমি কি বলতে চাও তাদের মধ্যে অনেকে সত্যিই সাধ-আহ্লাদ বাদ দিয়ে কঠোর জীবন কাটাতে চায়? বোধ হয় না। কিন্তু তবু তারা কাটায় কারণ উপায় নেই। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই, শ্বশুরের ভিটে আর তুলসীতলা ছাড়া তারা আর কিছু জানে না। তুমি তাদের বিলেতে নিয়ে এসো, পৃথিবীর মিছিলে যোগ দেবার সুযোগ দাও, দেখো তারা এদেশের মেয়ে-দের মতো জীবনকে পুরোপুরি ভোগ করতে চায় কি না।

আস্তে অমল দত্ত বললো, চাইবে না।

নিশ্চয়ই চাইবে, জীবনকে অস্বীকার করবে কে? তাই আমার মনে হয় সে সুযোগ পেলে আজ আমাদের দেশের মেয়েদের রূপ অন্যরকম হতো। তুমি ভুল কোরো না, আমি সব মেয়ের কথা বলছি না, এদেশেও কি অনেক মেয়ে নেই যারা প্রথম প্রেম ব্যর্থ হয়েছে বলে সারাজীবন আর বিয়েই করলো না।

আছে। কিন্তু তাদের দেখে লোকে অবাক হয়ে বলে, ব্যতিক্রম। অথচ আমাদের দেশে অমন মেয়েদের দেখলে লোকে অবাক হয় না কারণ সেখানে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। আর তুমি এদেশের যে মেয়েদের কথা তুললে তারা লোকের চোখে কুমারী থাকলেও জীবন উপভোগ করতে ছাড়ে না। সেটা এদেশের নিয়ম। বলতে পারো দেহের ক্ষুধার জন্যে এমন হয় কিন্তু তাদের অতীত ম্লান হয়ে যায় না।

হ্যাঁ, তোমাকে তারা এসে সেকথা বলতে গেছে।

বলবার দরকার হয় না, এসব কথা সামান্য বুদ্ধি থাকলে বোঝা যায়। আরও একটা কথা অমল, এই যে এদেশের ডিভোর্স ইত্যাদি নিয়ে আমরা এদের ছোটো করি, আমার মনে হয় সেটা আমাদের অন্যায়; কেন না, সুযোগ এবং সামর্থ্য থাকলে আমরা সকলেই তা করতাম। বাংলা দেশের কজন বিবাহিত মেয়ে সুখী? সুখী এ পৃথিবীতে কেউই নয়। পাঁচজনের ভালোমন্দ আর সংসারের কল্যাণের কথা ভেবে তারা নিজেদের স্বার্থ, ক্ষুধা—এসব কথা ভুলে যায়। কেন না তাদের কাছে নিজেদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা বড়ো নয়।

চঞ্চল হেসে বললো, হয়তো তোমার কথা ঠিক। কিন্তু আমার মাঝে মাঝে একটু অন্য রকম মনে হয়। ব্যক্তিগত সুখদুঃখ শুধু বাংলাদেশের মেয়েদের কাছে কেন, অনেক মেয়ের কাছে বড়ো নয়। আর ঠিক তেমনি আমাদের দেশেও সব মেয়ে ঠিক সংসারের কল্যাণের কথা ভেবে নিজেদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ভোলে না। উপায় নেই বলে তারা ভুলতে বাধ্য হয়।

অমল দত্ত মাথা চুলকে জিজ্ঞাসা করলো, তার মানে?

মানে এই যে যদি উপায় থাকতো, যদি সমাজ এদেশের মতো সুবিধা তাদেরও দিতো, যদি সামর্থ্য থাকতো, তাহলে আর পাঁচজনের কল্যাণের কথা না ভেবে ঠিক এদেশের মেয়েদের মতো আমাদের দেশের মেয়েরাও শুধু নিজেদের কথা ভাবতো। যে মেয়েদের শিক্ষা আছে, সামর্থ্য আছে, আমাদের দেশে এর মধ্যেই তারা শুধু নিজেদের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছে সে খবর তুমি তো রাখো অমল।

কথা বলতে বলতে চঞ্চল অনেক চেষ্টা করলো অমলের সংকীর্ণ মত পরিবর্তন করতে। বারবার বোঝালো যে মানুষকে ছোটো করে দেখলে শুধু নিজের দৈন্যের পরিচয় দেওয়া হয়। মানুষের দোষগুণ ভালোমন্দ বিচার করতে হলে গভীর সমবেদনার প্রয়োজন। তা না হলে সঠিক রূপ প্রকাশ করা কোনোদিন সম্ভব নয়। এদেশের মানুষ শুধু ঘরের মানুষ নয়, বাইরের কাজও তাদের প্রচুর। তাই তাদের জীবনের পরিধি আমাদের চেয়ে বড়ো বলে মাঝে মাঝে জীবনধারাও জটিল হয়ে পড়ে। একথা এদেশের লোকেরা ভালো করেই জানে। আর জানে বলেই আজ তারা পদে পদে সতর্ক হয়ে চলে। তাই নানা গৃহের শান্তি বজায় রাখবার জন্যে নানা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ভাঙন কেউ চায় না, জটিলতা থেকে প্রত্যেক মানুষ মুক্ত হতে চায়। যখন জীবনের গতি দিনে দিনে দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে, পরিধি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে পড়ছে তখন ঘাত-প্রতিঘাতের নানা তরঙ্গ জীবনকে মাঝে মাঝে বিচলিত করবেই। সেই ভয়ে পরিধি ছোটো করলে চলবে না, সতর্ক হয়ে সমস্ত কিছু বাঁচাবার চেষ্টা করে উন্মুক্ত জীবনধারার সঙ্গে তাল রাখতেই হবে। যে রাখবে না সে পেছিয়ে থাকবে।

কিন্তু এতো কথা শোনবার মতো ধৈর্য অমল দত্তর নেই। আর শুনলেও এসব প্রলাপ নিয়ে মাথা ঘামাবার লোক সে নয়। সে যা বুঝেছে তাই ঠিক। অনঙ্গ দাশকে সে মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা না করতে পারে কিন্তু মনে মনে তার মতামতের যথেষ্ট মূল্য সে দিয়ে থাকে। তার অভিজ্ঞতা দু-একদিনের নয়, অনেক বছরের। তার কথা ফেলে দেওয়া চলে না।

এমন মতামত নিয়ে অমল দত্ত লণ্ডন শহরে ঘুরে বেড়ায়, ক্লাবে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে। মাঝে মাঝে তাদের নিয়ে বেড়াতেও যায়। কিন্তু আশ্চর্য দু-একদিনের বেশি তার সঙ্গে নাকি কোনো মেয়ে ঘুরতে চায় না।

না ঘুরুক। চঞ্চল যাই বলুক না কেন, এদেশে যে মেয়ের অভাব নেই সেকথা অমল দত্তর চেয়ে ভালো করে আর কে জানে। এই ক্লাবগুলো তো রয়েছে সেইজন্যেই। অনেকে নানা রকম মিথ্যা কথা বলে। ক্লাবে তারা নাকি যায়

বক্তৃতা শুনতে জ্ঞান বাড়াতে ইত্যাদি। ক্লাবে কেন লোকে যায় সেকথা জানতে তার বাকি নেই। ছেলেরা যায় মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে আর মেয়েরা যায় ছেলে যোগাড় করতে। এর প্রমাণ অমল দত্ত অনেকবার পেয়েছে। সে নিজে অনেকবার এমন আলাপ করেছে। অবশ্য ফল শেষ অবধি হয় নি কিছুই, মানে খাওয়া-দাওয়া বেড়ানো ইত্যাদি পয়সা খরচের কথা যখনই উঠেছে অমল দত্ত তখুনি সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে এবং শুধু এই কারণে পরপর অনেক মেয়ে তাকেও এড়িয়ে গেছে। এসব কথা বোঝবার মতো বুদ্ধি অমল দত্তর আছে। যতো বাজে কথা বলে চঞ্চল, সামান্য পয়সা খরচ করলেই এদেশে মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করা যায়। কিন্তু পয়সা খরচ করে কিছুই করতে চায় না অমল দত্ত। মাঝে মাঝে লণ্ডনের ক্লাবগুলির কথা মনে করে অমল দত্তর হাসি আসে। রাজ্যের মেয়ে জড়ো হয় সেখানে। জার্মানি পোল্যাণ্ড হল্যাণ্ড ডেনমার্ক নরওয়ে সুইডেন ফ্রান্স ইটালি—আরও কতো দেশের তার ঠিক নেই। কিন্তু তুলনায় এইসব ক্লাবে ছেলের সংখ্যা আরও বেশি। একটা মেয়েকে ঘিরে বসে থাকে চারটে সিলোনিজ, পাঁচটা নিগ্রো, গুটিকয় ইণ্ডিয়ান, আরও কতো জাত তার হিসেব রাখা কঠিন।

মাঝে মাঝে বিরক্তি লাগে অমল দত্তর। আর কাঁহাতক সেই, কোথা থেকে আসছো? কেমন আছো? কদিন আছো? কেমন লাগছে? সেই একঘেয়ে ভ্যানর ভ্যানর করে আলাপ জমানো যায়।

বলা বাহুল্য দেশের দুরবস্থার চাপে এরা জীবিকা অর্জনের জন্যে লণ্ডনে আসে। সাধারণত, ইংরেজ পরিবারে এইসব মেয়েরা ঘরের কাজ করে। যে সন্ধ্যায় এরা মাঝে মাঝে ছুটি পায় তখন ক্লাবে আসে।

কোনো মেয়ে ক্লাবের পর অমল দত্তর সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে হয়তো বলে, এখন কোথায় যাবে?

আমার বাড়ি যাবে? ভালো কারি-রাইস তোমায় খাওয়াবো?

একটু ঘাবড়ে গিয়ে মেয়ে বলে, না না, তার চেয়ে ওই রেস্তোরাঁয় চলো, কফি-টফি খাওয়া যাক।

রেস্তোর াঁয় যাবার নামে অমল দত্তর বুক শুকিয়ে যায়। পয়সা খরচের ব্যাপারে সে নেই। তাড়াতাড়ি বলে, অন্যদিন হবে, আজ আমার একটু কাজ আছে কি-না, সে আর দাঁড়ায় না।

এমনি আরও অনেকবার হয়। বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে কোনো মেয়ে কখনো বলে, আমার ক্ষিধে পেয়েছে, চলো একটু চা খাওয়া যাক—

অমল দত্ত চেষ্টা করে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে। যদি যায় তো খাওয়ায়, আর না যেতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে সরে পড়ে। রেস্তোর াঁয় মেয়ে নিয়ে সে কিছুতেই যাবে না। যদি কারুর চোখে পড়ে যায়, যদি হাইকমিশনারের কানে যায়? চরিত্র নিয়ে কানাঘুষো চললে কে জানে হয়তো অফিসে তার উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় হয়তো সে কোনো মেয়ের হাত ধরে রাস্তায় চলেছে এমন সময় দেখা গেলো দূরে ইণ্ডিয়া হাউসের কোনো অফিসার আসছে। ব্যাস আর কথা নেই, সঙ্গে সঙ্গে অমল দত্ত সেই মেয়ের হাত ছেড়ে অনেক দূরে সরে যায় আর এমন ভাব করে যেন তাকে চেনেই না।

অবাক হয়ে মেয়ে বলে, কি ব্যাপার, তুমি অমন করলে কেন?

আপিসের লোক দেখলাম কি-না।

তাতে কী হয়েছে?

হবে আবার কী, আপিসের কারুর সামনে আমি কোনো মেয়ের হাত ধরে বেড়াতে পারবো না।

কেন?

ওতে নাম খারাপ হয়।

বলো কি? এদেশে তো সকলেই অমন ঘুরে বেড়ায়।

যার যা খুশি করুক, আমি ওসব পারবো না। চরিত্রের জন্যে আপিসে উন্নতি হবে না—তখন কে দেখবে আমাকে? মেয়েমানুষের চেয়ে চাকরি আমার কাছে অনেক বড়ো।

রেগে মেয়ে বলে, তাহলে আমাদের সঙ্গে মেশো কেন?

আনন্দে সময় কাটাবার জন্যে।

তুমি একটি ছোটোলোক—

তাকে আর কথা বাড়াবার অবসর দেয় না অমল দত্ত। তাড়াতাড়ি বলে, এই যে আমার বাস এসে গেছে, আবার কবে দেখা হবে ?

আর দেখা হবে না।

আচ্ছা গুড বাই, লাফিয়ে অমল দত্ত বাসে চড়ে। আর একটু হলেই হয়েছিলো আর কি, তার বেশ কিছু পয়সা খরচ হয়ে যেতো। কেননা চা খাবার সময় হয়ে গেছে, আর একটু থাকলেই মেয়ে নিশ্চয়ই চা খেতে চাইতো।

যাদের উপর কোনো শ্রদ্ধা নেই, যাদের কোনোদিনও ভালোবাসা যাবে না, তাদের জন্য খরচ করা বোকামি। আর খরচ যদি করতেই হয় তাহলে ভালো ইংরেজ মেয়ের জন্যে না হয় তুচার পেন্স তেমন দরকার হলে খরচ করা যেতে পারে। হ্যাঁ অমল দত্ত একথা অবশ্য বুঝেছে যে ইংরেজ মেয়ে-বন্ধু পাওয়া একটু কঠিন। আর অনেক সময় তাদের জন্যে খরচ করবার দরকার হয় না, তারা নিজেদের খরচ নিজেই দেয়। কিন্তু কন্টিনেণ্টের উদ্‌বাস্তু মেয়েকে শুধু শুধু খাইয়ে অমল দত্ত পয়সা নষ্ট করতে চায় না। ওদের রাস্তায় নিয়ে বেরুতে তার মাঝে মাঝে লজ্জা করে, আজ তার সঙ্গে চলেছে, কাল যাবে সিলোনিজের সঙ্গে, পরশু নিগ্রো বন্ধুর সঙ্গে। ওসব নিগ্রো-সিলোনিজের সঙ্গে টেক্কা দিতে লজ্জা করে অমল দত্তর। শুধু শুধু নাম খারাপ করে লাভ কি! তার চেয়ে যদি একজন ইংরেজ বন্ধু পাওয়া যায় তাহলে আনন্দে সময় কাটে বটে। সে তুলনা করে দেখেছে যে কন্টিনেণ্টের মেয়েদের চেয়ে ইংরেজ মেয়ের খরচ অনেক কম। কারণ কন্টিনেণ্টের মেয়েরা ইংল্যাণ্ডের কিছুই দেখে নি, আলাপ হলেই তারা আব্দার ধরে, এখানে যাবো, সেখানে যাবো, ব্যালে দেখবো, অপেরা শুনবো—কিন্তু ইংরেজ মেয়ের আব্দার এদের চেয়ে অনেক কম। কাজেই তেমন একটি ভদ্র ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলে অমল দত্ত নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াতে পারে। পয়সা খরচের ভাবনায় তাহলে তাকে আর বিচলিত হতে হবে না। কিন্তু সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবে, তেমন মেয়ে কই, কেমন করে তার দেখা পাওয়া যায়।

কপাল ভালো ছিলো অমল দত্তর। একদিন সে দেখা পেলো, ঠিক যেমন চেয়েছিলো তেমন একজন ইংরেজ মেয়ের। ছোটোখাটো চেহারা, মিষ্টি-মিষ্টি মুখ, হরিণীর মতো চোখ। নাম সিলিয়া স্টাড। তার চেহারা দেখে আর দু-একটি কথা শুনে বোধ হয় জীবনে প্রথমবার অমল দত্ত মুগ্ধ হলো আর তার মনে হলো যে এমন মেয়ের জন্যে দু-চার পেন্স খরচ করা যেতে পারে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সিলিয়ার যথেষ্ট কৌতূহল। রবীন্দ্রনাথের নানা অনুবাদ সে পড়েছে এবং আরও পড়তে চায়।

কথায় কথায় সিলিয়া হেসে বললো, তোমার নামের সঙ্গে আমার কিন্তু অনেক আগেই পরিচয় হয়েছে।

অবাক হয়ে অমল দত্ত জিজ্ঞেস করলো, কেমন করে ?

'পোস্ট অফিস' বলে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক পড়েছিলাম, তার নায়কের নাম অমল।

সাহিত্য সম্পর্কে অমল দত্তর জ্ঞান বেশি নয়। পাছে আরও নানা কথা এসে পড়ে এবং তার বিদ্যেবুদ্ধি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে সে বললো, চলো একদিন তোমার মা-বাবার সঙ্গে আলাপ করে আসি ?

একটু ইতস্তত করলো সিলিয়া, বেশ।

সিলিয়া লেখাপড়া শিখেছে। এখন সে পুরোদস্তুর শিক্ষয়িত্রী। বয়স সবে তেইশ হয়েছে। তারা দুই বোন। সিলিয়া বড়ো। ছোটো বোনের নাম ডিয়াড্রি। উনিশ বছর বয়স হলেও কোনো সদাগরি আপিসে সে চাকরি করে।

সিলিয়ার বুদ্ধি আছে, নিজস্ব মতামত আছে। তাই মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে তার তর্ক-বিতর্ক হয়। সম্প্রতি এই তর্ক মাত্রা ছাড়িয়েছে কারণ সিলিয়া অমলকে একদিন বাড়িতে নিয়ে আসতে চায় কিন্তু তার বাবা মিঃ স্টাড কিছুতেই ভারতীয়র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে রাজী নন। মা এসব ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার। তিনি লেখাপড়া একেবারেই জানেন না। তাই মেয়েদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেও কোনো মতামত প্রকাশ করেন না।

তবে হ্যাঁ, মিঃ স্টাড যা বলেন মনে মনে তিনি তাই মেনে নেন। মেয়েদের আলাপ-আলোচনা তাঁর প্রলাপ বলে মনে হয়।

খাবার টেবিলে বাপের সঙ্গে সিলিয়া প্রায়ই তর্ক করে, অমলকে না দেখে তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার তোমার নেই বাবা।

হাতের কাঁটা-চামচ নামিয়ে রেখে গম্ভীর দৃষ্টিতে মেয়ের ঈষৎবিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মিঃ স্টাড বলেন, আমার মুখের ওপর এমন কথা বলা তোমার উচিত নয় সিলিয়া।

জানি, স্থির দৃষ্টিতে বাপের দিকে তাকিয়ে সিলিয়া যুক্তি দেখায়, কিন্তু তুমি অকারণে অন্যায় জেদ বজায় রাখতে চাইলে উচিত-অনুচিতের কথা আমাদের মনে থাকে না বাবা।

সিলিয়া! মিঃ স্টাডের দৃঢ়কণ্ঠস্বর শুনে মিসেস স্টাড চমকে উঠলেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সিলিয়া উত্তর দিলো, বলো!

হঠাৎ স্বর নেমে গেল মিঃ স্টাডের। শুধু একবার ঘাড় কুঁচকে তিনি বললেন, সিলিয়া তুমি ইংরেজ—

বাধা দিয়ে সিলিয়া বললো, হ্যাঁ কিন্তু টোরি নই, আমি সোস্যালিস্ট।

ড্যাম্ ইউর সোস্যালিজম্—

তুমি বৃথাই উত্তেজিত হচ্ছো বাবা, মুচকি হেসে সিলিয়া বললো, অকারণে হঠাৎ এত উত্তেজিত হওয়া ইংরেজের সাজে না।

মেয়ের কথা শুনে কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন মিঃ স্টাড। তাঁর মনে আঘাত লেগেছে। বোধহয় তিনি ভাবছিলেন এবার কী কথা বলে মেয়ের মুখ একেবারে বন্ধ করা যায়।

মিসেস স্টাড একটু ঘাবড়ে গেছেন। এসব অপ্রীতিকর ব্যাপার তাঁকে বড়ো বেশি পীড়া দেয়। সিলিয়া রাত করে ফিরলেই তিনি মনে মনে খুশী হন। খাবার টেবিলে এ দুজনের দেখা না হওয়াই ভালো। অবশ্য অন্য মেয়েকে নিয়ে তাঁর এতোটুকু ভাবনা নেই। বাপের সামনে ডিয়াড্রি মুখ খোলে না। মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে তর্ক করে বটে, কিন্তু বোঝালে বোঝে।

সকলের মুখের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে মিঃ স্টাড বললেন, শোনো সিলিয়া, তোমার মতামত যাই হোক না কেন, একথা তুমি ভোলো কেমন করে যে যারা রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি—সবকিছুতেই তোমার চেয়ে অনেক নিচে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে তোমার আত্মসম্মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

আমার আত্মসম্মান-বোধ একটু অন্যরকম বাবা। আর তুমি কাদের কথা বলছো জানি না, কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা, মানে আমি যাদের সঙ্গে সম্প্রতি ঘনিষ্ঠতা করেছি তারা, সবকিছুতে আমাদের চেয়ে নিচে তো নয়ই বরং,—একটু থেমে সিলিয়া স্থির দৃষ্টিতে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে ফস করে বলে ফেললো,—অনেক কিছুতে আমাদের চেয়ে অনেক ওপরে আর বোধহয় সেইজন্যে ইংরেজ আর কিছুতেই ইণ্ডিয়ানদের এঁটে উঠতে পারছে না।

ও হলো অক্ষমের আস্ফালন, দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা প্রভুর জাত, চিরকাল প্রভুই থাকবো।

কিছু মনে কোরো না বাবা, পৃথিবীর অবস্থা দেখে আমার তো সে কথা মনে হয় না।

কারণ তুমি ছেলেমানুষ। আর আজেবাজে লোকের সঙ্গে মিশে এখন তোমার মাথার ঠিক নেই।— ব্রিটিশকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি পৃথিবীতে নেই।

এখন পৃথিবীতে কেউ কাউকে দাবিয়ে রাখতে চায় না বাবা, যদি কেউ চায় তাহলে তার অবস্থা ঠিক ব্রিটিশের মতোই হবে।

সিলিয়া, গম্ভীরস্বরে মিঃ স্টাড বললেন, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান সামান্য, সে বিষয়ে কথা বলে তুমি আমাকে উত্তেজিত করে তুলো না।

জ্ঞান সংকীর্ণ হলেও আমি সব সময় যুক্তি দিয়ে কথা বলি বাবা।

আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না সিলিয়া।

সিলিয়া কি বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার একটা হাত ধরে বাধা দিয়ে মিসেস স্টাড বললেন, খাবার জুড়িয়ে গেলো, অনেক হয়েছে, আর নয়, এবার সকলে খেয়ে নাও।

একটা অব্যক্ত চাপা অশান্তি সব সময় সিলিয়ার মন ভরে রাখে। এ বাড়িতে তার যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় সে যদি লেখাপড়া না শিখে ডিয়াড্রির মতো কোনো সদাগরি আপিসে টাইপিস্টের কাজ করতো তাহলে অনায়াসেই অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পারতো—। এমন অশান্তি তাকে রাত্রিদিন পীড়া দিতো না।

সিলিয়াদের অবস্থা ভালো নয়। ইস্ট এণ্ডে থাকে না তারা। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ করবার মতো কিংবা লজ্জা পাবার মতো স্থূল বুদ্ধির মেয়ে সে নয়। তার প্রধান অশান্তি হলো তার বাবাকে নিয়ে। এই ভেবে সিলিয়া মনে মনে হাসে যে তিনি কিছুতেই নিজের দীন বংশের কথা ভুলতে পারেন না। তাই বারবার কথায় প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে ব্রিটিশ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাত। নিজের দেশের লোকের কাছে যখন তাঁর স্থান অনেক নিচে তখন বিদেশীর কাছে জোর করে বোঝাতেই হয় যে তাদের স্থান তাঁর চেয়ে অনেক নিচে।

সিলিয়ার ঠাকুরদা ছিলেন জাতকুলি। জাহাজে মাল তোলার কাজ ছিলো তাঁর। তাঁর বাবা অবশ্য তার চেয়ে অনেক উপরে উঠেছেন। তিনি রেলওয়ে স্টেশনের কেরানী। আর তাঁর যখন একটিও ছেলে নেই তখন তাঁর ইচ্ছে মেয়েরা যেন আরও অনেক ধাপ উপরের ছেলে খুঁজে নেয়। তাহলে তাঁর ভবিষ্যৎ বংশ সমাজের প্রথম শ্রেণীর লোক হয়ে উঠবে।

এই সব নিয়ে সিলিয়ার সঙ্গে মিঃ স্টাডের প্রায়ই তর্ক বাধে। এবং সম্প্রতি এমন অবস্থা হয়েছে যে মিঃ স্টাড সিলিয়ার কাছ থেকে যদিও বিশেষ কিছুই আশা করেন না কিন্তু তবু তিনি কিছুতেই ভাবতে পারেন না যে সিলিয়া তাঁর মর্যাদার কথা একেবারে না ভেবে কুলে কালি দেবে—মানে দিনের আলোয় একজন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে ঘুরে বেড়াবে।

তাই অমল দত্ত বারবার তার মা-বাবার আর বোনের সঙ্গে আলাপের ইচ্ছে প্রকাশ করলেও আসল বাধার কথা সহজে বলতে সিলিয়ার বেধে যায়। এ তার কাছে লজ্জার কথা, অশিক্ষার কথা। একথা অমল দত্তর কাছে কোন্ মুখে বলবে সে।

ওদিকে অমল দত্ত সিলিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে ভারি খুশী। তার বান্ধবীকে বেশ গর্বের সঙ্গে পাঁচজনকে দেখানো যায়। শিক্ষিত ইংরেজ, সুন্দর চেহারা। আর সবচেয়ে বড়ো কথা যে সিলিয়ার জন্যে তার একটি পয়সাও খরচ হয় না। বায়স্কোপে কিংবা রেস্তোরাঁয় খরচ দিতে চাইলেও সিলিয়া বাধা দিয়ে বলে, না তোমার খরচ যেমন তুমি দাও, আমার খরচ তেমনি আমি দেবো।

অমল দত্তর মুখ থেকে আশ্চর্য কথা বার হয়, কিন্তু তুমি যে আমাকে তোমার দুর্লভ সঙ্গ দিয়ে ধন্য করছো। সিলিয়া—তার দাম কে দেবে?

হেসে সিলিয়া বলে, তার দাম দেওয়া যায় না অমল, কাজেই ঋণ পরিশোধ করবার বৃথা চেষ্টা কোরো না।

সিলিয়ার ঋণ কি শোধ করা যায়? অমল দত্ত ভাবে তার ঋণ সত্যি অপরিশোধনীয়। সিলিয়া অমল দত্তর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে প্রায়ই ইণ্ডিয়া হাউসে আসে, ছুটির দিনে তার বাড়ি যায়, রান্না করে, বাসন ধোয় আর অমল দত্তর মনের নিভৃতে থেকে থেকে কী সুর বাজে যেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে চমকে ওঠে। তা কি করে সম্ভব? ও যে ইংরেজ। আজ অমল দত্তর সঙ্গে ওর যেমন গভীর ঘনিষ্ঠতা তেমন এর আগে কতো লোকের সঙ্গে হয়েছে ঠিক কি? কাজেই বিয়ের কথা ভাবতে অমল দত্তর বেধে যায়। যে মেয়ে অমল দত্তর বিচারে একেবারে খাঁটি নয় তাকে নিয়ে সারাজীবন সুখে ঘর করতে কিছুতেই পারবে না সে। তাই সে আলাপ-আলোচনায় নানা কৌশলে সিলিয়ার অতীতের কথা জেনে নিয়ে কর্তব্য ঠিক করে নিতে চায়।

তোমার মা-বাবা জানেন যে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে?

হ্যাঁ জানেন।

তুমি যে প্রায়ই এমনি করে আমার কাছে চলে আসো সে কথা তাঁরা জানেন?

না, সেকথা কেমন করে জানবেন, আমি তো তাঁদের জানিয়ে আসি না।

অমল দত্ত কী ভেবে বলে, আমাদের দেশে কিন্তু এমন হয় না, মা-বাবাকে না জানিয়ে তোমার বয়সী মেয়ে সাধারণত বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারে না।

গরিবের মেয়েরাও ?

তার মানে ?

মানে আমার বয়সী গরিব মেয়েরাও কি তোমাদের দেশে সব কথা মা-বাবাকে জানায় ?

হ্যাঁ জানায় বৈকি।

সিলিয়া বললো, আমরাও মাঝে মাঝে দরকার হলে জানাই।

অমল দত্ত বললো, কিন্তু তোমাদের দেশে না জানালেও ক্ষতি হয় না। সাবালিকা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। মেয়েদের বন্ধু-বান্ধবের ব্যাপারে মা-বাবা তো একেবারেই হস্তক্ষেপ করে না।

বড়োলোকেরা করে আর গরিবরাও উপায় থাকলে করে বৈকি।

অমল দত্ত বললো, সিলিয়া এ ব্যাপারে তুমি বারবার গরিব-বড়োলোকের কথা তুলছো কেন বুঝতে পারছি না।

হেসে সিলিয়া বললো, কারণ আছে। আমি ইচ্ছে করেই ও কথা বারবার তুলছি।

আমাকে বুঝিয়ে দাও।

সিলিয়া বললো, আমরা মানে গরিব মেয়েরা যখন নানারকম ছেলেদের বন্ধুত্ব করি তখন আপত্তি থাকলেও মা কিংবা বাবা আমাদের কিছুই বলতে পারেন না—কেন ?

বলছি। যারা বড়োলোক, তাদের বেলা এ প্রশ্ন ওঠে না কেননা বড়ো ঘরের মেয়েদের অভাব খুব বেশি অপূর্ণ থাকে না। বাপ-মা তাদের সমস্ত অভাব পূর্ণ করবার সুযোগ দেন। তাই তারা বুঝেশুনে ভেবেচিন্তে বন্ধু নির্বাচন করে এবং দুঃখিত হয়ো না অমল, তারা বিদেশীদের ইচ্ছে করে এড়িয়ে যায়। কিন্তু গরিব মেয়েদের অনেক সাধ অপূর্ণ থাকে, বাপ-মার সাধ্য নেই তাদের সাধ মেটাবার। যেমন ধরো, বায়স্কোপ, থিয়েটার, ব্যালে, অপেরা, শুধু তাই নয় কন্টিনেণ্টে কিংবা সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাওয়া—এতো সব সাধ তারা মেটাবে কেমন করে ?

কিন্তু কতো লোকের কতো সাধ অপূর্ণ থাকে, সামর্থ্য না থাকলে সব মেটাবার দরকার কি ?

সেকথা ও বয়সের সাধারণ মেয়েরা বোঝে না। আর সুযোগ যখন রয়েছে তখন তারা ক্ষুধা নিয়ে কাল কাটাবে কেন ? তাই হয় অসুবিধা। ইচ্ছে থাকলেও মা-বাবা মেয়েদের বাধা দিতে পারে না, দিলেও কেউ শুনবে না, যদি সাবালিকা হয় তাহলে তেমন গোলমাল হলে মেয়ে বাপ-মাকে ছেড়ে অন্য ফ্ল্যাটে চলে যাবে,—কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সিলিয়া আবার বললো, আমাদের অবস্থা এখন বড়ো খারাপ, অমল বাইরের সঙ্গে আমাদের যোগ দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে বলে নানা নতুন জিনিস দেখে লোভও বেড়ে যাচ্ছে আর নিজেদের সামর্থ্য নেই বলে পরের কাছে নিজের সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়ে বোকার মতো সে জিনিসের দিকে হাত বাড়াচ্ছি।

এতো কথা অমল বোঝে না। বুঝতে চায়ও না। ফ্যালফ্যাল করে সিলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললো, তোমার বোনকে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এসো—কেমন ?

এতোদিন পর সিলিয়া ফস করে সত্যি কথা বললো, সে কিছুতেই আসবে না, আমার বন্ধুবান্ধবকে সে মানুষ বলে ধরে না।

কেন ? কেন ?

কয়েক মিনিট চুপ করে রইলো সিলিয়া, আজ সব কথা তোমাকে বলি অমল, তুমি বুঝতে পেরেছো কিনা জানি না, আমার কাছে বিদ্যার মূল্য সবচেয়ে বেশি ; কিন্তু যার প্রচুর অর্থ নেই ডিয়াড্রির কাছে সে-মানুষের কোনো দাম নেই। তাই আমার সঙ্গে তার একেবারেই মেলে না। অবশ্য আমি এ জন্যে ডিয়াড্রিকে দোষ দিই না, দোষ দিই আমাদের বর্তমান সমাজকে। আমরা গরিব, আমাদের বংশতালিকা বড় মুখ করে সমাজে উল্লেখ করবার মতো নয়। তাই আমার মা-বাবা, আমার বোন সব সময় নিজের অবস্থা ভুলে সমাজের প্রথম শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে নির্লজ্জের মতো তাল রাখবার চেষ্টা করে। আমার এই ভেবে দুঃখ হয় যে তারা কিছুতেই বোঝে না সেই সব উন্নতনাসা

লোক তাদের কতোখানি কৃপার চোখে দেখে। তাই ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে শুনলে ডিয়াড্রি কৃপার হাসি হাসে, ভাবে আমি মূর্খ কিংবা অন্ত লোকের সঙ্গে মেশবার যোগ্য নই—

বাধা দিয়ে অমল দত্ত বললো, কিন্তু ইণ্ডিয়ানরাও তো পয়সাওয়ালা লোক হয়।

সে-কথা আমার মা-বাবা কিংবা ডিয়াড্রি কেউই বিশ্বাস করে না, ওদের ধারণা তোমাদের দেশ বড়ো গরিব, সেখানে লোকে নাকি না খেতে পেয়ে মরে।

অমল দত্ত একটু রেগে বললো, তবু তারা জানতে চেষ্টা করবে না আসল ভারতবর্ষ কেমন!

তাই তো তাদের ওপর আমার রাগ হয়। তারা মূর্খ ইংরেজের সঙ্গে মিশবে কিন্তু শিক্ষিত বিদেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চাইবে না। শুধু আমার মা-বাবাকে দোষ দিই কেন, এ গোঁড়ামি সমস্ত ইংরেজ জাতের।

সেদিন আর কথা বললো না অমল দত্ত। সে শুধু ভাবলো এতোক্ষণ শুধু বাজে কথা বলে কাটালো অথচ এখনো তার আসল কথাই জানা হলো না। অর্থাৎ সিলিয়ার অতীত প্রেমের কথা।

কিন্তু সেকথা জানতে তার খুব বেশি দেরি হলো না। প্রথমে অমন কৌতূহল প্রকাশ করতে তার বেধে গিয়েছিলো। কিন্তু কথায় কথায় একদিন হাল্কাভাবে সিলিয়া বললো সমস্ত কথা। খুব বেশি পুরুষের সঙ্গ জীবনে সে পায় নি—চায়ও নি। আর একজন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো তার দু বছর আগে। শুধু আলাপ নয়, সিলিয়া তাকে ভালোবেসেছিলো। বম্বের ছেলে সে, নাম রাজ। আজও সিলিয়া তাকে চিঠি লেখে, নিয়মিত উত্তর পায়। রাজ আজও বিয়ে করে নি। সিলিয়ার জন্যে নয়, হয়তো মনের মতো মেয়ে পায় নি বলে। কেননা আলাপের প্রথমেই তাদের বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিলো। রাজ বলেছিলো সিলিয়াকে বিয়ে করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় কেন না সে যে পরিবারে বাস করে সেখানে অসবর্ণ বিবাহ কেউ কল্পনা করতে পারে না। তবু সিলিয়া তার সঙ্গে মিশেছিলো কারণ রাজের মতো বুদ্ধিমান ছেলে সে খুব কম দেখেছে।

একথা শুনে অমল দত্তর বুকে যেন কঠিন আঘাত লাগলো। সিলিয়াকে নিয়ে মনে মনে এতোদিন ধরে সে যে স্বপ্ন দেখেছিলো তা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। সাধে সে চঞ্চলকে বলে যে সারা ইংল্যাণ্ড চষে বেড়ালেও একটি সতী মেয়ের দেখা মিলবে না। এদের বন্ধুত্বর অর্থ অমল দত্ত জানে। রাজের সঙ্গে সিলিয়ার সম্পর্ক সে সহজেই বুঝে নেয়।

না আর কোনোদিনও এদেশের কোনো মেয়েকে সে সত্যি ভালোবাসতে পারবে না। কিছুতেই শ্রদ্ধা করতে পারবে না। এরা সব সমান। অমল দত্তর মনের ভাব বুঝতে সিলিয়ার খুব বেশিদিন লাগলো না। একদিন ওদের দুজনের পরিষ্কার কথা হয়ে গেলো।

সিলিয়াকে সে বললো, যখন শুনলে রাজ তোমাকে বিয়ে করবে না, তুমি তার সঙ্গে স্ত্রীর মতো মিশলে কেন ?

একটুও লজ্জা না পেয়ে সিলিয়া বললো, আমি যে তাকে ভালোবেসেছিলাম।

আমি হলে রাজের মতো তোমার সর্বনাশ করতাম না।

ছি ছি, রাজের নিন্দে কোরো না, সে সত্যি রাজা।

কিন্তু একথা শুনে তোমার ওপর আমার আর শ্রদ্ধা নেই সিলিয়া।

অবাক হয়ে সিলিয়া জিজ্ঞেস করলো, কেন বলো তো ?

কি জানি, তোমাকে আমি এতো সুলভ ভাবতে পারি নি। তোমার মুখ দেখে ভেবেছিলাম তুমি পবিত্র, তুমি খাঁটি—

আমার তো নিজেকে সব সময় তাই মনে হয়। তুমি কেন শুধু শুধু আমাকে অপমান করছো ?

অপমান নয়, তোমাদের দেশের হালচাল আমি বুঝতে পারি না, আমার ভালো লাগে না। তোমরা বড়ো সহজে নিজেদের বিলিয়ে দাও—

আমাকে আর অপমান কোরো না অমল, তাকে হঠাৎ সিলিয়ার বড়ো অচেনা মনে হলো।

কিন্তু সেই শেষ। সিলিয়া আর আসে নি। অমল দত্ত জানতো সে আর আসবে না। না আসুক, গ্রাহ্য করে না। সিলিয়াকে একদিন সে সত্যি

শ্রদ্ধা করেছিলো তাই আজ তাকে অন্য চোখে দেখে তার সঙ্গে অন্যভাবে মিশতে অমল দত্তর ভালো লাগলো না।

এদেশের আর কোনো মেয়েকে গভীরভাবে সে গ্রহণ করতে পারবে না। তাই কারুর সন্ধানে আর থাকবে না সে। যদি মাততেই হয়, দুদিনের জন্যে মেতে উঠবে। খেলা করবে, ভোগ করবে, বিদায় করে দেবে।

অমল দত্ত পুরোদমে অফিস করে আর ছুটির পর ক্লাবে যায়। বক্তৃতা কখনও শোনে না সে। সুযোগ বুঝে জার্মান ফরাসী সুইস ইটালির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে, তাদের দেশের গুণ গায়। তারপর সুবিধা হলে দুদিনের খেলা খেলে। ক্লান্তি আর আসে না অমল দত্তর। বয়স যেন দিনের পর দিন কমে যায়।

উইক এণ্ড

সেপ্টেম্বরের শেষ। ভরা হেমন্ত এসে গেছে যেন। কুয়াশা-ছাওয়া সকালে পথে পথে রাত্রের ঝরে-পড়া শিশির জমে থাকে। পাখি নেই, পাতা নেই, ফুল নেই। কঠিন শীতের আশঙ্কায় গুম হয়ে গেছে শহর।

লণ্ডনে গ্রীষ্মের সপ্তাহ-শেষ ব্যর্থ বয়ে যেতে দেয় না কেউ। শনিবার কারখানা বন্ধ, অনেক ছাত্রছাত্রীর ক্লাসও ছুটি, কতো আপিসের দরজা বন্ধ। যাদের শনিবার ছুটি নেই, তারা ঘড়ির দিকে চেয়ে মিনিট গোনে—কখন একটা বাজবে। কেউ কেউ ছুটি হবার অনেক আগেই বিদায় নিয়ে চলে যায়। যাবার কতো যে জায়গা আছে লণ্ডন শহরে! যারা দূরে যেতে পারলো না তারা হাল্কা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে পার্কে শুয়ে পড়লো, কেউ নৌকো বাইলো, কেউ খাবারের ঠোঙা হাতে সারাদিন ঘুরে বেড়ালো পথে পথে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হলে পরিপূর্ণ মন নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। আয়োজন সামান্য, অর্থব্যয় নেই, তবু গ্রীষ্মের সপ্তাহ-শেষ ইংরেজকে যেন শোনায় উজ্জীবনের গান। কিন্তু এ হলো গ্রীষ্মকালের কথা। আসন্ন শীতের সময় বাইরে বেরুবার কথা ভাবলে শরীরে শিহরণ জাগে। ভিজে ঘাস, ঠাণ্ডা হাওয়া, রোদ নেই। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এখন লণ্ডনবাসী বিচ্ছিন্ন। নিরাভরণ প্রকৃতি যেন সদ্যবিধবার মতো একটানা বিষণ্ণ সুর বাজায়। তাই ছায়াচিত্র-প্রেক্ষাগারে ভিড় জমে, মদের দোকানে কোলাহল জাগে, নানা প্রদর্শনীর দরজায় নরনারীর ঘন ঘন যাতায়াত শুরু হয় আর সন্ধ্যায় নাচঘরের উজ্জ্বল আলো পড়ে কতো অসংখ্য মানুষের চোখে-মুখে। বাহির বিমুখ করেছে বলে ভিতরে অনেক বেশি দরজা খোলা হয়েছে। তাই নিয়ে শীতের সপ্তাহ-শেষে মেতে ওঠে আপামর জনসাধারণ। কী নেই তা ভেবে শোক করে না কেউ, যা আছে তা থেকে সাজাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে পরিপূর্ণতার ডালি।

অনেকক্ষণ সকাল হয়েছে। প্রায় আটটা বাজে। কয়েক মিনিট আগে চঞ্চলের ঘুম ভেঙেছে। মারিয়া রোজ তার ঘুম ভাঙবার অনেক আগে বিছানা ছেড়ে যায়। ব্রেকফাস্ট তৈরি করে যথাসময়ে স্বামীকে জাগায়। চঞ্চল অনেকবার আপত্তি করে বলেছে, কেন তুমি আমাকে ডাকো না মারিয়া, আমি তাহলে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

কোনো দরকার নেই, এসব তোমার কাজ নয়। যদি সকালে উঠে লিখতে চাও তাহলে আমি তোমাকে ডেকে দেবো।

আর কিছুদিন যাক, চঞ্চল মারিয়ার কোলে মাথা রেখে উত্তর দেয়, তুমি দেখো আমি সারাদিন লিখবো।

মারিয়া হেসে বললো, সত্যি বলছি চঞ্চল তাহলে আমার জীবন ধন্য হবে। একটু থেমে সে আবার বললো, তুমি বড়ো হও, পৃথিবীসুদ্ধ লোক তোমার নাম জানুক—আমি তো শুধু তাই চাই চঞ্চল।

এ ছাড়া তুমি কি আর কিছুই চাও না মারিয়া ?

না, আর কী আমার কাম্য থাকতে পারে বলো ? শুধু তোমার যশ, তোমার সুখ, তোমার কল্যাণ—

বাধা দিয়ে চঞ্চল বললো, আর তোমার নিজের কথা ?

মারিয়া হেসে বললো, সে ভাবনা তোমার।

আগামী সোমবার চঞ্চলের ছুটি ফুরিয়ে যাবে। শিগগির আর ছুটি পাবার সম্ভাবনা নেই। তাই ওরা ঠিক করেছিলো আজ সকাল সকাল দূরে কোথাও বেরিয়ে পড়বে। বাড়িতে রান্না করবে না আজ। বেড়াতে বেড়াতে যদি ক্ষিদে পায় তাহলে কাছাকাছি কোনো রেঁস্তোরায় যা হয় কিছু খেয়ে নেবে। মারিয়া তাই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নেবার চেষ্টা করছিলো।

রোদ ওঠে নি। যেন শিশিরে-ভেজা ম্লান আলো পড়েছে জানালায়। বিছানায় শুয়ে চঞ্চল শুনতে পাচ্ছে বেকন্ ভাজার ছ্যাকছ্যাক শব্দ। রাস্তায় পথিকের ভারি জুতোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কটা বাজলো কে জানে।

চঞ্চল, মারিয়ার স্বর ভেসে এলো, উঠে পড়ো, ব্রেকফাস্ট রেডি। শিগগির, না হলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

এখানে দিয়ে যাও লক্ষীটি—

কিছুতেই না, রোজ রোজ বাসি মুখে খাওয়া চলবে না বলে দিলাম, মারিয়া চঞ্চলের বিছনার কাছে এসে বললো, নাও উঠে পড়ো, বেড়াতে যাবে না ?

ঘুম ভাঙার প্রথম আলস্য ঝেড়ে চঞ্চল কী যেন বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু মারিয়ার সেকথা আর শোনা হলো না। কলিং বেল বেজেছে। সে দরজা খুলতে চলে গেলো। এ সময় এমন করে পোস্টম্যান ঘণ্টা বাজায়। সে দাঁড়ায় না, চিঠি ফেলে জানিয়ে দিয়ে যায়।

একটু পরে মারিয়া হাতে চিঠি নিয়ে ফিরে এলো। একটা চিঠি তার নিজের, পিসি লিখেছে। সে চিঠি মারিয়া এর মধ্যেই খুলে পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। আর একটা চিঠি চঞ্চলের। ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। মারিয়া আন্দাজ করলো, এ চিঠি চঞ্চলের বাবার লেখা। চঞ্চলের দিকে এগিয়ে দিলো সে-চিঠি।

পিসির চিঠি পড়ে মারিয়া কিছু বুঝতে পারলো না। শুধু কয়েক লাইন মাত্র পিসি লিখেছেন। ছোটো চিঠি। লিখেছেন, তুমি বিয়ে করেছো জেনে খুশী হলাম। চঞ্চলকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করছে। আশা করি তোমরা ভালো আছো। সুখী হও।

চিঠি পড়ে মারিয়া অবাক হয়ে গেলো। এ কেমন চিঠি। সত্যিই কি পিসি খুশী হয়েছেন ? তাই যদি হবে তাহলে চঞ্চলের কথা আরও বেশি করে জানতে চাইলেন না কেন ? আর নিজের সম্বন্ধেও তো কতো কথা জানাবার ছিলো পিসির। পিসির সঙ্গে মুখোমুখি কথা না হলে মারিয়া ঠিক বুঝতে পারবে না যে তিনি আসলে তার বিয়ের ব্যাপার কিভাবে নিয়েছেন।

ওদিকে চিঠি পড়তে পড়তে চঞ্চল খাটের উপর উঠে বসলো। বলা বাহুল্য সে-চিঠি বাবার লেখা। তিনি ইংরাজিতে লিখেছেন, তোমার বয়স হয়েছে, যা ভালো বুঝেছো করেছো। নিজের ভালোমন্দ যখন নিজেই

অনেকক্ষণ সকাল হয়েছে। প্রায় আটটা বাজে। কয়েক মিনিট আগে চঞ্চলের ঘুম ভেঙেছে। মারিয়া রোজ তার ঘুম ভাঙবার অনেক আগে বিছানা ছেড়ে যায়। ব্রেকফাস্ট তৈরি করে যথাসময়ে স্বামীকে জাগায়। চঞ্চল অনেকবার আপত্তি করে বলেছে, কেন তুমি আমাকে ডাকো না মারিয়া, আমি তাহলে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

কোনো দরকার নেই, এসব তোমার কাজ নয়। যদি সকালে উঠে লিখতে চাও তাহলে আমি তোমাকে ডেকে দেবো।

আর কিছুদিন যাক, চঞ্চল মারিয়ার কোলে মাথা রেখে উত্তর দেয়, তুমি দেখো আমি সারাদিন লিখবো।

মারিয়া হেসে বললো, সত্যি বলছি চঞ্চল তাহলে আমার জীবন ধন্য হবে। একটু থেমে সে আবার বললো, তুমি বড়ো হও, পৃথিবীসুদ্ধ লোক তোমার নাম জানুক—আমি তো শুধু তাই চাই চঞ্চল।

এ ছাড়া তুমি কি আর কিছুই চাও না মারিয়া?

না, আর কী আমার কাম্য থাকতে পারে বলো? শুধু তোমার যশ, তোমার সুখ, তোমার কল্যাণ—

বাধা দিয়ে চঞ্চল বললো, আর তোমার নিজের কথা?

মারিয়া হেসে বললো, সে ভাবনা তোমার।

আগামী সোমবার চঞ্চলের ছুটি ফুরিয়ে যাবে। শিগগির আর ছুটি পাবার সম্ভাবনা নেই। তাই ওরা ঠিক করেছিলো আজ সকাল সকাল দূরে কোথাও বেরিয়ে পড়বে। বাড়িতে রান্না করবে না আজ। বেড়াতে বেড়াতে যদি ক্ষিদে পায় তাহলে কাছাকাছি কোনো রেঁস্তোরায় যা হয় কিছু খেয়ে নেবে। মারিয়া তাই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নেবার চেষ্টা করছিলো।

রোদ ওঠে নি। যেন শিশিরে-ভেজা ম্লান আলো পড়েছে জানালায়। বিছানায় শুয়ে চঞ্চল শুনতে পাচ্ছে বেকন্ ভাজার ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দ। রাস্তায় পথিকের ভারি জুতোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কটা বাজলো কে জানে।

চঞ্চল, মারিয়ার স্বর ভেসে এলো, উঠে পড়ো, ব্রেকফাস্ট রেডি। শিগগির, না হলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

এখানে দিয়ে যাও লক্ষীটি—

কিছুতেই না, রোজ রোজ বাসি মুখে খাওয়া চলবে না বলে দিলাম, মারিয়া চঞ্চলের বিছনার কাছে এসে বললো, নাও উঠে পড়ো, বেড়াতে যাবে না ?

ঘুম ভাঙার প্রথম আলস্য ঝেড়ে চঞ্চল কী যেন বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু মারিয়ার সেকথা আর শোনা হলো না। কলিং বেল বেজেছে। সে দরজা খুলতে চলে গেলো। এ সময় এমন করে পোস্টম্যান ঘণ্টা বাজায়। সে দাঁড়ায় না, চিঠি ফেলে জানিয়ে দিয়ে যায়।

একটু পরে মারিয়া হাতে চিঠি নিয়ে ফিরে এলো। একটা চিঠি তার নিজের, পিসি লিখেছে। সে চিঠি মারিয়া এর মধ্যেই খুলে পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। আর একটা চিঠি চঞ্চলের। ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। মারিয়া আন্দাজ করলো, এ চিঠি চঞ্চলের বাবার লেখা। চঞ্চলের দিকে এগিয়ে দিলো সে-চিঠি।

পিসির চিঠি পড়ে মারিয়া কিছু বুঝতে পারলো না। শুধু কয়েক লাইন মাত্র পিসি লিখেছেন। ছোটো চিঠি। লিখেছেন, তুমি বিয়ে করেছো জেনে খুশী হলাম। চঞ্চলকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করছে। আশা করি তোমরা ভালো আছো। সুখী হও।

চিঠি পড়ে মারিয়া অবাক হয়ে গেলো। এ কেমন চিঠি। সত্যিই কি পিসি খুশী হয়েছেন ? তাই যদি হবে তাহলে চঞ্চলের কথা আরও বেশি করে জানতে চাইলেন না কেন ? আর নিজের সম্বন্ধেও তো কতো কথা জানাবার ছিলো পিসির। পিসির সঙ্গে মুখোমুখি কথা না হলে মারিয়া ঠিক বুঝতে পারবে না যে তিনি আসলে তার বিয়ের ব্যাপার কিভাবে নিয়েছেন।

ওদিকে চিঠি পড়তে পড়তে চঞ্চল খাটের উপর উঠে বসলো। বলা বাহুল্য সে-চিঠি বাবার লেখা। তিনি ইংরাজিতে লিখেছেন, তোমার বয়স হয়েছে, যা ভালো বুঝেছো করেছো। নিজের ভালোমন্দ যখন নিজেই

বোঝো তখন নিজেদের খরচপত্রও নিশ্চয় নিজেরা চালাতে পারবে। না পারলেও সে বিষয়ে আমার কোনো দায়িত্ব নেই। আমি তোমাকে লেখাপড়া করবার জন্য বিলেত পাঠিয়েছিলাম, বিয়ে করবার জন্যে নয়। তুমি আমার বিনা অনুমতিতে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করেছো; আর কারুর কথা, বংশ-গৌরবের কথা ভেবে দেখা প্রয়োজন মনে করো নি। কাজেই আমি মনে করবো তুমি মরে গেছো। তোমার মতো ছেলেকে নিজের কাছে বাঁচিয়ে রাখতে আমার লজ্জা করে। তুমি কোনোদিন আমার কাছে ফিরে এসো না। আমি তোমাকে আর কোনোদিন কোনো কারণেই দেখতে চাইবো না। আশা করি সুখী হবে।

চিঠি শেষ করে চঞ্চল কয়েক মুহূর্ত শূন্য দৃষ্টিতে উপরে তাকিয়ে রইলো। তার মুখ দেখে মনে হলো সে যেন তার বর্তমান অবস্থার কথা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছে। যদিও তার বাবার কাছ থেকে এমন চিঠি পাবার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে ছিলো তবু মনের কোনায় কোথায় যেন ক্ষীণ আশা ছিলো হয়তো তার বাবা শেষ অবধি আশীর্বাদ করে তাদের মঙ্গল কামনা করতে পারেন।

কী খবর চঞ্চল ?

বাবার চিঠি ইংরেজিতে লেখা, পড়ে দেখো।

হাত বাড়িয়ে মারিয়া বললো, বুঝতে পেরেছি। আমাকে পিসি লিখেছে, এও ইংরেজিতে লেখা। তুমি নাও।

মারিয়ার হাত থেকে চিঠি নিলেও ঠিক তখুনি কোনো কিছু পড়বার আগ্রহ চঞ্চলের ছিলো না। সে ভাবছিলো তার বাবার কথা। না, আর কোনো আশা নেই। তাঁর পায়ে পড়ে হাজার মাথা খুঁড়লেও তিনি আর কোনোদিন কিছুতেই চঞ্চলকে নিজের ছেলে বলে স্বীকার করবেন না।

চঞ্চলের বাবার লেখা চিঠি শেষ করে টেবিলের উপর রেখে মারিয়া জিজ্ঞেস করলো, কী ভাবছো চঞ্চল ?

কিছু না—মানে বাবার চিঠির কথা আর কি, প্রায় একনিশ্বাসে মারিয়ার

পিসির চিঠি শেষ করে চঞ্চল বললো, বাঃ, পিসি তো ভালো চিঠি লিখেছেন।

ঠিক বুঝতে পারছি না, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো মারিয়া, কিন্তু ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমরা কোনো অন্যায় করি নি, ভুলও করি নি, যা সত্য বলে জেনেছি শুধু তাই পৃথিবীর সামনে স্বীকার করে নিয়েছি—

ঠিক তাই মারিয়া। আমি সব সময় সেকথা ভাবি।

কিন্তু একটু থেমে মারিয়া বললো, তোমার বাবার চিঠি পড়ে তুমি বেশ বিচলিত হয়েছো মনে হচ্ছে।

না বিচলিত হই নি, বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চঞ্চল বললো, একটু আঘাত পেয়েছি। আমি ভাবতে পারছি না এই সামান্য কারণে বাবা কেমন করে নিজের ছেলেকে ত্যাগ করতে পারেন। বাপ-ছেলের সম্পর্ক কি এতোই ঠুনকো ?

দম্ভে আঘাত লাগলে ঠুনকো হয়ে যায় চঞ্চল কিন্তু সেকথা ভেবে আমাদের লাভ নেই, আমরা তো সকলের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হবে বলে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম তবে আর বুক বাড়িয়ে আঘাত খাচ্ছো কেন ? এখন তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও, খাবার জুড়িয়ে গেলো যে—

আমি দু মিনিটে তৈরী হয়ে নিচ্ছি, ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়বো কিন্তু মনে আছে তো ? আমার ছুটি ফুরিয়ে এলো—

মারিয়া উত্তর না দিয়ে টেবিল সাজাতে লাগলো। সে চঞ্চলের বাবার চিঠি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য ঠিক করে নিয়েছে। আজ আর বেড়াতে যাওয়া হবে না। মারিয়া যাবে ক্রিস্ট্যাল প্যালেসে। সেখানে গিয়ে সে দেখা করবে তার স্কুলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। প্রিন্সিপ্যালের নাম মিস ডিকিনসন। পঁয়ষট্টি বছরের থরথরে বুড়ি। মারিয়াকে ভালোবাসে খুব।

মারিয়ার আসল উদ্দেশ্য হলো মিস ডিকিনসনের সঙ্গে দেখা করে আবার তিন বছরের জন্যে তার স্কুলে চাকরির মেয়াদ বাড়াবার প্রাণপণে চেষ্টা করবে। তিন বছরের চুক্তিতে তাকে এই চাকরি দিয়ে ফ্রান্স থেকে আনা হয়েছিলো।

তার বিয়ের ঠিক আগে চুক্তি পূর্ণ হয়। মারিয়াকে তখন কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করে যে আবার তিন বছরের জন্যে সে চাকরি নিক। কিন্তু চঞ্চল আপত্তি করে বলে, কী দরকার? মাস্টারি করে জীবনের সোনার মুহূর্তগুলি নষ্ট কোরো না। অতএব দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙো। মারিয়ার দিক থেকেও চাকরি করবার আর বিশেষ আগ্রহ ছিলো না। সংসারের কাজে মনপ্রাণ সমর্পণ করে শুধু স্বামীর দেখাশোনা করবাব জন্যে সে উন্মুখ হয়ে ছিলো, তাই আর নতুন করে শিক্ষকতার চুক্তি সে করলো না।

কিন্তু আজ এই হিমছড়ানো হেমন্তের সকালে সহসা মুহূর্তের জন্যে তার কানে যেন একটা বিষণ্ণ সুর বাজলো। সে জানতো, সে বুঝেছিলো যে আর্থিক অনটন যে কোনো ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে সমস্ত সংসার আচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। সতর্ক হয়ে থাকার কথা মারিয়ার, চঞ্চলের নয়। চঞ্চল পৃথিবীতে এসেছে বড়ো কাজ করবার জন্যে, ছোটো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে নিজেকে বিব্রত করে তুলতে নয়। না, মারিয়া কোনোদিনও দারিদ্র্যের আঁচ তার গায়ে লাগতে দেবে না। তাকে শক্তি দেবে, সাহস দেবে, যতোদিন বেঁচে থাকবে ততোদিন দেহমনপ্রাণ দিয়ে তাকে যোগাবে সৃষ্টি করবার ইন্ধন। সমস্ত জেনে-শুনে প্রস্তুত হয়ে সে চঞ্চলকে বিয়ে করেছে। যদি নব অনুপ্রেরণায় চঞ্চলকে সে মাতিয়ে তুলতে না পারে তাহলে ব্যর্থ হবে তার জীবন। আজ লেখক বলে, স্রষ্টা বলে চঞ্চলের নাম কেউ জানে না। বোধ হয় মরিয়া পৃথিবীর একমাত্র মানুষ যে তাকে চিনতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে, সন্ধান পেয়েছে তার অন্তরের নিভৃততম কোণের মণিকণিকার। মারিয়া জেনেছে যে তার স্বামী রাজা। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী সে। এমন এক সাম্রাজ্য, যার আদিও নেই অন্তও নেই। এতো বড়ো মন মারিয়া আজ অবধি কোনো মানুষের দেখে নি। সে জানে কী বিপুল রত্নসম্ভারে ভরে আছে তার মন! সেই রত্ন একটি একটি করে বের করে তুলে ধরতে হবে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের সামনে। মাঝে মাঝে মারিয়ার এই ভেবে দুঃখ হয় যে কেন তার বাবা ছেলের মনের খবর পান নি। হয়তো সামান্য চেষ্টা করলে তিনি বুঝতে পারতেন যে চঞ্চল তাঁর মুখ উজ্জ্বল করবে,

মুক্ত স্বাধীন চিন্তায় পাতার পর পাতা ভরে তুলে দেশ-বিদেশে পরিচিত করবে তাঁর বংশের নাম। যাক তার জন্যে ভেবে লাভ নেই। মারিয়া ভাবে পৃথিবীতে প্রত্যেক মহৎ মানুষ এমনি করেই সাধনার কণ্টকাকীর্ণ পথ বেয়ে চলে। আর কেউ না জানুক, সে নিজে তো জেনেছে চঞ্চলকে। এতো বড়ো মনের মানুষ তার মতো কজন মেয়েই বা পায়। নিজেকে ধন্য মনে হলো মারিয়ার। তার আর কোনো কাজ নেই। দিনে দিনে সে দেখবে প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে সে বললো, আজ আমার বেড়াতে যাওয়া হবে না চঞ্চল।

কেন? অবাক হয়ে চঞ্চল বললো, শরীর খারাপ হয়ে পড়লো নাকি?

না না, মারিয়া হেসে বললো, বেড়াবার জন্যে অনেক সময় পড়ে আছে, আজ ভাবছি একটা দরকারী কাজ সেরে আসবো।

দরকারী কাজ, কী কাজ তোমার মারিয়া?

মারিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর চঞ্চলের রুটিতে মার্মালেড মাখাতে মাখাতে বললো, চাকরিটা আবার নেবো ভাবছি।

কোন্ চাকরি? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

অতো কথা বুঝে দরকার নেই তোমার। কিন্তু লক্ষ্মীটি অমত কোরো না। এ বছর থেকে আমি ওই ইস্কুলে আরও তিন বছরের জন্য ফরাসী শেখাবার কাজটা নিয়ে নি? এমনিতেই বড়ো দেরি হয়ে গেছে, আরও আগে থেকে চেষ্টা করা উচিত ছিলো।

খুব জোরে হেসে উঠলো চঞ্চল, বাবার চিঠি পড়ে তুমি রীতিমতো ঘাবড়ে গেছো দেখছি?

না, সে তো আমরা জানতাম। চাকরি না করলে তোমার বড়ো কষ্ট হবে—

বাধা দিয়ে চঞ্চল বললো, কিসের কষ্ট?

অর্থাভাবের। বাড়ি থেকে আর কোনো টাকাই পাবে না, আর ইণ্ডিয়া হাউস থেকে তুমি তো খুব বেশি কিছু পাও না—

ও যা পাই তাই যথেষ্ট, ওতেই খুব চলে যাবে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না,

আমি সিগ্রেট ছেড়ে খরচ কমিয়ে দেবো। তোমার চাকরি করা কিছুতেই হবে না।

কেন? ছেলেমানুষের মতো কথা বোলো না চঞ্চল। আমি চাই না সংসারের কোনো কিছু নিয়ে তুমি বিব্রত হও কিংবা মাথা ঘামাও। সে ভার আমার। তোমার একমাত্র কাজ লেখা, তুমি শুধু লিখে যাও।

তা তো যাবো কিন্তু তুমি হঠাৎ চাকরি করবার জন্যে আবার নতুন করে জেদ ধরলে কেন?

মারিয়া হেসে বললো, তোমার অসুবিধার কথা ভাবছি বলে নয়, আমি চাকরি না করলে আমার পক্ষে সংসার চালাতে কষ্ট হবে বলে। অর্থের জন্যে তোমাকে এতোটুকু অসুবিধে আমি কিছুতেই ভোগ করতে দেবো না চঞ্চল। আর তুমি আপিসে বেরিয়ে গেলে আমার আর কাজ কি বলো? সারাদিন বাড়ি বসে সময় নষ্ট করে কি লাভ? সপ্তাহে মাত্র চারদিন দুঘণ্টা করে আমায় ক্লাস নিতে হয়। কিছুই পরিশ্রম নয় অথচ সহজে টাকা রোজগার করা যায়।

কিন্তু তুমি চাকরি করবে একথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না মারিয়া। আমার সাহিত্যের দেবীকে আমি হাটের মাঝে নামিয়ে আনবো কেমন করে?

কী বলছো চঞ্চল? আমার দিকে অতো বেশি মন দিলে সত্যি বলছি আমি একদিন ভোরবেলা উঠে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো। বিয়ের পর তো এক লাইনও লিখতে দেখলাম না।

এখন ভাবছি। জীবনদর্শন আর একটু স্পষ্ট হলেই নতুন লেখা শুরু করবো।

কিন্তু যখন লিখতে ইচ্ছে করে না তখন পড়লে তো পারো। লেখা কিংবা পড়া ছাড়া আর কোনো কাজ কিংবা কোনো মানুষ নিয়ে ব্যস্ত হলে তোমার দ্বারা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না জানো? আমার প্রতিও তোমার আকর্ষণ অনেক কমাতে হবে।

দিন দিন তো বেড়ে যাচ্ছে।

তাই লিখতে পারছো না। তোমাকে আমি উপদেশ দিতে চাই না কিন্তু বড়ো লেখক হতে হলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যে ভুললে চলবে না

যে তুমি লেখক। পৃথিবীর সকলের সুখদুঃখ গভীর দরদ দিয়ে তোমাকে অনুভব করতে হবে। পৃথিবীর কেউ তোমার নয় কিন্তু তুমি সমস্ত পৃথিবীর। একজন বিশেষ মানুষ যদি তোমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে তাহলে তোমার দৃষ্টি কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে চঞ্চল।

তুমি তো আমাকে আচ্ছন্ন করো নি মারিয়া, আমার হাত ধরে এক সঙ্গে চলবার জন্যে এগিয়ে এসেছো।

তাহলে কেন তুমি আমার চাকরি করার কথায় ছেলেমানুষের মতো আপত্তি করছো?

তুমি পয়সার জন্যে চাকরি করবে এই কথা মনে করে আমার নিজেকে বড়ো দীন আর অক্ষম মনে হচ্ছে।

ছি ছি চঞ্চল, সাধারণ মানুষের মতো এ তোমার অলীক দম্ভ। এর কোনো মানে নেই, কোনো মূল্য নেই। ছোটো ব্যাপারকে বড়ো করে দেখে তুমি শুধু নিজেকে ছোটো করছো। তোমার কাছ থেকে এমন কথা আমি আশা করি নি। দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে মারিয়া আবার বললো, আমি চাকরি করি কি না করি, সংসারে কী লাভ হলো আর কী লোকসান হলো এসব দিকে তোমার চোখ যেন কখনও না থাকে। ছোটো ঘরে থাকলেও রাজার মতো মন নিয়ে তোমাকে বৃহত্তর জীবনের ছবি ফোটাতে হবে। নিজেকে বিস্মৃত হতে হবে চঞ্চল, আত্মঘোষণার পালা শেষ করতে হবে। স্ত্রী মাস্টারি করছে বলে নিজের মনকে গুটিয়ে নেয়া তোমার সাজে না।

কিন্তু তুমি যে টাকার জন্যে চাকরি করতে যাচ্ছো সেকথা তো ঠিক।

হ্যাঁ ঠিক। কিন্তু উপায় কি! উপায় নেই বলে এখন চাকরি করতে চাইছি, পরে তোমার মাইনে বাড়লে কিংবা বই লিখে টাকা পেলে নিশ্চয় আমি চাকরি করে সময় নষ্ট করবো না।

যদি কোনোদিনও আমার টাকা না হয়—যদি চিরকাল অমনি অবস্থা থাকে—যদি জীবনে আরও খারাপ সময় আসে?

দুঃসময় আসবে সেকথা এখন ভাববো না। কারণ এখন আমাদের যৌবন আছে, যার তেজে নিকষ কালো অন্ধকারেও আলো জ্বালানো যায়। যখন যৌবন থাকবে না তখন কী হবে জানি না, সত্যি কথা বলছি, চঞ্চল, আমার মনে হয় চিরকাল তোমার যৌবন থাকবে আর তোমার পাশে থাকবো বলে আমিও যেন কোনোদিন বুড়ি হবো না।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল বললো, তোমার কথা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে যাই মারিয়া, আমার সমস্ত শরীরে শিহরণ জাগে। কেমন করে তুমি আমাকে এতো গভীরভাবে বুঝতে পারলে। এই ভেবে খুশিতে মন ভরে যায় যে পৃথিবীতে অন্তত এমন একজন আছে যার কাছে আমার কিছুই অজানা নেই। কখনও কখনও তাই ভাবি যে সত্যি আমি যদি কোনোদিনও এক লাইনও না লিখতে পারি, যদি আর একটি লোকও আমার নাম না শোনে তাহলে ক্ষতি কি। একজন তো আমার ভাবনা চিন্তার কথা জানে আর সে তো আমাকে একজন বড়ো লোকের যতোখানি সম্মান প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছে। এমনকি সে আমার জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে বসে আছে, কথা শেষ করে চঞ্চল হাসলো।

সহজ সুরে মারিয়া বললো, ওকথা বলে ফাঁকি দিলে চলবে না চঞ্চল। তুমি আর সময় নষ্ট করতে পারবে না। অনেক দিন তো হয়ে গেলো। আমাদের আলাপ হবার পর থেকেই তুমি শুধু লিখবো-লিখবো করছো কিন্তু কিছুই তো লিখতে পারলে না, মারিয়া মৃদু হাসলো, আমার বার বার ভয় হয় আমি যেন তোমাকে অকর্মণ্য করেছি, যদি আমি তোমার জীবনে না আসতাম তাহলে হয়তো তোমার কাজ অনেক এগিয়ে যেতো।

না যেতো না। তুমি আমাকে নতুন কথা বলছো। নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছো। বলতে বাধা নেই যে তোমার সঙ্গে মিশে আমার চিন্তা অনেক পরিণত হয়েছে।

কিন্তু তুমি তো তার প্রমাণ আজও দিলে না চঞ্চল। তোমার জীবনে যে আমি এলাম তার স্মৃতি রইলো না তোমার কোনো রচনায়। কী দিলাম তোমাকে

সেকথা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি।

না না, অন্তত আমাকে সুখী করবার জন্যে তুমি লেখা আরম্ভ করো।

কিন্তু পরীক্ষা আছে যে—

দিও না পরীক্ষা।

সে কি? তার জন্যে যে বিলেতে এসেছিলাম।

মারিয়া হেসে জিজ্ঞেস করলো, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঠিক করে বলো চঞ্চল, সত্যি তুমি কি লেখাপড়া করতে এদেশে এসেছিলে?

চঞ্চল সলজ্জ হাসি হেসে বললো, বোধ হয় না।

আমি সেকথা জানি। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার দিনকয়েকের মধ্যে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে লেখা ছাড়া তুমি আর কিছুই করতে পারবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে চঞ্চল বললো, কিন্তু যে কাজ আমি সবচেয়ে ভালো করে করতে পারি তার মূল্য একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে দিলো না, ভবিষ্যতে হয়তো দেবেও না।

তার জন্যে দুঃখ করবার কিছু নেই চঞ্চল। অনেক বড়ো লেখককে মানুষ অন্য কাজের জন্যে প্রচুর দাম দিয়েছে কিন্তু যে কাজ তারা সবচেয়ে ভালো করে করতে পারতো তার জন্যে কানাকড়িও দেয় নি। তাই কতো সাহিত্যিক নানা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছে।

আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না মারিয়া যে আমাকেও সারাজীবন চাকরি করতে হবে।

নিশ্চয়ই করতে হবে না চঞ্চল। যদি করতেই হয় তাহলে আমি চাকরি করবো, তুমি শুধু লিখবে।

তুমি ঠিক বলেছো মারিয়া, আমি লেখবার জন্যে এদেশে এসেছিলাম। আসবার আগেই আমি ঠিক করেছিলাম যে এদেশে বসে এদেশের মানুষ নিয়ে নানা রকম লেখা লিখবো। কিছু কিছু ছোটো গল্প লিখেছি, অনেক প্রবন্ধ লিখেছি। আমাদের দেশের পত্রিকা সেগুলি সাগ্রহে প্রকাশ করেছে আর ওই ধরনের আরও লেখবার জন্যে সম্পাদকরা আমাকে বারবার অনুরোধ জানিয়েছে।

কী ভেবে মারিয়া বললো, কিন্তু আমার মনে হয় চঞ্চল, তোমার ওই ধরনের রচনার আদর খুব বেশিদিন থাকবে না। একজন ভারতীয় লেখকের এদেশের মানুষ নিয়ে বেশি না লেখাই ভালো। সে তো এদেশের লেখকের কাজ। আর অনুবাদ করলে এদেশের পাঠকরাও তোমার লেখার খুব প্রশংসা করবে বলে মনে হয় না।

চঞ্চল বললো, তা হোক। লেখকের কাজ হলো শুধু লিখে যাওয়া। কার কেমন লাগবে সেকথা ভেবে তো লেখা চলে না।

নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তুমি ভারতীয় লেখক। তোমার প্রথম ও প্রধান কাজ হলো ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণী পৃথিবীর পাঠকের কাছে প্রচার করা। তা না করলে এদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে তোমার নাম থাকবে না, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও উল্লেখ থাকবে না।

কিন্তু ওকথা ভেবে এদেশ নিয়ে আমি কেন লিখবো না বুঝতে পারছি না। কোনো দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে নাম থাক বা না থাক আমি যেখানে আছি তার ছবি যদি দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারি তাহলেই তো আমার সেই বিশেষ রচনা সার্থক হলো। আমি যা অনুভব করি তা তো আমাকে লিখতেই হবে। এদেশের মানুষ নিয়ে এদেশী লেখক লিখেছে বলে আমি লিখবো না সেকথা বলা চলে না। কারণ দুই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে আলাদা। লেখা যদি রসোত্তীর্ণ হয় তাহলে আমি কী চোখে ইউরোপকে আর এদেশের মানুষকে দেখলাম তারও যথেষ্ট মূল্য আছে বৈকি।

তোমাদের দেশের পাঠকের কাছে, এদেশের পাঠকের কাছে নয়। বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের লোক গ্রাহ্য করে না অন্য লেখক তাদের দেশ সম্পর্কে কী লিখলো বরং তোমাদের দেশের নানা বিষয় সম্পর্কে তাদের প্রচুর কৌতূহল।

একটু অসন্তুষ্ট হয়ে চঞ্চল বললো, তাহলে তুমি বলতে চাও যে কোনো লেখকের পরিধি সীমাবদ্ধ, সে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না? আর বিলেত নিয়ে আমি কিছুই লিখবো না? তাহলে এখানে আসা আমার ব্যর্থ হবে?

মারিয়া হাসলো, আমার দুর্ভাগ্য, হয়তো আমার ভাষা দুর্বল বলে আমি কি বলতে চাই তোমাকে পরিষ্কার করে বোঝাতে পারলাম না।

চঞ্চল হেসে বললো, তোমার ভাষা দুর্বল নয়, বলতে পারো আমার যুক্তি প্রবল। তাই তোমার হার হলো।

তোমার কাছে হেরে যাবার জন্যে আমি সব সময় প্রস্তুত। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও হার হয় নি তার প্রমাণ দিচ্ছি—

দাও।

নিজের পেয়ালায় আবার নতুন করে চা ভরে নিয়ে মারিয়া বললো, পৃথিবীর কোনো লেখকের পরিধি কখনও সীমাবদ্ধ হতে পারে না। যা নিয়ে খুশি তা নিয়ে লেখবার সম্পূর্ণ অধিকার তার আছে। তবু যদি ক্ষমতাশালী লেখক হয় তাহলে তার কোনো রচনায় সে তার দেশের কথা ভুলতে পারে না। কিন্তু কতো বাঙালী লেখক এদেশে আছে যারা শুধু ইংল্যাণ্ড নিয়ে লিখেছে। আর তাদের নাম দুই দেশের পাঠক বেশ ভালো করেই জানে।

শুধু ওইটুকুই। কিন্তু সে নামের বেশি দাম কোনো দেশের পাঠকই দেয় না। তুমি তো জানো যেসব বিদেশী লেখক এদেশ নিয়ে লেখে তাদের লেখা এদেশের কোনো কাগজ প্রকাশ করতে আগ্রহ দেখায় না আর তোমাদের দেশের লোক নিশ্চয়ই তাদের লেখক বলে স্বীকার করে না।

সেকথা ঠিক নয় মারিয়া। মুল্‌করাজ আনন্দের নামের কি মূল্য নেই?

মারিয়া হেসে বললো, তিনি ইংরেজিতে লিখেছেন বটে কিন্তু আমি তাঁর যা লেখা পড়েছি তাতে দেখেছি সবই ভারতবর্ষের কথা। তবে আমার মনে হয় নিজের ভাষায় নিজের দেশে বসে লিখলে হয়তো তিনি আরও ভালো লিখতেন আর আরও বেশি সম্মান পেতেন। তিনি ইংরেজিতে লিখলেও তোমাদের দেশের লোক তাঁর লেখা বেশি পড়ে। ইংল্যাণ্ডের কজন তাঁকে বড়ো লেখকের সম্মান দেয়?

তাঁকে আমি বড়ো লেখক বলছি না। তেমন ক্ষমতা থাকলে হয়তো তিনি সে সম্মান পেতেন।

কিছুতেই পেতেন না। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে যতো সম্মান পেয়েছেন, বিদেশে ততো পান নি। দেশের সঙ্গে লেখকের নাড়ীর যোগ, যে লেখকরা তা ছিন্ন করতে যায় তারা একূল-ওকূল দুকূল হারায়। তোমার নিজের ভাষায় তুমি যদি এমন কিছু লেখো যা রসোত্তীর্ণ তাহলে বিদেশী পাঠক বাংলা শিখে তোমার লেখা পড়বে।

তাহলে কি ইংরেজিতে আমাদের কারুর কিছু লেখা উচিত নয়?

আমার মনে হয় আগে মাতৃভাষায় লিখে তারপর ভাষান্তরে অনুবাদের বন্দোবস্ত করা উচিত। সে ভার লেখকের না নেয়াই ভালো কেননা অনুবাদ করে সময় নষ্ট না করে তিনি অন্য নতুন লেখা লিখলে আরও ভালো হয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চঞ্চল বললো, আমাদের দেশে অনেক ভালো লেখক আছে কিন্তু তারা শুধু বাংলাভাষায় লিখেছে বলে বাংলার বাইরে তাদের খ্যাতি গেলো না।

যথাসময়ে যাবে। সত্যি যদি তারা ভালো লেখক হয় তাহলে কিছুতেই তাদের খ্যাতি সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। ভেবে মারিয়া বললো, তোমাদের দেশের সেইসব ভালো লেখকের লেখা যদি তুমি আমাকে পড়াও তাহলে আমি তা ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করতে পারি।

চঞ্চল হেসে বললো, খুব ভালো হয় তাহলে। কিন্তু তোমাকে যে বাংলা শিখতে হবে।

শিখে নেবো। ভয় কি, তুমি তো আছো।

কাপে শেষ চুমুক দিয়ে চঞ্চল বললো, তুমি যদি সত্যি আমাদের দেশের ভালো ভালো উপন্যাস ইংরেজি আর ফরাসিতে অনুবাদ করো তাহলে একটা বড়ো কাজ করা হবে।

আমি নিশ্চয়ই করবো।

চঞ্চল হাসলো, একটা কথা মনে হচ্ছে মারিয়া। অনেক ফরাসী মহিলা আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ লোকদের সঙ্গে আলাপ হবার পর সর্বস্ব ত্যাগ করে ভারতবর্ষের নানা উপকার করেছেন। আজ তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে তুমিও তাঁদের একজন হবে।

কিন্তু তার আগে তোমাকে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ লোক হতে হবে।
চঞ্চল হেসে বললো, নিশ্চয়ই হবো।
টেবিল থেকে শূন্য কাপডিশ তুলতে তুলতে মারিয়া বললো, বিয়ের আগে থেকে আজ পর্যন্ত আমরা শুধু দেশবিদেশের সাহিত্য নিয়ে তর্ক আলোচনা করে এসেছি কিন্তু তোমার সাহিত্য নিয়ে কোনো আলোচনা হয় নি—
আমি কী লিখলাম যে আমার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবে ?
কিন্তু কী লিখবে তা জানবার অধিকার কি আমার নেই ?
আছে বৈকি মারিয়া। কিন্তু আজ সকালে তুমি যে আমার সমস্ত গোলমাল করে দিলে। আমি ভেবেছিলাম এদেশের মানুষ নিয়ে, ইংরেজ পরিবার নিয়ে নানা উপন্যাস রচনা করবো, মাথায় নানা প্লট সাজিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু তুমি যা বললে তারপর সে সব লেখা আর কেমন করে লিখি !
আমার কথায় তুমি লিখবে না তা হতেই পারে না চঞ্চল। তোমার প্রাণের প্রকাশ যদি আমার জন্যে রুদ্ধ হয় তাহলে আমার লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না। তুমি ভুল বুঝো না আমাকে। তোমার মাথায় যা সাজানো আছে আমি তা নিয়ে কোনো কথা বলি নি কেননা আমি জানি না কী তোমার এখানকার ভাবনা। আলোচনা করবার সময় তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তাধারা কেমন হওয়া উচিত আমি শুধু সেই কথাই বলতে চেয়েছিলাম।
কেমন হওয়া উচিত তা না হয় বোঝাবার চেষ্টা করলে কিন্তু এখনো আমি ভাবতে পারছি না আমার সাহিত্য থেকে বিলেতকে ছেঁটে দেবো কেমন করে। এখানে এসে আমি অনেক কিছু পেয়েছি—তোমাকেও পেলাম এদেশে এসে !
যেন লজ্জা পেয়ে মারিয়া বললো, হয়তো আমার বলবার কথা আমি তোমাকে পরিষ্কার করে বলতে পারি নি। বিলেতকে তোমার সাহিত্য থেকে একেবারে কেন ছেঁটে দেবে চঞ্চল ? হয়তো তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা হবে এই বিলেত নিয়েই।
তাহলে একটু আগে বললে কেন প্রত্যেক লেখকের নিজের দেশ নিয়ে লেখা উচিত ?

সাহিত্যসৃষ্টির বেলায় উচিত অনুচিত বলে কোনো কথা নেই। আমি মোটা-মুটি আমার মতামত তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম। এদেশের ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদা কিছু না লিখে তুমি যদি নিজেকে নিয়ে লেখো তাহলে আমার মনে হয় সে লেখা আরও স্বতঃস্ফূর্ত হবে। এই ধরো, তুমি এদেশে এলে, কী পেলে, কী হারালে, কি পরিবর্তন এলো তোমার জীবনে, কারা তোমায় সঙ্গ দিলো, দুঃখ-বেদনা দিলো—এইসব নিয়ে উপন্যাস লিখতে লিখতে এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার কথাও অনেক এসে পড়বে আর সেগুলো বলা অসঙ্গত হবে না, সুন্দর করে বলতে পারলে লেখা সার্থক হবে। কিন্তু তোমার কথা বাদ দিয়ে মানে ভারতবর্ষের কথা একেবারে না লিখে শুধু এদের কথা লিখলে সে রচনার মূল্য কতোখানি হবে বলা কঠিন।

মারিয়ার মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চঞ্চল বললে, তুমি ভালো কথা বলেছো মারিয়া।

চঞ্চলের মুখোমুখি চেয়ারে বসে মারিয়া বললো, বস্তুত, পৃথিবীর সমস্ত দেশে এখন নানা রকম সমস্যা এতো বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে যে সেগুলির সমাধান না হলে মানুষ কিছুতেই অন্য দেশের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে না। তাই তুমি যদি তোমার দেশের কথা বাদ দিয়ে অন্য দেশের নরনারীর কথা লেখো তাহলে সে-লেখা তোমার দেশের পাঠকের মনে রেখাপাত নাও করতে পারে।

তোমার কথাই ঠিক মারিয়া। তুমি আমাকে আজ নতুন করে ভাবতে শেখালে। ওকথা বলে তুমি আমাকে শুধু শুধু বাড়িয়ে তুলো না। তুমি আমার একান্ত আপনার তাই শুধু আমার মনের কথা তোমায় পরিষ্কার করে বললাম। যদি আমি লিখতে পারতাম তাহলে হয়তো তোমাকে যেমন বললাম তেমন লেখবার চেষ্টা করতাম।

তুমি লেখো না কেন মারিয়া ?

দূর পাগল, ওসব কি সকলের হয় ? আমার শুধু দিনরাত পড়তে ইচ্ছে করে। তা তো সব সময় দেখতে পাই।

যাহোক, মারিয়া বললো, এবার তুমি লেখা আরম্ভ করো চঞ্চল, আমাকে দয়া করে নিশ্চিন্ত করো। অনেক কথা তো বলে দিলাম তোমায়, এবার তুমি কতো প্লট ভাবতে পারবে, টেবিল পরিষ্কার করতে করতে মারিয়া বলে চললো, শুধু তোমাকে নিয়ে কেন, এদেশে তোমার দেশের অনেক রকম লোক আছে, তাদের নিয়েও তুমি সহজেই লিখতে পারো। এই সেদিন আমরা যে ইণ্ডিয়ান রেঁস্তোরায় খেলাম, সেখানেই তো দেখলে তোমার দেশের লোক ইংরেজ বিয়ে করে কেমন ব্যবসা চালাচ্ছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা হয়তো কেউই জানে না। তোমার মতো দরদ দিয়ে তাদের কথা লিখতে পারবে কে!

অবাক হয়ে চঞ্চল বললো, মারিয়া তুমি সত্যি আমাকে সৃষ্টি করবার মন্ত্র দিচ্ছো। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো!

সে কথায় কান না দিয়ে মারিয়া বললো, তোমাদের দেশের এমন কতো লোক আছে লণ্ডন শহরে। ইণ্ডিয়া হাউসে যারা চাকরি করে কিংবা যারা এদেশে ব্যবসা করে, ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার, ব্যারিস্টার যে কোনো কারণেই যারা এদেশে থেকে গেলো, তুমি যাও তাদের সঙ্গে মেশো, দরদ দিয়ে তাদের মনের অলিগলির সন্ধান নাও, বিচার করে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করো তাদের অবস্থা, জানো কেন তারা এদেশে রইলো, বিদেশিনী বিয়ে করে তাদের মন ভরলো কিনা, দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদেশে তাদের লাভ হলো না সর্বনাশ হলো— তারপর ভরিয়ে তোলো পাতার পর পাতা। কথা বলতে বলতে মারিয়ার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, আমি বলছি চঞ্চল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এদের নিয়ে লিখলে তুমি অনেক নতুন কথা পাঠককে জানাতে পারবে। আর এসব বই যে কোনো ভাষাতেই অনুবাদ করা হোক না কেন আমার মনে হয় তোমার সৃষ্টি কিছুতেই একেবারে বিফল হবে না।

মারিয়ার কথা শুনতে শুনতে চঞ্চল একেবারে উঠে দাঁড়িয়েছিলো। মারিয়া, তোমাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই। তুমি জানো না তুমি আমাকে এইমাত্র কী রত্নখনির সন্ধান দিলে। এই দেখো তোমার কথা শুনতে শুনতে আমার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে।

মারিয়া হেসে বললো, শুনেছি অনেক লেখকের লেখবার সময় অনুভূতি তীব্র হলে নাকি রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু এজন্যে তুমি আমাকে খুব একটা বিদুষী ভেবো না। তুমি আমাকে এমনিতেই একটু বেশি রকম বাড়িয়ে দেখো। আমি খুব সাধারণ মেয়ে চঞ্চল।

চঞ্চল মারিয়ার কাছে এসে তার একটা হাত ধরে বললো, এমন সাধারণ মেয়ে যেন যুগ যুগ ধরে ঘরে ঘরে জন্মায়।

যাক, আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মারিয়া বললো, অনেকক্ষণ আজ নানা আলোচনা হলো আর আমার শেষ কথা যে আমি সংসার আর তোমার ভালোর জন্যে ইস্কুলে আবার চাকরি করবো, তুমি কিছুতেই বাধা দিতে পারবে না।

দুই হাত মারিয়ার কাঁধে রেখে তাকে খুব জোরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে চঞ্চল বললো, না না না, তোমার কোনো কাজে আমি আর কোনোদিনও বাধা দেবো না।

এই তো লক্ষ্মীছেলের মতো কথা, চঞ্চলকে আদর করে মারিয়া বললো, তাহলে আজ আমি মিস ডিকিনসনের সঙ্গে দেখা করে চাকরির কথা পাকা করে ফেলি ?

এতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন ? আজ যে আমাদের বেড়াতে যাবার কথা।

বেড়াবার জন্যে রয়েছে চিরকাল, কিন্তু কাজ ফেলে রাখলে আমার বড়ো খারাপ লাগে চঞ্চল। তাই আজ ওটা সেরে ফেলি ?

আর আমি কী করবো ?

তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারো, আমার তো বেশিক্ষণ লাগবে না, যখন আমি মিস ডিকিনসনের সঙ্গে দেখা করবো তখন না হয় তুমি কাছাকাছি কোথাও ঘুরে বেড়িও তারপর আমরা যেমন ঠিক করেছিলাম তেমন করবো।

বেশ তাই চলো !

দাঁড়াও, দুএকটা ছোটোখাটো কাজ সেরে ফেলি, স্যাণ্ডউইচ করাই আছে, কিন্তু তুমি আর দেরি কোরো না, আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে নাও।

ঠিক আছে মারিয়া।

মারিয়ার প্রস্তুত হয়ে নিতে বেশি সময় লাগবে না। শুধু কাপড় বদল করে চুল ঠিক করে নেবে। খুব তাড়াতাড়ি চায়ের সরঞ্জাম ধুয়ে সাজিয়ে রাখলো সে। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো।

রোদ উঠেছে। কাদের বাড়ির উপর ঝরে-পড়া জমাট শিশির হাল্কা আলোয় ঝলমল করছে। আরও দেখা যায় একে একে বাড়ির বউ কিংবা মেয়ে পর্দা সরিয়ে জানলার কাচ তুলে দিয়ে ঘরে রোদ্দুর আসবার পথ করে দিচ্ছে, হঠাৎ-আসা আলোর এক কণাও যেন বিফলে না যায়।

আজ এই হাল্কা রোদ্দুরে শিশির-ঝলমল-করা সকালে পুরু আয়নায় নিজের চেহারা দেখে চুল ঠিক করতে করতে হঠাৎ মারিয়ার মন যেন কোথায় ভেসে গেলো। একে একে চোখের সামনে ফুটে উঠলো তার শৈশব কৈশোর আর প্রথম যৌবনের দিনগুলি। তার সমস্ত শরীর কয়েক মুহূর্তের জন্যে আবেশে অবশ হলো যেন।

বন্ধুসংখ্যা মারিয়ার একেবারেই বেশি ছিলো না ছেলেবেলায়। সে কারুর সঙ্গে সহজে মিশতে পারতো না। আজও পারে না। যাদের সঙ্গে মিশতো কিছুদিন পর তাদের মধ্যে অনেকেই তাকে ভয় করতে আরম্ভ করতো। কেউ কেউ এড়িয়ে যেতো। কেউ তাকে বলতো নির্বোধ, কেউ বলতো, বয়সের তুলনায় বেশি রকম গম্ভীর আর কেউ কেউ তার মাথার দোষ দিতেও দ্বিধা করতো না।

পিসি মারিয়াকে প্রায়ই বলতেন, ওরে এবার একটু ছেলেদের সঙ্গে মেশবার চেষ্টা কর মারিয়া, না হলে সত্যি পড়তে পড়তে মাথা খারাপ হয়ে যাবে তোর—

বাধা দিয়ে মারিয়া বলতো, তুমি কিছু ভেবো না পিসি, মনের মতো ছেলে পাচ্ছি না, পেলে নিশ্চয়ই মিশবো।

থাম, মনের মতো ছেলে আবার কি ? কত ভালো ছেলে আছে দেশে।

কিন্তু আমার যে সময় নেই পিসি—

না সময় নেই ? রাজ্যসুদ্ধ মেয়ের সময় আছে শুধু তোমার নেই।

একটু হেসে পিসির সঙ্গে রসিকতা করতো মারিয়া, শুনি তোমারও তো কখনও কোনো ছেলে-বন্ধু ছিলো না—তবে?
আমার চেহারা তো তোমার মতো মিষ্টি ছিলো না। তাই আমি যে সব সুন্দর ছেলেদের সঙ্গে মিশতে চাইতাম তারা সসম্ভ্রমে আমাকে এড়িয়ে যেতো, পিসিও রসিকতা করতে ছাড়েন নি। তাই তো শেষ অবধি ছেলেদের আমি সহ্য করতে পারতাম না, একটু থেমে হেসে পিসি বলেছিলেন, কিন্তু তোর মতো রূপ থাকলে জগৎ মাত করে দিতাম, বুঝলি?
মারিয়া মাথা নেড়ে জানিয়েছিলো সে বুঝেছে। সত্যি পিসি তাকে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে বারবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এমন একা একা ঘরের কোণে দিনরাত বইএ মুখ গুঁজে পড়ে থাকলে বাইরের পৃথিবীকে সে কোনোদিনও জানতে পারবে না। কিন্তু তার মনের আসল অবস্থার কথা মারিয়া পিসিকে বোঝাতে পারে নি। আর তখন তার মনে হতো, শুধু পিসিকে কেন, হয়তো সে কোনোদিনও পৃথিবীর একটি লোককে—নিজেকে—কিছুতেই বোঝাতে পারবে না। মাঝে মাঝে নিজের কথা ভাবলে আজও মারিয়া অবাক হয়ে যায়। তার মনের কোন কোণে যেন এক অদ্ভুত নিরাসক্তি লুকোনো রয়েছে। এই বিশাল পৃথিবীর কিছুই তাকে আকর্ষণ করে না, সবই যেন তার জানা হয়ে গেছে, সবই যেন তার পাওয়া হয়ে গেছে, কোনোদিন কোনো কিছুতেই একেবারে আত্মহারা হবে না সে।
শুধু বই বই আর বই। অজস্র বইয়ের মধ্যে দিনরাত সে শুধু নিজেকে খোঁজবার চেষ্টা করে। তার মতো একটি অদ্ভুত জীবন্মৃত চরিত্র কি পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো লেখক কখনও সৃষ্টি করেন নি? কেন ছাত্রী-জীবনে ছেলে হোক মেয়ে হোক একটি মানুষও তার মনের কাছে এগিয়ে আসতে পারে নি? কেন কিশোরী বয়সে আর পাঁচজন মেয়ের মতো সে বয়সের উদ্দাম তেজে ছুটোছুটি করে খেলা করতে পারে নি? মনের কোন ভাবনা তাকে সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলো? নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখতে মারিয়ার ভালো লাগে না। নিজেকে নিজে বোঝবার চেষ্টা

করলে গভীর বেদনায় তার বুক ভরে যায়। কেন এমন হলো? কেন সে এতো পড়তে শিখলো—এতো ভাবতে শিখলো! কোন বইএ একবার সে যেন ঐশী অতৃপ্তির কথা পড়েছিলো। নিজের কথা ভাবলে সেই কথাটি বারবার মারিয়ার মনে পড়ে। ছেলেবেলায় অনেক সময় সে নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করেছে। জোর করে হৈ-হৈ করবার চেষ্টা করেছে, তার সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে খেলা করবার চেষ্টা করেছে। আর একটু বড়ো হলে সে নাচের হলে গিয়ে মুখে প্রচুর উৎসাহ আনবার চেষ্টা করে তাল মেলাবার চেষ্টা করেছে, নাইট ক্লাবে গিয়ে মদ খেয়ে আনন্দে মেতে ওঠবার ভান করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। সব সময় তার নিজেকে একান্ত একা মনে হয়েছে। পিসি শেষ অবধি ধরে নিয়েছিলেন মারিয়া তাঁরই মতো হবে। বড়ো হয়ে তার মতো ইস্কুল-মাস্টারি করে নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে দেবে। আর তার মা-বাবা অবাক হয়ে ভাবতেন, মেয়ে এমন সন্ন্যাসিনীর মতো হলো কেন! কোনোদিন যে মারিয়া বিয়ে করে সংসার করবে না—সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। এমন মেয়ে হয় নাকি? কোনোরকম আনন্দ পেতে চায় না? যে নাচতে জানে না, খেলতে জানে না, গয়না-কাপড় কিছুতেই যার মন নেই? এ মেয়ে সারাজীবন শুধু ঠকে মরবে।

মা-বাবার কথা শুনে মারিয়া ভাবতো যে সে ঠকে মরলেও কাউকে কখনও ঠকাবে না। বস্তুত, নিজের কথা ভাবলে অনেক সময় তার একটি শাদা হাঁসের কথা মনে পড়ে। মারিয়ার মনের মধ্যে যেন একটি শাদা হাঁস, যে শুধু সকলকিছু ছেড়ে দূর থেকে দূরান্তে উড়ে যায়। কাদার কাছে থাকলেও যার ডানার এক ঝাপটে সমস্ত কাদা ঝরে যায়, যার গায়ে লাগে না কলঙ্কের কোনো দাগ, দুঃখ দারিদ্র্য শোক বেদনা অভাব যাকে কোনোদিনও স্পর্শ করতে পারে না। সমস্ত বাধা তুচ্ছ করে সংকীর্ণ পরিবেশ ছাড়িয়ে বিপুল পরিধির মাঝে প্রসন্নমনে সে দিনরাত শুধু উড়ে বেড়ায়। এ কথা মারিয়া কাকে বোঝাবে? কে বুঝবে তাকে? কেমন করে অন্য আর একজনের কাছে সে ফুটিয়ে তুলবে তার মনের স্পষ্ট ছবি।

অবশ্য অন্যের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যে মারিয়া ব্যস্ত হয়ে ওঠে নি কোনোদিন। সে কাউকে চায় নি—মনপ্রাণ দিয়ে কাউকে কামনা করতে পারে নি। সে একেবারে মুক্ত, সে সম্পূর্ণ একা। তার কোনো দায় নেই, কোনো বন্ধন নেই, কারুর জন্যে কোনো কর্তব্য নেই। তাই নিজেকে তার রানীর মতো মনে হতো, মনের কোনো দৈন্য, কোনো হীন চক্রান্ত হিংসা কিংবা নীচ প্রবৃত্তি তার শাদা হাঁসের প্রসারিত ডানায় কখনও লাগাতে পারে নি কোনো কালো দাগ।

মারিয়ার যখন আর একটু বয়স বাড়লো তখন সে চলে এলো লিঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে ডিগ্রি নেবার জন্যে। সেই সময় তার বয়সের কাছাকাছি অনেক ছেলের সঙ্গে তার আলাপ হলো, আর সে বেশ উৎসাহ নিয়ে তাদের জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলো, নিজেকে জানাতে চেয়েছিলো। পরিচয় হলো কিন্তু উভয় পক্ষের মনের দু-একটা ছোটোখাটো জানালা খুললেও দুরন্ত বাতাসে মারিয়ার মনের সদর দরজা কিছুতেই খুললো না। হয়তো কোনো-দিনও খুলবে না। তাই আবার মারিয়া ডুবে গেলো পড়াশুনোর মধ্যে।

লিঁও থেকে খুব ভালোভাবে পরীক্ষায় পাশ করে মারিয়া পিসির সঙ্গে প্যারিসে রইলো কিছুদিন। তখন তার বয়স হয়েছে, বুদ্ধি পরিণত হয়েছে, কিন্তু মনের মাঝে সেই দূরদূরান্তে উড়ে-ফেরা শাদা হাঁসের ডানা-ঝাপটানি ক্ষণকালের জন্যেও বন্ধ হয় নি।

এবার কী করবি মারিয়া?

আরও পড়াশুনো করবো পিসি।

দূর পাগলী, এমন যৌবন যে শুকিয়ে আসছে।

আসুক, তোমারও যৌবন তো অসংখ্য গ্রন্থরাজি ভোগ করে এসেছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে পিসি বলেছিলেন, আমার কথা আলাদা। আমার যৌবন থাকলেও তোর মতো রূপ ছিলো না। আর আমার ছিলি তোরা— তুই আর পল। কিন্তু তোর যে কেউ থাকবে না, আমি, তোর মা-বাবা —সকলের বয়স হয়েছে, আমরা তো বেশিদিন বাঁচবো না।

পল তো থাকবে পিসি, আমার কথা তুমি ভেবো না।

পলকে আমি ঠিক বিশ্বাস করি না, ও তো একটা অশিক্ষিত মিস্তিরি। তোর সঙ্গে ওর পরে নানা বিষয় নিয়ে গোলমাল বাধতে পারে।

আমি একা শেষ দিন অবধি ঠিক চালিয়ে যাবো পিসি, তুমি শুধু শুধু আমার জন্যে ভাবনা করে মন খারাপ কোরো না।

তোর জন্য আমার বড়ো ভাবনা হয় মারিয়া। আমি ছেলেবেলা থেকে লেখাপড়া নিয়ে থাকলেও সাংসারিক বুদ্ধি আমার যথেষ্ট ছিলো, তাই কখনও আমার অভাব হয় নি। কিন্তু তুই যে নিজের ভালোমন্দও বুঝিস না রে।

খুব বুঝি পিসি, তুমি আমাকে যতো ভালো মানুষ ভাবো আমি ঠিক ততো ভালো মানুষ নই।

পিসি সেদিন আর কথা না বলে হেসেছিলেন। মনে মনে প্রার্থনা করেছিলেন যেন যথাসময়ে মারিয়া মনের মানুষ খুঁজে পায়। তাঁর মতো নিঃসঙ্গ জীবন তাকে যেন কিছুতেই বেশিদিন না কাটাতে হয়। এ জীবনে সুখ নেই, সারা অঙ্গে যেন রাজ্যের ক্লান্তি নেমে আসে, দুঃসহ অতৃপ্তি আচ্ছন্ন করে মন, বড়ো অসহায় মনে হয় নিজেকে। হে ঈশ্বর, এমন অবস্থা মারিয়ার যেন কোনো দিনও না হয়।

মারিয়া প্যারিসে মাসখানেক থাকবার পর লণ্ডনে একটা চাকরির সন্ধান পাওয়া গেলো। এতো তাড়াতাড়ি চাকরি করবার তার কোনো দরকার ছিলো না আর সন্ধান করলে হয়তো প্যারিসে এমন চাকরি পাওয়া যেতো। কিন্তু পিসি অন্য কথা ভেবেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিলো যে মারিয়ার একবার ফ্রান্সের বাইরে ঘুরে আসা দরকার। অন্য সমাজে আরও নানারকম পাঁচজন লোক দেখে তাহলে হয়তো তার মনের সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। মারিয়াকে নিয়ে পিসির ভাবনার অন্ত ছিলো না। তিনি কেবলই ভাবতেন যে এ মেয়ে সারা জীবনে কখনও সুখ পাবে না।

কিন্তু লণ্ডনে এসে মারিয়ার আরও খারাপ লাগলো। এ যেন কাঠের পুতুলের দেশ। লোকে ওজন করে কথা বলে, নিয়ম করে কাজ করে—একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই।

ক্রিস্ট্যাল প্যালেসে যে বাড়িতে সে উঠেছিলো সে বাড়িতে আরও অনেক ভাড়াটে ছিলো। কয়েকজন বয়স্ক ইংরেজ ভদ্রলোক, তুজন হাঙ্গেরীয় মহিলা আর একটি মাঝবয়সী ভদ্রলোক যার চেহারা দেখে মারিয়া বুঝতে পারে নি যে সে কোন দেশের লোক। প্রত্যেকের জীবনের উপর ইংল্যাণ্ডের প্রভাব নাকি একটু বেশি মাত্রায় পড়ে। প্যারিসে আরও তু-একজনকে মারিয়া জানে যারা কিছুদিন ইংল্যাণ্ডে কাটিয়ে গিয়েছিলো। শুধু তারা কিছুদিন থেকে যায় নি, পুরোপুরি ইংরেজ হয়ে দেশে ফিরেছিলো। ক্রিস্ট্যাল প্যালেসে যে বিদেশীরা তখন ছিলো তাদেরও যেন ঠিক ইংরেজের মতো মনে হয়েছিলো মারিয়ার। আর আরও আশ্চর্যের কথা যে এক টেবিলে ব্রেকফাস্ট-ডিনার খেলেও শুধু খাবার সময় তু-একটি কথা ছাড়া আর কোনোদিন কোনো কথা বলবার অবসর হয় নি তাদের সঙ্গে। একজন বুড়ো ইংরেজ তাকে অবশ্য তু-একবার বাইরে বেড়াতে যাবার কথা বলেছিলো। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি ভালো লাগে নি মারিয়ার। তাই সে বিনীতভাবে তার অনুরোধ এড়িয়ে গেছে।

যার নামে ক্রিস্ট্যাল প্যালেসের এই বাড়ি সেই মিসেস রিক্সের বয়স খুব বেশি নয়। চল্লিশের কাছাকাছি। তার এক মেয়ে, নাম গ্রিটা। গ্রিটার বয়স বছর তেরো। বেণী তুলিয়ে ইস্কুলে যায়। সম্প্রতি পিসির কাছ থেকে প্রচুর স্নেহ পেয়ে মারিয়া ভেবেছিলো মিসেস রিক্সের সঙ্গে তার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। একটি বাজে কথা মিসেস রিক্স বলে না। কারুর কোনো বিষয়ে তার সামান্য কৌতূহল নেই। গ্রিটাকে ফরাসী পড়তে হয়। সে কথা শুনে মারিয়া নিজের থেকে তাকে ফরাসী শেখাবার প্রস্তাব জানিয়েছিলো। গ্রিটার মাকে সে বলেছিলো তার এখন প্রচুর অবসর, সে খুশী হয়ে গ্রিটাকে নিয়ম করে ফরাসী শেখাতে পারে। এ প্রস্তাব মিসেস রিক্স কিভাবে নিয়েছিলো বোঝা যায় নি। সেই ওজন-করা হাসি হেসে বলেছিলো, বেশ বেশ অনেক ধন্যবাদ, এতো ভালো তুমি! বড়ো খুশী হলাম। তুমি গ্রিটাকে এক ঘণ্টা করে সপ্তাহে তিনদিন ফরাসী শেখাও আর ভাড়া দেবার সময় আমাকে পনেরো শিলিং কম দিও। ওটা হলো তোমার যৎসামান্য

পারিশ্রমিক। তুমি শুধু শুধু পরিশ্রম করবে কেন? কেমন? ঠিক আছে তো? মারিয়া অবাক হয়ে শুধু ঘাড় নেড়েছিলো। মিসেস রিক্স কী মনে করলো কে জানে। হয়তো এই যে সে অর্থ উপার্জনের জন্যে এই প্রস্তাব তাকে দিলো। কিন্তু গ্রিটাকে পড়িয়ে টাকা নেবার কথা মারিয়া একবারও ভাবে নি। তেরো বছরের ছোটো মেয়েটিকে তার ভালো লেগেছিলো। তাই ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যে সে তাকে পড়াতে চেয়েছিলো। কিন্তু হায়, মারিয়া কি তখন জানতো ইংরেজ কারোর কাছ থেকে অনুগ্রহ নেয় না, কাউকে সহজে অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ দেয় না। হাতে হাতে নগদ বিদায় করা তাদের ধর্ম।

তারপর মারিয়া বাইরে বেরুলো। যথারীতি চাকরি করতে আরম্ভ করলো। কতো ইংরেজ ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা হলো তার। কিন্তু তেমন করে আলাপ হলো না। আর আলাপ হলেও মারিয়া বুঝতে পারলো পৃথিবীর মধ্যে যে কোনো দেশের যে কোনো লোকের সঙ্গে হয়তো তার মনের মিল হতে পারে কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে তার সামান্য মিল কিছুতেই হতে পারে না। ইংরেজ ব্যবসায়ী, বুদ্ধিমান, ধূর্ত, চতুর, পৃথিবীর প্রসিদ্ধ জাত, তাদের ভাষা সর্বত্র কথিত, অনেক গুণ ইংরেজের কিন্তু ইংল্যাণ্ডে কিছুদিন বাস করবার পর মাঝে মাঝে অবাক হয়ে মারিয়া ভাবতো এমন কঠোর ব্যবসায়ীর দেশ কেমন করে অসংখ্য কবি- সাহিত্যিক সৃষ্টি করলো! এমন দেশে বসে কেমন করে মানুষের শিল্প কিংবা সহিত্যে সৃষ্টির প্রেরণা আসে! তবু মন দিয়ে সে পড়তে লাগলো ইংরেজী সাহিত্য, ফ্রান্সের সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশের সংস্কৃতির তুলনা করবার চেষ্টা করলো। আর এইসব করতে করতে চারদিকে তাকিয়ে বার বার তার মনে হলো, ফরাসী,—সোনার ফরাসী আমার!

পুরো এক বছর মারিয়া নোঙরহীন নৌকার মতো লণ্ডনে ঘুরে বেড়ালো। কারুর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে সে কখনই ব্যস্ত হয় না—আজও হলো না। কিন্তু কথা বলবার লোক চাই যে। মনের গোপন কথা নয়, প্রতিদিনের আজে-বাজে তুচ্ছ সামান্য কথা বলবার জন্যে সে হাঁপিয়ে উঠলো। ফ্রান্সে পিসি ছিলো,

তার মা বাবা দাদা ছিলো, ইস্কুল-কলেজে তার সমবয়সী অনেক ছাত্র-ছাত্রী ছিলো। কিন্তু এখানে আছে শুধু ইস্কুল-টিচার। তাদের অনেক বয়স, তাদের অনেক কাজ। মারিয়ার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলবার তাদের সময় নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন বোধ হয় মারিয়ার মর্মান্তিক নিঃসঙ্গতার কথা বুঝতে পেরে তাকে লণ্ডনের অনেক আন্তর্জাতিক ক্লাবের সন্ধান দিয়ে জানালো যে সেই সব ক্লাবে গেলে সে নানা বয়সের নানা রকম লোকের সঙ্গে মিশতে পারবে।

নানা রকম লোকের সঙ্গে মেশবার জন্যে মারিয়া মোটেই ব্যাকুল নয় তবু একদিন যেন যন্ত্রচালিতের মতো সে রাসেল স্কোয়ারের ক্লাবে গিয়ে হাজির হলো।

ঠিক কথা বলেছিলো তাদের ইস্কুলের সেই টিচার। এতো রকম লোক এক সঙ্গে চোখে দেখবার সৌভাগ্য তার ফ্রান্সে হয় নি। ভারতীয়, সিলনের লোক আর ইউরোপের নানা জায়গার ছেলেমেয়ে তো আছেই। ক্লাবে ঘরোয়া বৈঠক বসে। এখানে সকলের সঙ্গে সকলের সহজে আলাপ হয়। কিন্তু পরিচয় হলে হবে কি, মারিয়ার মনের মতো কথা কেউ বলে না। সকলে ছবি দেখতে নিয়ে যেতে চায়, নাচতে চায়—তাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে অবশ্য মারিয়ার এতোটুকুও দেরি হয় না।

এদের মধ্যে তার সবচেয়ে ভালো লাগলো অমল দত্তকে। কালো মিষ্টি চেহারা তার, কথাবার্তাও মধুর। কিন্তু অমল দত্ত সাহিত্যের ধার দিয়ে যায় না তাই যখন সে বুঝতে পারলো যে মারিয়া লেখাপড়া-করা গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে তখন সে তার সঙ্গে নিঃস্বার্থ মধুর সম্পর্ক পাতালো আর মনে মনে ঠিক করলো যেমন করে হোক চঞ্চলের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিতে হবে।

চঞ্চলের সঙ্গে আলাপ হবার আগেই মারিয়ার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়েছিলো। আজও সে কথা মারিয়া ভুলতে পারে না। তার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে গিয়েছিলো। তার সমস্ত মনপ্রাণ উন্মুখ হয়ে প্রশ্ন করে উঠেছিলো, এ কে? এ কোথা থেকে এলো? একে যে আমি যুগ যুগ ধরে চিনি।

তাই চঞ্চলের ডাকে খুব সহজে সে সাড়া দিতে পেরেছিলো। আর যখন পরিচয় গভীর হলো তখনও তার বিস্ময় বাড়লো না। সে যেন ধরে নিয়েছিলো

যে এমন হবেই। তাই সে আনন্দে দিশা হারায় নি, কিংবা সব মেয়ের যেমন হয় অর্থাৎ মনে হয় তার যেন নতুন জন্ম হলো—মারিয়ার সে সব কিছুই মনে হলো না। শান্তভাবে একান্ত পরিচিত জনকে সে যেন খুব সহজে গ্রহণ করলো। এতোদিন মারিয়া কোনোদিকে চোখ তুলে তাকায় নি, তার যেন কোনো কর্তব্য নেই, তাকে যেন কারুর প্রয়োজন নেই। কিন্তু চঞ্চলের সঙ্গে আলাপ হবার পর যতোই দিন যেতে লাগলো ততই তার মনে হলো আস্তে আস্তে কোনো এক অদৃশ্য শক্তি তাকে যেন অনেক নতুন কাজের ভার চাপিয়ে দিচ্ছে।
বস্তুত, সে না হলে চঞ্চলের দেখাশোনা করবে কে, তাকে তো আর কেউ বুঝতে পারবে না। পিসি যেমন করে তার কথা ভাবেন, যেমন মনে করেন যে সে শুধু ঠকে মরবে, আশ্চর্য চঞ্চলের সম্পর্কে মারিয়ার একে একে ঠিক সেই সব কথা মনে হতে লাগলো।
জীবনে বোধ হয় এই প্রথমবার মনে হলো যে এই পৃথিবীতে তারও কাজ আছে, তারও প্রয়োজন আছে, অন্য আর একজনের জন্যে তাকেও বেঁচে থাকতে হবে। বিয়ের আগে যখন মাঠে পার্কে কিংবা ক্রিস্ট্যাল প্যালেসের বাড়িতে চঞ্চলের সঙ্গে সে আজে-বাজে নানা আলোচনা করেছে তখন তার আশ্চর্য মনের কথা ভেবে কতোবার বিস্ময় জেগেছে মারিয়ার মনে। সে যেন চঞ্চলের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেলো। এও কি সম্ভব? বেঁচে থাকার এতো আনন্দ সে আগে পায় নি কেন। চঞ্চলকে দেখে সে যেন নতুন করে নিজেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলো। সে যেন তার নিশ্চিত নির্ভর।
এতোদিন পর তার মনের সেই দূরদূরান্তে উড়ে-ফেরা শাদা হাঁস সহসা ক্ষণকালের জন্যে বিশ্রামের বিচিত্র রঙের সুগন্ধ ফুলে-ভরা শাখা খুঁজে পেলো। আর মাথা তুলে তাকিয়ে কী দেখলো সে? সেই শাখায় গম্ভীর সমবেদনার দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে তার সঙ্গী। সুদূর দিগন্তে উড়ে যাওয়ার দুর্দাম গতিবেগে কাঁপছে তার ডানা।
উজ্জ্বল আকাশে তখন শুধু দুরন্ত বাতাসের বেগ।

এক মাস পরে

নভেম্বরের আর খুব বেশি দেরি নেই। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ চলেছে। নভেম্বর কুয়াশার মাস। সকালে দুপুরে অপরাহ্ণে সন্ধ্যায় কখন ঘন কুয়াশায় চারপাশ ভরে যায় ঠিক নেই। বাস ট্যাক্সি মোটর চলাচল প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। সংবাদপত্রে নানা দুর্ঘটনার কথা জনসাধারণকে কুয়াশার পথ চলবার সময় আরও সতর্ক করে তোলে। টিউব ছাড়া আর কোনো যানবাহন থাকে না। রাস্তায় লোক-চলাচল কমে যায়। দায়ে পড়ে যাদের ভরা কুয়াশায় ঘরের বার হতে হয় হাতড়ে হাতড়ে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে দুরুদুরু বুকে তারা পথ চলে। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে এবার হঠাৎ একদিন দুপুরে বারোটা-একটার সময় চারিদিক ঘন কুয়াশায় ভরে উঠলো। অন্ধকার হয়ে গেলো। এক হাত দূরের মানুষ চোখে পড়ে না। কয়েকদিন আগে অনেকক্ষণ ধরে ভারী তুষারপাত হয়ে গেছে। কাজেই শীতও পড়েছে খুব। বিচক্ষণ লোকেরা বলাবলি করছে, এখন হয়েছে কি, এতো আগে এমন ঠাণ্ডা লণ্ডনে গত পাঁচ বছরের মধ্যে পড়ে নি, এবার বোঝা যাচ্ছে আর মাসখানেকের পর কী কাণ্ড হবে, জানান দিয়ে শীত আসছে।

এসব কথা শুনে অবশ্য বিচলিত হবার কিছু নেই। প্রত্যেক বার লোকে ঠিক এমন কথা বলে। সামান্য একটু ঘন কুয়াশা হলেই শোনা যায়, দশ বছরের মধ্যে এমন কুয়াশা হয় নি। একটু বেশি তুষার ঝরলে লোকে বলে, এমন বরফ পনেরো বছরের মধ্যে পড়ে নি—শুধু যে লোকের মুখে শোনা যায় তা নয়, এসব কথা বেশ বড়ো বড়ো হরফে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। তাই আজকের কুয়াশা নিয়ে কালকের কাগজে যে লম্বাচওড়া ফিরিস্তি বেরুবে সেকথা সহজেই বিশ্বাস করা যায়।

অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ ইণ্ডিয়া হাউসে বাইরের লোকের ভিড় একটু বেশি হয়েছে। যারা লাঞ্চ খেতে এসেছিলো তারা কুয়াশার জন্যে আটকা পড়ে গেলো।

বাইরে সরকারী কাজ থাকলেও সাহস করে বেরোতে পারলো না। তাই লাউঞ্জের সোফাগুলি ভরে গেছে, ছোটো চেয়ার আর খালি নেই। এর পরেও যারা আটতলার ক্যানটিন থেকে লাঞ্চ খেয়ে বিশ্রামের জন্যে লাউঞ্জে আসছে তারা খবরের কাগজ আর নানা রকম পত্রিকা হাত দিয়ে সরিয়ে মাঝখানের বড়ো টেবিলের উপর বসবার বন্দোবস্ত করে নিচ্ছে আর ঘন ঘন কাচ ভেদ করে দেখছে কুয়াশা কেটে যাচ্ছে কিনা।

এক কোনায় একটি সোফায় গালে হাত দিয়ে বসে আপন মনে অনঙ্গ দাশ কী যেন ভাবছিলো। আজ আর কোনোদিকে সে মন দিতে পারছিলো না। তার মনেও যেন ভরা কুয়াশা নেমেছে। হাতড়ে হাতড়ে কোন দিকে যাবে সে সহজে ভাবতে পারছে না।

সেই গোলমালের পর প্যাট্রিসিয়া অনঙ্গ দাশের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে, সে যেন কোনোদিন তাকে ফিরিয়ে আনবার ব্যর্থ চেষ্টা না করে। প্যাট্রিসিয়া আর কিছুতেই তার সঙ্গে ঘর করবে না। তার মনে স্বামীর জন্যে প্রেম দূরের কথা সামান্য দয়া মায়া মমতা কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। শিগগিরই সে উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করবে। অনঙ্গ দাশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে প্যাট্রিসিয়ার ঘৃণা বোধ হয়।

অনঙ্গ দাশ নিশ্চয়ই এতো কথা শুনে চুপ করে থাকে নি। সে বেশ জোর গলায় প্যাট্রিসিয়াকে জানিয়ে দিয়েছিলো যে অমন স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে তার দায় পড়েছে। সে চলে গেলে বেঁচে যাবে অনঙ্গ দাশ। দেখা যাবে উকিলের বাড়ি আগে কে যায়। যদি এ রাস্তা দিয়ে কোনোদিন প্যাট্রিসিয়া হাঁটে তাহলে অনঙ্গ দাশ এমন কাণ্ড করবে লণ্ডন শহরে যা এর আগে আর কেউ কখনও দেখে নি।

অনঙ্গ দাশ নিজের কথা বেশি ভাবে না। শুধু নিজের কথা কেন, কারুর কথা ভাববার তার সময় নেই। কিন্তু আজ হঠাৎ ক্ষণকালের জন্যে সে যেন আনমনা হয়ে গেলো। প্যাট্রিসিয়ার সঙ্গে তুমুল গোলমাল করলেও একবারও তার মনে হয় নি যে এতোদিন পর সত্যি সে তাকে এমনি করে ছেড়ে যাবে। অনঙ্গ দাশ

নিজের মনে ভালো করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করলো যে সে সত্যিই কি প্যাট্রিসিয়াকে আঘাত করেছে। যে কথাগুলি তাকে রাগের বশে বারবার বলেছে সেগুলি কি সত্যি তার মনের কথা? যতোদিন প্যাট্রিসিয়া কাছে ছিলো ততোদিন তার এসব কথা কখনও মনে হয় নি। যখন সত্যি সে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে তখন সে ভাবলো যে তাকে বুঝিয়ে বলে, আমি কখনও তোমাকে অপমান করি নি প্যাট, আমি যা বলেছি তা আমার মনের কথা নয়, আমি ঝোঁকের মাথায় তোমার সঙ্গে গোলমাল করেছি, তুমি আমায় ক্ষমা করো।

কিন্তু অনঙ্গ দাশ প্যাট্রিসিয়ার চেহারা দেখে আর এসব কথা বলতে পারলো না। স্ত্রীর চেহারা দেখলেই রক্ত গরম হয়ে যায় অনঙ্গ দাশের। মাথার ঠিক থাকে না। কথায় কথায় হঠাৎ রেগে যায়, কেউ নিজের মতে না চললে তাকে অকথ্য গালাগাল করা অনঙ্গ দাশের অভ্যাস। কিন্তু কারুর উপর তার কোনো রাগ নেই। কেউ যদি তার সঙ্গে তর্ক না করে তার মত মেনে নেয় তাহলেই সে খুশী। কিন্তু একথা বোঝাবার মতো স্থির বুদ্ধি অনঙ্গ দাশের নয় যে সেও যদি কারুর সঙ্গে তর্ক না করে তার মত মেনে নেয় তাহলেও কোনো গোলমাল হয় না। সেকথা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। কেন লোকে তার কথা শুনবে, তার মত মানবে, সে কে, কী তার পরিচয়!

প্যাট্রিসিয়া চলে যাবার পর তাই অনঙ্গ দাশের আজকাল প্রায়ই অনুপমার কথা মনে পড়ে। শূন্য বাড়িতে যখন ঘরগুলি হা হা করে, ময়লা জমে ওঠে এপাশে-ওপাশে, যখন আর কারুর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় না ঘরে ঘরে, তখন তার মনে হয় অনেকদিনের সঙ্গিনী অকালমৃত স্ত্রী অনুপমার কথা। ডাক ছেড়ে তার কাঁদতে ইচ্ছে করে। অনু তুমি কোথায়! তোমার জন্যেই তো আজ আমার এই অবস্থা। তোমার জন্যে আমি ঘর ছাড়লাম, দেশ ছাড়লাম, শান্তি পাবার জন্যে আবার ঘর বাঁধলাম—তুমি আমায় ছেড়ে গেলে বলেই তো আমি শেষ অবধি এতো দুঃখ পেলাম। অনু ফিরে এসো! ইণ্ডিয়া হাউসের সোফায় বসে চোখ বুজে আসে অনঙ্গ দাশের।

সতীলক্ষ্মী তার প্রথমা স্ত্রী অনুপমা। আজ তার মূল্য অনঙ্গ দাশের কাছে পরিমাণে বেড়ে গেছে। অতো দরদ দিয়ে তাকে বুঝতে প্যাট্রিসিয়ার জন্ম কেটে যাবে। বাঙালী মেয়ের মতো অতো প্রাণ, অতো স্নেহ, অতো সমবেদনা পৃথিবীর আর কোন মেয়ের আছে! অনুপমার কথা মনে করে চোখে জল জমে ওঠে অনঙ্গ দাশের।

সে জানে প্যাট্রিসিয়া আর কোনোদিনও ফিরবে না। এ স্বামী-স্ত্রীর দুদিনের কলহ নয় যা শরতের লঘু মেঘের মতো বাতাসে ভেসে যায়। আর কেউ না জানুক অনঙ্গ দাশ খুব ভালো করে ইংরেজ মেয়ের মন জানে। একবার চলে গেলে সে আর কিছুতেই ফিরে আসে না। যে প্রেম ভেঙে গেছে তা জোড়া দেবার চেষ্টা করে জোড়াতালি-দেয়া জীবন সে চায় না। অনঙ্গ দাশের মনে হয় যে ইংরেজ মেয়ের কাছে অতীতের কোনো মূল্য নেই। ওরা জীবনের পুরোনো পাতা দুই পায়ে মাড়িয়ে নতুনের অপেক্ষা করে। পুরোনো পাতার মর্মর কান পেতে শোনবার চেষ্টাও করে না কোনোদিন। তাই প্যাট্রিসিয়াকে মনের আসল কথা বলতে গিয়েও বলতে পারে নি অনঙ্গ দাশ। সে জানে আর কিছু ফল হবে না, শুধু নিজেকে ছোটো হতে হবে। প্যাট্রিসিয়া আর ফিরবে না। ইংরেজ নাকি মিথ্যা কথা বলে না। অনঙ্গ দাশ জানে যে সে যাবার সময় যেমন বলে গেছে, কাজেও ঠিক তেমন করবে অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদের মামলা এনে মোটা টাকা আদায় করবে স্বামীর কাছ থেকে। পয়সাকড়ির বেলায় এক চুল এদিক-ওদিক হতে দেবে না ইংরেজ মেয়ে। তখন কী করবে অনঙ্গ দাশ? কোথায় টাকা পাবে। এখন যদি আবার ভারতবর্ষে পালিয়ে যাওয়া যেতো তাহলে বেঁচে যেতো সে। কিন্তু উপায় নেই। বাড়ি বিক্রি করে ফিরে গেলেও এই বয়সে নতুন উদ্যমে ভারতবর্ষে কেমন করে কাজ আরম্ভ করবে সে!

লাঞ্চ খেয়ে গল্প করতে করতে অমল আর চঞ্চল একেবারে অনঙ্গ দাশের কাছে দাঁড়ালো। তারা কেউ ওকে দেখতে পায় নি। কিন্তু ওদের গলা শুনে অনঙ্গ দাশ চোখ খুললো। ব্যস ওদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখে তার নিজেকে নিয়ে যতো ভাবনা চিন্তা যেন নিমেষে উড়ে গেলো।

এই যে অমল দত্ত, দাও দেখি একটা প্লেয়ার্স সিগ্রেট খাই ?

অমল দত্ত তখন প্লেয়ার্স সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে সবে সিগ্রেট ধরাতে যাচ্ছিলো। অনঙ্গ দাশের কথা শুনে নিজে সিগ্রেট ধরিয়ে প্যাকেট দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, সরি, শেষ সিগ্রেট ধরিয়ে নিলাম, আর তো নেই।

বিরক্ত হয়ে অনঙ্গ দাশ উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে অমল দত্তর ফেলে-দেয়া সিগ্রেটের শূন্য প্যাকেট তুলে নিয়ে বললো, তোমার কাছে সব সময় দেখি একটাই থাকে, নতুন আর একটা প্যাকেট কোন পকেটে লুকিয়ে রেখেছো, বের করো।

আরে না সত্যি নেই। কথা বিশ্বাস করেন না কেন ?

তোমাকে যে বিশ্বাস করবে তার বারোটা বেজে যাবে—বুঝেছো ?

চঞ্চল হেসে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু আপনি ওর খালি প্যাকেটটা আবার তুলে আনলেন কেন ?

দেখলাম প্যাকেটটা সত্যি খালি কি না, অমল দত্তর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে অনঙ্গ দাশ বললো, ও যেমন হাড়কিপ্টে, ভাবলাম লোককে দেবার ভয়ে ভরা প্যাকেট দূরে ফেলে দিয়ে ভান করবে যেন খালি প্যাকেট। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে যথাসময়ে তুলে নিয়ে আবার পকেটে পুরবে।

অমল দত্ত রসিকতার স্বরে বললো, কিন্তু তবু দেখুন আপনার হাত থেকে পার পাবার উপায় নেই, ঠিক যাচাই করে তো দেখলেন প্যাকেট সত্যি খালি কিনা।

আমার হাত থেকে পার পাবে তুমি, কতো হাতি গেলো তল না অমল দত্ত বলে কতো জল! তা বাহাদুরি আছে বটে তোমার ছোকরা—একেবারে এদেশের উল্লুকগুলোর মতো হয়ে গেছো।

সে তো অনেকদিন থেকেই হয়েছি—

ঘোড়ার ডিম হয়েছো। শুধু এ বেটাদের মতো পয়সা বাঁচতে শিখেছো, আর কি উন্নতি তোমার হয়েছে বাপু এদেশে এসে ? হ্যাঁ হ্যাঁ আর একটু উন্নতি

হয়েছে বটে মানে রাজ্যের ঝিগুলোকে মাথায় নিয়ে নাচতে শিখেছো। ব্যাস অমল দত্ত একেবারে সাহেবটি।

চঞ্চল বললো, সে তো ভালোই, অমল কাউকে ছোটো করে না, সকলকে সমানভাবে দেখে।

আরে থামাও তোমার সাম্যের গান, অনঙ্গ দাশ পায়ের উপর পা তুলে নড়ে-চড়ে বসে বললো, ছোটো না করলেও একেবারে গাছে তুলে বেটিদের হাঁ বড়ো করে লাভটা কী হয় শুনি? ওই ঝিগুলোরই অসুবিধা হয় শেষে। ইংরেজরা তো ওদের দিকে ফিরেও দেখে না। তবে হ্যাঁ, অমল দত্তর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো অনঙ্গ দাশ, পয়সা তো খরচ করো না বাপু তুমি একটিও, কিন্তু পরপর অতো জোটাও কেমন করে বলো দেখি?

অমল দত্তর আজ মেজাজ ভালো ছিলো। তাই সে উত্তর দিলো, বলে কি শেষে খাল কেটে কুমির নিয়ে আসবো?

তুমি কি ভাবছো আমি জানি না নাকি?

জানেন তো জিজ্ঞেস করছেন কেন?

রাসেল স্কোয়ারের সেই ক্লাব থেকে তো? ওখানে ছাড়া আর তোমার গতি কোথায় হবে। ওটা তো শুনি ঝিয়েদের ক্লাব। চাঁদাও খুব কম, তাই না চঞ্চল?

চঞ্চল অনঙ্গ দাশের কথা শেষ হতে না হতেই তাড়াতাড়ি বললো, হাঁ চাঁদা কম বটে তবে ঝিয়েদের ক্লাব হবে কেন? এ কি বলছেন আপনি! কতো লেখাপড়া-জানা ভদ্র মেয়ে আসে ও ক্লাবে।

অনঙ্গ দাশ মুখে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তাই নাকি? হেঃ, ভদ্র মেয়েরা আর যাবার জায়গা পেলো না। ওহো বুঝেছি, তোমারটি বুঝি ওই ক্লাব থেকে জুটিয়েছিলে?

নাকে মুখে-ধোঁয়া ছেড়ে হেসে অমল দত্ত বললো, হ্যাঁ।

তাই বলো। তাহলে তো বাপু সন্দেহের কথা। ও নির্ঘাত ঝি।

আরে না না—

আর না না, দেখ বাপু আমাকে কিছু বোঝাতে এসো না। তা ওহে অমল দত্ত, নিজে তো বিয়ে-সাদি না করে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছো, চঞ্চলের গলায় পাথর ঝোলাতে গেলে কেন হে ?

অমল দত্ত বললো, মারিয়া কিন্তু সুন্দর ইংরাজি বলে।

তাই নাকি ? কী করে বুঝলে ? তুমি যেন ইংরাজিতে একটা প্রকাণ্ড দিগগজ ! ঠিক বলে কি ভুল বলে তুমি কেমন করে বুঝবে হে ?

আস্তে চঞ্চল বললো, ইংরাজিতে বি এ পাশ করেছে।

বলি ডিগ্রি দেখেছো ? এদেশে এসে সবাই বিদ্যে ফলায়।

হঠাৎ সামনে তাকিয়ে ওরা সকলে একসঙ্গে চুপ করলো। সোমনাথ ব্যানার্জির ছেলে মিলন এসেছে। সুন্দর চেহারা হয়েছে মিলনের। ফর্সা, লম্বা, আশ্চর্য সুন্দর চোখ। গম্ভীর মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। মিলন কিংস্ কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। সে ওদের সকলকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে অভিবাদন জানালো। কিন্তু অনঙ্গ দাশের চোখ এড়ালো না যে দূরে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে মিলনের সঙ্গে এসেছে। অনঙ্গ দাশ জানে যে সেই মেয়েটি কিংস্ কলেজের ছাত্রী নয়, ইণ্ডিয়া হাউসের পিছনে যে ছোটো চায়ের দোকান আছে সেখানকার ওয়েট্রেস। মিলনের রুচি আর সাহস দেখে অনঙ্গ দাশ অবাক হয়ে গেলো। সোমনাথ ব্যানার্জির ছেলের এতো বড়ো সাহস যে রেস্তোরাঁর ঝি সঙ্গে নিয়ে ইণ্ডিয়া হাউসে লাঞ্চ খেতে এসেছে।

চঞ্চল জিজ্ঞেস করলো, বাবা কোথায় মিলন ?

বাবা তো সকালে কারখানায় বেরিয়েছেন।

তাঁর শরীর ভালো আছে এখন ?

খুব ভালো নেই, কী জানি কেন মাঝে মাঝে একেবারে ভেঙে পড়েন।

মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে অনঙ্গ দাশ বললো, এমন গুণধর ছেলে যার সে যে চলে-ফিরে বেড়ায় তাই ঢের।

মিলন বাংলা জানে না। তাই অনঙ্গ দাশের কথা বুঝতে না পেরে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলো, আই বেগ ইওর পার্ডেন ?

সেই মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে অনঙ্গ দাশ জিজ্ঞেস করলো, ওটিকে কোথা থেকে জোটালে ?

একটুও লজ্জা না পেয়ে মিলন উত্তর দিলো, আমার বন্ধু।

কিন্তু ও তো কিংস্ কলেজের ছাত্রী নয়।

না, আপাতত রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেস, ওর নাম অ্যান।

হয়েছে থামো, বিরক্ত হয়ে অনঙ্গ দাশ বললো, আর গুষ্টির পরিচয় দিতে হবে না, তারপর একটু থেমে বাংলায় বললো, যেমন বাপ তেমন বেটা, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।

আচ্ছা আজ আমি আসি, মিলন ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, চলো অ্যান, কুয়াশা একটু কমেছে বোধ হয়, এখন বেরিয়ে পড়তে না পারলে ক্লাসে যেতে দেরি হয়ে যাবে, এই যে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি, আমার বাবার বন্ধু মিঃ দাশ— মিলন একে একে অ্যানের সঙ্গে প্রত্যেকের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললো, ইণ্ডিয়া হাউস দেখবার এর বড়ো ইচ্ছে ছিলো তাই আজ নিয়ে এলাম।

তা বেশ করেছো, ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছো, একেবারে আজব চিড়িয়াখানা, কতো রকম জীব যে আছে এখানে। অনঙ্গ দাশ অ্যানকে জিজ্ঞেস করলো, হ্যালো অ্যান, তোমার দোকান থেকে আজ ফিশ এণ্ড চিপস্ কটা বিক্রি হলো ?

আহাহা, ব্যস্ত হয়ে চঞ্চল বললো, কী যে বলেন। হ্যালো অ্যান, গ্লাড টু মিট ইউ। হাউ ডু ইউ ডু।

অ্যান হাত বাড়িয়ে বললো, হাউ ডু ইউ ডু।

আচ্ছা আবাব আর একদিন আলাপ হবে, গুড ডে, অ্যানের হাত ধরে সকলের সামনে দিয়ে মিলন আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলো।

তারা বেরিয়ে যেতেই অমল দত্ত অনঙ্গ দাশের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, আপনি আবার ফিশ এণ্ড চিপসের কথা তুলতে গেলেন কেন ?

তা ওয়েট্রেসের সঙ্গে কী গল্প করবো ? ফিলসফি, ইকনমিক, পলিটিক্স না ইণ্টারচেঞ্জ অব কালচার ? মিলন যখন আলাপ করিয়ে দিলো তখন যাকে

যেমন বলা দরকার তেমন বললাম। তোমাদের আবার বাড়াবাড়ি, বেশ করেছি ফিশ এণ্ড চিপসের কথা তুলেছি।

চঞ্চল বললো, মেয়েটির হয়তো লেখাপড়ায় মন আছে কিন্তু দৈবতুর্বিপাকে বাধ্য হয়ে ওয়েট্রেসের কাজ করতে হচ্ছে—

অনঙ্গ দাশ প্রায় চিৎকার করে উঠলো, থামো থামো, তুমি আবার দেখছি আর এক কাঠি, ওয়েট্রেসের মধ্যে ম্যাডাম কুরি খুঁজছো। ঝি ছাড়া ইণ্ডিয়ানের কপালে অন্য কোনো মেয়েমানুষ এখানে বড়ো একটা জোটে না। তু-একটা শুধু ব্যতিক্রম। তা দেখালে বটে সোমনাথ ব্যানার্জির পোলা। একেবারে বাপ কা বেটা। দিনের আলোয় ইণ্ডিয়া হাউসে এসে ঝি বেটির হাত ধরে ঠাট্টা-তামাসা করে বেরিয়ে গেলো। বয়সের কালে বাপটিও ছিলো ঠিক এমনি। এখন গোমড়া মুখে গোঁজ হয়ে বসে বলে, কালচারের জন্যে থেকে গেলাম। মেয়েমানুষের কালচার আর কি। কালচারের ফল, ছেলেটি এবার আর-এক ধাপ এগিয়ে গেলো। এদেশে ইণ্ডিয়ানের মানসম্ভ্রম আর কিছু রাখতে দেবে না বাপ-বেটায়।

যাক গে, আপনার কথা বলুন, কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে অমল দত্ত বললো, মিসেস দাশ কেমন আছেন ?

কে জানে, একটু উসখুস করে অনঙ্গ দাশ বললো, বাড়ি থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি।

সে কি ! আশ্চর্য হয়ে চঞ্চল বললো, শুনেছি তিনি নাকি লেখাপড়া-জানা চমৎকার ভদ্রমহিলা ?

ওসব ওদের ভোল, বুঝলে ? ঘর করো আরও কিছুদিন শাদা মেয়ের সঙ্গে, তখন বুঝতে পারবে।

অমল দত্ত বললো, মারিয়া কিন্তু মরে গেলেও চঞ্চলকে ছাড়বে না।

নাঃ, ছাড়বে না ? একেবারে সতীলক্ষ্মী কুলবধূর মতো চিরকাল ঘর করবে। কিছু না বুঝে না দেখে তুদিনেই বেশ ফটফট করতে শিখেছো দেখছি। কিছুদিন পর যখন মোহ কেটে যাবে তখন দেখবে ওই মারিয়া একেবারে চঞ্চলের মুখে

লাথি মেরে সরে পড়বে। প্রথম প্রথম ওদের প্রেম করবার ছলাকলা দেখে মনে হয়, আহা এমন আর হয় না।

আস্তে আস্তে চঞ্চল বললো, কিন্তু আরও তো অনেক এখানে আছেন, এদেশে বিয়ে করে যাঁরা সুখী হয়েছেন আর অনেকের কথা শুনেছি, একেবারে পঙ্গু হয়ে যাবার পরও এদেশের স্ত্রী তাঁদের ছেড়ে যান নি।

তোমাকে যিনি এসব কথা বলেছেন, খোঁজ নিয়ে দেখো তাঁর নিজের স্ত্রী অনেক আগে সরে পড়েছে। যতো বাজে কথা শোনো তোমরা! এদেশে বিয়ে করে একটি লোকও সুখী হয় না—হতে পারে না! শোনো চঞ্চল, শুনতে খারাপ লাগলেও আমি তোমাকে আজ স্পষ্ট কথা বলছি, এদেশের মেয়েদের সঙ্গে, এদেশের মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনোদিন মনের মিল হতে পারে না—অসম্ভব! আমাদের দেশের লোক একেবারে অন্য ধাতুতে গড়া। এদেশের মেয়ে বিয়ে করে যারা মানিয়ে নিয়ে ঘর করে তাদের প্রাণ বলে কিছু নেই—

অমল দত্ত বললো, কিন্তু আপনি নিজে তো এতো বছর ঘর করলেন।

তাই আমাদের চেয়ে বড়ো হতভাগা আর কেউ নেই, অমল দত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে অনঙ্গ দাশ বললো, যতোদিন ঘর করেছি ততোদিন শুধু জলে-পুড়ে মরেছি। যারা বলে তারা সুখী তারা মিথ্যাবাদী। এখানে বিয়ে করে কিছুতেই সুখী হওয়া যায় না। এরা ভারতবর্ষের লোকের মন কোনোদিন বুঝতে পারবে না। দশ বছর পর ছেলে ফিরে এলে আমাদের দেশে মা তাকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেলে। সে চোখের জলের উৎসের সন্ধান এরা কোনোদিনও পাবে?

চঞ্চল বললো, তারাই বা শুধু আমাদের কথা ভাববে কেন? আমাদেরও তো তাদের কথা ভাবা উচিত। আমাদের বিয়ে করে তারাও তো অনেক ত্যাগ করেছে।

ঘোড়ার ডিম করেছে। তারা বেঁচে গেছে। কার্পেট তুলে যেখানে ঘর পরিষ্কার করতে হতো সেখানে তারা ইণ্ডিয়ানের মাথায় চড়ে ড্যাঙড্যাঙ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইণ্ডিয়া হাউস থেকে একে একে লোক বেরুতে আরম্ভ করেছে।

বাইরে কুয়াশা একটু কমেছে যেন। লাউঞ্জ প্রায় খালি হয়ে গেলো। অমল দত্ত অনঙ্গ দাশকে এড়াবার জন্যে ছুতো করে সিগ্রেট কিনতে বেরিয়ে গেলো। সেখানে রইলো শুধু চঞ্চল আর অনঙ্গ দাশ। আর কয়েকজন অবাঙালী আগন্তুক একমনে কাগজ পড়ছে।

চঞ্চল একটু ইতস্তত করলো তারপর হঠাৎ একসময় অনঙ্গ দাশকে বললো, আপনি আমার গুরুজন, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তাই কতকগুলো কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। যদি কিছু মনে না করেন, যদি অভয় দেন তো বলি?

এই রে, অনঙ্গ দাশ চঞ্চলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, অতো ভূমিকা কিসের বাপু হে? টাকাপয়সা ধার চাইবার আগে এখানে লোকে ওসব বাঁধা বুলি গড়গড় করে বলে যায়—তা তোমার পয়সাকড়ি চাই না তো?

না-না, আমি অন্য কথা বলছিলাম।

তাহলে নির্ভয়ে বলো। পয়সাকড়ির বেলায় কিন্তু আমার কাছে সুবিধা হবে না বলে দিলাম। আমার এখন ধূম-ধাড়াক্কা করে মামলা চলবে। কতো খেসারত দিতে হয় কে জানে।

চঞ্চল হেসে বললো, না পয়সাকড়ি আমার দরকার নেই।

আহা আজ না হয় দরকার নেই, কিন্তু কাল দরকার হবে। এদেশে যারা বিয়ে করেছে তাদের সকলের জন্যে ছক কাটা আছে, তার বাইরে যাবার উপায় নেই। সুখে থাকতে তোমাদের সকলকে যেন ভূতে কিলোয়। এখন আস্তে আস্তে বুঝবে কতো ধানে কতো চাল। পয়সা যতোদিন আছে ততোদিন মেমসাব আছে কিন্তু পয়সা থাকবে কোত্থেকে তোমার? বাপ টাকা পাঠানো বন্ধ করেছে, কাজেই বাধ্য হয়ে পড়াশুনা বন্ধ করতেই হবে। এখন অগতির গতি ভবন এই ইণ্ডিয়া হাউস ভরসা। কিন্তু তাতে কী হবে তোমাদের? আর এদেশের সতী-সাবিত্রীরা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে স্বামীর দুখে দুখিনীর দিন কাটাবে না। অন্য লোক জোগাড় করে সাধ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করবে। তা থাকগে, হ্যাঁ, তুমি কী বলছিলে বাক্য-বাগীশের মতো অতো লম্বা-চওড়া ভূমিকা করে?

চঞ্চল যা জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিলো অনঙ্গ দাশের কথা শুনতে শুনতে তা গোলমাল হয়ে গেছে। এখন ও সহজে ভেবে পেলো না প্রথমে কী কথা দিয়ে আরম্ভ করবে।

তবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি যে একটু আগে বললেন মামলা চলবে—কিসের মামলা ?

ওই মেমসাহেবের মামলা—বুঝলে ?

আপনি কি মিসেস দাশের কথা বলছেন ?

আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখন আর তিনি মিসেস দাশ নন—মিস্ ওয়াটসন। রঙ্গ কতো ! এতো বছর ঘর করে আবার মিস হলেন। যাক না দুদিন তারপর দেখবে আর একটাকে জুটিয়ে আবার মিসেস অমুক কি তমুক হয়েছেন।

থেমে থেমে চঞ্চল বললো, আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো। যদি কিছু অন্যায় কথা বলি ক্ষমা করবেন—

বড়ো প্যান-প্যান করছো সেই থেকে—আরে কী বলবে বলো না ছাই ?

মামলা কে করবেন ? আপনি না তিনি ?

তিনি নিশ্চয়ই, আমি কেন শুধু শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাবো ? তবে হ্যাঁ, এখন যেমন ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, যতো তাড়াতাড়ি হয় একেবারে শেষ করে দেয়া ভালো।

কিন্তু এতোদিনের সম্পর্ক শেষ করে দেয়া কি সহজ ?

সেকথা বুঝবে কে বলো চঞ্চল ? কাকে বোঝাবে তুমি ? আর তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে না পারলে কেউই শান্তি পাবে না, উল্টে কার কি দেনার দায় ঘাড়ে এসে পড়ে বলা যায় না। তখন যার সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি নেই তার জন্যে শুধু শুধু ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে জেলে যেতে হবে।

মাপ করবেন, চঞ্চল দুঃখিত হয়ে বললো, আমার মনে হয় আপনি একটু বেশি ভাবছেন, মিসেস দাশ আপনার স্ত্রী, ভদ্রলোকের লেখাপড়া-জানা মেয়ে, তিনি কখনও অকারণে আপনাকে কোনো বিপদে ফেলতে পারেন না। আমার মনে হয় শিগগিরই আপনাদের মিটমাট হয়ে যাবে।

চঞ্চল বোধহয় জীবনে প্রথমবার অনঙ্গ দাশকে গম্ভীর হতে দেখলো। সে দু-এক মিনিট চঞ্চলের কথার উত্তরে কোনো কথা না বলে চুপ করে বসে রইলো। তারপর গাল হাত দিয়ে বললো, না চঞ্চল, আর জীবনে মিটমাট হবে না। এদেশে একবার সম্পর্ক ভেঙে গেলে আর কিছুতেই জোড়া দেয়া যায় না। এদেশের মেয়েরা পেছনে তাকায় না, নিজের সুখ-সুবিধার কথা ছাড়া অন্য কারুর কথা ভাবে না। আমাদের দেশের জলহাওয়া অন্য রকম বলে আমরা শুধু ভেবে মরি কিন্তু এরা তা করে না। তাই যখন ভাঙতে শুরু করে তখন সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে দেওয়া ভালো, তা না হলে শুধু নিজেকে কষ্ট পেতে হয়।

চঞ্চল বললো, কিন্তু আপনাদের সম্পর্ক যে ভাঙতে শুরু করেছে সেকথা ভাবছেন কেন?

একথা শুনে হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলো অনঙ্গ দাশ। দুহাত নেড়ে চিৎকার করে বললো, তা না হলে কি বুড়ো বয়সে দুজনে এ-বাড়ি ও-বাড়ি বাস করে লুকোচুরি খেলছি?

তিনি কোথায় আছেন এখন?

কে জানে কোথায় ফ্ল্যাট নিয়েছে।

চাকরি করছেন নাকি কোথায়?

হ্যাঁরে বাপু, সেই চাকরিই তো কাল হলো।

দয়া করে মিসেস দাশের ঠিকানা আমায় দেবেন?

কেন? আমার হয়ে ওকালতি করতে যাবে নাকি?

ওকালতি করতে নয়, আমরা দুজনে গিয়ে একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসবো।

দেখো চঞ্চল, সেদিন এলে এদেশে, এর মধ্যেই দেখছি সবজান্তা হয়ে গেছো। খবরদার ওসব পাকামি করে বাহাদুরি করতে যেও না।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে একজন কেউ বুঝিয়ে বললে সহজেই আপনাদের গোলমাল মিটে যাবে।

না না না, যাবে না। যে বিষয় জানো না তা নিয়ে কথা বলতে যেও না। এখানে এমন গোলমাল ঘরে ঘরে হয় কিন্তু আমাদের দেশের মতো মিটে যায় না। একেবারে শেষ করে দিয়ে যায় আবার নতুন করে জীবন তৈরি করে। কেউ বিষ খায় না কিংবা মাতাল হয়ে বিরহের জ্বালা ভোলবার চেষ্টা করে না। পনেরো-ষোলো বছর ঘর করবার পর হঠাৎ একদিন সামান্য ঝগড়ায় ঘর ভেঙে যায়, কেউ জোড়া লাগাবার চেষ্টা করে না।

আমি কিন্তু মিসেস দাশের কথা ভাবছি না, আপনার কথা ভাবছি। এই বয়সে আপনি এখন কী করবেন ? আপনার তো এদেশে আর কেউ নেই, আপনার দেখাশুনা করবে কে ?

তা তুমি কি মনে করো কেউ দেখাশুনো করবার নেই বলে আমি কাছা খুলে প্যাট্রিসিয়ার পেছনে ছুটতে ছুটতে ডুকরে কেঁদে বলবো, ওগো ফিরে এসো, আমার কেউ নেই—অ্যাঁ ? আর সেকথা শুনে সতীলক্ষ্মী বাঙালী মেয়ের মতো সব ভুলে তিনি আলুথালু চুলে দৌড়ে এসে আমার সেবা করতে লেগে যাবেন ?

চঞ্চল বেশ জোর দিয়ে বললো, আপনি তেমন করে ডাকলে তিনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন।

নতুন শাদা মেয়ে বিয়ে করেছো কিনা তাই একেবারে রসে ডগমগ হয়ে আছো —ওদের ফষ্টিনষ্টি দেখে মূর্ছা গেছো আর কি! মোহ কেটে গেলে যখন ধাক্কা খাবে তখন এসব লম্বা চওড়া কথা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। আরে এসো এসো এই যে, সোমনাথকে দেখে অনঙ্গ দাশ জোরে বললো, খাসা ছেলেটি তৈরি করেছো বাঁড়ুজ্যে, একেবারে নাকের উপর উড়ন-তুবড়ি মেরে বেরিয়ে গেলো—

অনঙ্গ দাশের পাশে আর একটি চেয়ারে বসে সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার ? আমার ছেলের আবার কী হলো ?

না, হবে আবার কী, হি হি করে হেসে অনঙ্গ দাশ বললো, এদেশে সব ইণ্ডিয়ানদের অমন মরণদশা হয়। মানে তোমার ছেলেটি দিনের আলোয় ওই

পাশের রেস্তোঁরায় ঝিয়ের গলা জড়িয়ে এখানে লাঞ্চ খেতে এসেছিলো। আমরা সকলে মধুর মিলনের দৃশ্য দেখলাম আর কি।
গম্ভীর হয়ে সোমনাথ শুধু বললো, ও।
ও আবার কী? এবার বিয়ের ব্যবস্থা করো। খাঁটি মেমসাহেবের শ্বশুর হবে তুমি। আমাদের কী বন্ধুভাগ্য!
সে কথার উত্তর না দিয়ে সোমনাথ চঞ্চলের দিকে তাকিয়ে বললো, কেমন আছো চঞ্চল?
ভালো; আপনি?
এই আর কি, তা তোমার পড়াশুনো কেমন হচ্ছে?
অসুবিধা হচ্ছে বেশ, তবু চালিয়ে যাচ্ছি।
নতুন কিছু লিখতে আরম্ভ করেছো নাকি?
এখনো করি নি, শিগগিরই একটা বড়ো উপন্যাস আরম্ভ করবো ভাবছি।
বাঃ বেশ, সময় হলে আমাকে পড়ে শুনিও।
নিশ্চয়ই।
অনঙ্গ দাশ এসব কথায় বিশেষ রস পেলো না। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তা এই ইণ্ডিয়া হাউস নিয়ে একটা মহাকাব্য লেখো তো দেখি, এতো রকম মাল-মশলা তুমি আর ভূ-ভারতে কোথাও পাবে না।
চঞ্চল হেসে বললো, তাই লিখবো বোধহয়, অনঙ্গ দাশ চলে যাবার পর সোমনাথের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে থেকে চঞ্চল বললো, একটা খারাপ খবর আছে, শুনেছেন কি না জানি না—
ব্যস্ত হয়ে সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, কী খারাপ খবর চঞ্চল?
মিস্টার দাশের সঙ্গে তার স্ত্রীর—
হেসে বাধা দিয়ে সোমনাথ বললো, তাই বলো। আমি ভাবলাম কী না কী খারাপ খবর শুনবো। এ তো একটা খবরই নয়।
কিন্তু এখন একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে না? এই বয়সে দুজনেই শুধু শুধু কষ্ট পাবেন।

উপায় নেই চঞ্চল। তোমার বয়স অল্প বলে আজ সমবেদনার এতো কথা তোমার মনে হচ্ছে, কিন্তু তুমি যখন আরও বড়ো হবে তখন দেখবে এমন বিচ্ছেদে অশান্তি নেই, আমার মনে হয় শান্তি আছে।

বুঝতে পারলাম না একথা আপনি কেন বলছেন ?

কারণ আমি অনঙ্গ দাশকে যতদূর জানি তাতে মনে হয় ইংরেজ স্ত্রী কেন, যে কোনো দেশের মেয়ের পক্ষে তার সঙ্গে ঘর করা সম্ভব নয়।

কেন ?

ওর স্বভাবের জন্যে। দেখতে পাও না দিনরাত্তির শুধু লোকের ত্রুটি ধরবার জন্য বসে থাকে আর গালাগালি করবার জন্যে ছটফট করে ?

কিন্তু সব সময়ে তো উনি ভুল বলেন না।

না বলুক কিন্তু অকারণে সব কথা স্পষ্ট বলবার দরকার কি ? আর দেশে যখন তুমি কিছুতেই থাকতে পারলে না, এদেশে যখন বাধ্য হয়ে থাকতে হলো তখন এদেশের জন্যে কিছু সহানুভূতি থাকা দরকার বৈকি ?

তা তো নিশ্চয়ই।

আমাদের কতো অসুবিধা হয় এদেশে কিন্তু আমরা সেকথা মুখে প্রকাশ করি না কেননা এখান থেকে যা পেয়েছি তার কাছে সামান্য অসুবিধা তুচ্ছ হয়ে গেছে। তাই সে কথা আমাদের মনে থাকে না। অন্য দেশের নিয়মকানুন আলাদা। তাই যারা সেদেশে রয়ে গেলো তাদের উচিত সে-নিয়ম মেনে নেয়া। তোমার জন্যে এদেশের নিয়মকানুন বদলে যাবে না, মানিয়ে নিতে না পারলে তোমার উচিত এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া। এদেশে থাকবো অথচ নিয়ম মানবো না, শুধু গোলমাল করে দিন কাটাবো এমন করলে অশান্তি ছাড়া আর কি পাওয়া যায় বলো ?

তা তো ঠিক।

আমি একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার যদি এদেশে এতো খারাপ লাগে তাহলে এখানে বিয়েই বা করলে কেন আর থেকেই বা গেলে কেন। তা কী উত্তর দিলো জানো ?

কী ?

বললো, বিয়ে করলাম এদের হাঁড়ির খবর জানবার জন্যে আর থেকে গেলাম বেটাদের গালাগাল করবার জন্যে। সোমনাথ ব্যানার্জি হেসে বললো, শুধু গালাগাল করবার জন্যে যে লোক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বিয়ে করে বাস করতেও দ্বিধা করে না তার মুখ তুমি কেমন করে বন্ধ করবে !

চঞ্চল সোমনাথ ব্যানার্জির কথার কোনো উত্তর দিলো না। সে তখন একমনে অনঙ্গ দাশের কথা ভাবছিলো। তার উপর চঞ্চলের কেমন যেন একটু দুর্বলতা আছে। চঞ্চলের সাহিত্যিক মন অনঙ্গ দাশের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে একটি দুরন্ত অবাধ্য শিশুকে যে কারুর বারণ শোনে না, শাসন মানে না। এমন কি যে মাঝে মাঝে নিজের ভালো বুঝতে না পেরে নিজেকেই কঠিন আঘাত করে। বস্তুত, সংসারে লোক বড়ো বেশি হিসেব করে চলে। সুদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানের প্রতিপদক্ষেপ ভারি করে তোলে সতর্কতার শৃঙ্খলে। অনঙ্গ দাশ যেন তাদের ব্যতিক্রম। চঞ্চল জানে এমন লোকের জীবন অভাবে-অশান্তিতে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, শেষ বয়সে হয়তো নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গাছতলায় ধুঁকতে ধুঁকতে শেষ হয়ে যায়। যতোদিন বেঁচে থাকে ততোদিন খুব কম লোকের সমবেদনা পায় তারা। বাপ আশা রাখে না, স্ত্রী আস্থা হারায়, বন্ধুরা বিশ্বাস করে না। বিদ্রোহের চাপা আগুন সব সময় মনে থাকে বলে সাধারণের সঙ্গে নিরন্তর তাদের মতদ্বৈধ। ফলে তাদের পক্ষে সব জায়গায় নিজেদের মানিয়ে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনঙ্গ দাশ সেই পর্যায়ের লোক। চঞ্চল জানে যে সংসারে এদের প্রয়োজন খুব বেশি নেই। এরা কাউকে সুখী করতে পারে না, নিজেরাও সুখ পায় না। তবু শতকরা নিরানব্বই জন মেয়ের আত্মত্যাগ এমন লোকের জন্যেই, অনেক শিল্পীর কাছে এরা অমূল্য।

এমনি অনেক কথা ভাবতে এক সময় চঞ্চল বললো, আপনি তার অনেক দিনের বন্ধু, আমার মনে হয় আপনি দুজনকে একটু বুঝিয়ে বললে এই বয়সে স্বামী-স্ত্রীর গোলমাল মিটে যায়।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সোমনাথ বললো, তোমার কথা হয়তো ঠিক হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় বাইরের কেউ এ ব্যাপারে কিছু করতে পারবে না।

কারণ ওরা কেউই ছেলেমানুষ নয়। নিজেরা যদি নিজেদের বোঝাতে না পারে তাহলে—কথা শেষ না করে সোমনাথ ব্যানার্জি চঞ্চলের দিকে চার্চম্যান নম্বর ওয়ানের প্যাকেট এগিয়ে দিলো।

চঞ্চল সিগ্রেট ধরিয়ে কী বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তাকে কথা বলবার অবসর না দিয়ে সোমনাথ ব্যানার্জি বললো, আড়াইটা বাজে প্রায়, আমার একটা জরুরী কাজ আছে পোস্ট অফিসে, আমি আজ যাই, তোমার সঙ্গে আবার পরে কথা হবে। বাবার চিঠি পেয়েছো নাকি?

না। বাবা আর আমাকে চিঠি লিখবেন না।

দূর তাও কি হয়, শিগগিরই সব ঠিক হয়ে যাবে। মন শক্ত করে সামনে এগিয়ে যাও। ঝড়-ঝাপটা না থাকলে জীবনে আর থাকলো কী, সোমনাথ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বেরিয়ে গেলো।

সোমনাথ যেকথা বলে গেলো সেকথা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। ঝড়-ঝাপটা থাক বা না থাক ছকেফেলা জীবন চঞ্চলের জন্যে নয়। বাপের কঠিন শাসনে থাকলেও সব সময় সে ছুটে যেতে চেয়েছে ঝড়ে সমুদ্রে অরণ্যে পর্বতে। সে স্বপ্ন দেখেছে অপরিচিত পরিবেশে অসংখ্য মানুষের। নিজের কথা সে ভাবে নি কোনোদিন। জমি, বাড়ি আর সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে যৌবনের দিনগুলি ভারাক্রান্ত করে তোলে নি। বাবা যখন তার উপর নানা আশা করতেন আর কেমন করে অর্থ বাড়িয়ে সম্পত্তি আগলে রাখতে হয়—এই সব বিষয়ে তাকে উপদেশ দিতেন তখন চঞ্চল ঠিক বুঝতে পারতো না কেমন করে বৈষয়িক ব্যাপার মানুষকে এতো বেশি আচ্ছন্ন করে। আর সে নিশ্চিত জানতো যে জীবনে যদি কোনোদিন দারুণ দুঃসময় আসে তাহলেও বৈষয়িক ব্যাপার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলো বলে ক্ষণকালের জন্যেও তার অনুতাপ হবে না। এতোদিন অবশ্য চঞ্চলের এসব কথা ভেবে দেখবার সময় আসে নি। জীবনে যখন অর্থাভাব হবে তখন ভাবনা-চিন্তায় তার মন ক্ষত-বিক্ষত হবে কিনা, সংসারের নানা দাবি তার সাহিত্যিক মনে রেখাপাত করবে কিনা—এ ভাবনাকে প্রাধান্য দেবার অবসর এর আগে চঞ্চলের আর কখনও

হয় নি। তবে তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো যে দারিদ্র্য যতো কঠোর হোক না কেন তার জীবনকে কিছুতেই কোনো বিশেষ ছকে ফেলতে পারবে না। অর্থাৎ তার মনের কোমলতা, প্রসার আর ব্যাপক আদর্শ কোনোদিনও কোনো কারণেই নিঃশেষে হরণ করতে পারবে না।

কিন্তু আজ নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার সময় এসেছে চঞ্চলের। হয়তো এমনি কঠিন পরীক্ষা প্রত্যেক শিল্পীর জীবনে আসে। আর যারা অক্ষম, অভাবের আক্রমণে তারা দিশাহারা হয়ে পড়ে। তাদের শিল্পীমন মরে যায়। এমন শিল্পীদের চঞ্চল মনে মনে খুব বড়ো স্থান দেয় না। এরা কেবলই নানা অজুহাতে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করে। চঞ্চলের অনেক বন্ধুবান্ধব আছে যারা একদিন প্রচুর উৎসাহ নিয়ে সাহিত্য করতে শুরু করেছিলো। কিন্তু সংসারে প্রবেশ করার কিছুদিনের মধ্যেই দায়িত্বের নানা বোঝার চাপে তারা যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলো। চঞ্চল তাদের প্রশ্ন করলে তারা উত্তর দিতো, কী করবো ভাই, এখন অনেক কাজ, লেখবার সময় কিছুতেই করে উঠতে পারি না—এমনি অনেক কথা। আজ নিজে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চঞ্চল ভাবে, এই ধরনের মানুষকে হয়তো শিল্পী বলা ভুল। যে সত্যিকার শিল্পী, হাজার কাজের মধ্যে থাকলেও কখনও তার সাধনার ব্যাঘাত হয় না। আমরা যখন যেখানেই থাকি না কেন, নিয়মিত যেমন স্নান-খাওয়ার সময় করে নিই, শিল্পীও তেমনি দিশাহারা ব্যস্ততার মাঝেও নিজেকে প্রকাশ করার সময় করে নেয়। পৃথিবীর কোনো শক্তি তার মনকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। যাদের পারে তারা অক্ষম, তারা এতোদিন নিজেদের শিল্পী বলে পরিচয় দিয়ে মানুষকে প্রতারণা করে এসেছে, নিজেদেরও নানাভাবে বঞ্চিত করে এসেছে। যতো সময় তারা শিল্পসাধনার ভান করে নষ্ট করে এসেছে ততো সময় অন্য কাজে লাগালে বোধহয় জীবনে আরও বেশি উন্নতি করে সুখে বাস করতে পারতো। যাকে সংগ্রাম করতে হয় না সে কোনোদিনও বড়ো লেখক হতে পারে না। চঞ্চল থেকে থেকে মনে মনে অনুযোগ করে যে কেন চব্বিশ ঘণ্টা সে বসে বসে লিখতে পারে না। কেন তাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়া হাউসে কাজ করতে হয়। এ কাজ তো

যে কোনো কেউ করতে পারে। কিন্তু তার নিজের আসল কাজ তো তার হয়ে অন্য কেউ করে দিতে পারে না। মারিয়াকে একথা জিজ্ঞেস করলে সে উত্তরে চঞ্চলকে বলে, শুধু তোমার একার ক্ষেত্রে এমন নয়, পৃথিবীর সব কবি, লেখক আর শিল্পীকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে অনেক বাজে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু সে কাজ যারা বাজে বলে অনুযোগ না করে মন দিয়ে করবার চেষ্টা করেছে আর তার পাশে আর যারা সে-কাজ করছে তাদের মন জানবার চেষ্টা করেছে, দেখা গেছে পরবর্তী জীবনে সেই সব দিনের কথাই শিল্পীর সৃষ্টিতে ফুলে হয়ে ফুটে উঠেছে। অল্প আরামে ঘরে বসে যারা লেখবার চেষ্টা করে তারা হয়তো লেখক কিন্তু তাদের জীবনের পরিধি বিস্তৃত নয় বলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাদের প্রতিভা শেষ হয়ে যায়। জীবনের তারা কতোটুকু জানে। অনুকূল আবহাওয়ায় সকলেই নিশ্চিন্ত হয়ে লিখতে পারে কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় ভাঙাঘরে বসে যে মাথা ঠাণ্ডা করে কলম চালিয়ে যেতে পারে সেই হলো লেখক, সেই হলো শিল্পী। এসব কথা চঞ্চল জানে। এমন কথা সে নিজে অনেকবার ভেবে দেখেছে। বাবার কাছ থেকে বার বার বাধা পেয়ে এতোদিন সে বড়ো বেশি ভীতু হয়ে গিয়েছিলো। কেউ সামনে এসে বসলে লিখতে পারতো না। লেখবার সময় হঠাৎ কেউ ঘরে এসে পড়লে চমকে উঠে কাগজ থেকে কলম তুলে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। নিজে যে লেখে সেকথা সাহস করে কাউকে বলতে পারতো না। কিন্তু মারিয়াকে বিয়ে করবার খুব অল্পদিনের মধ্যেই তার ভয় ভেঙে গেলো। সে যেন তাকে জোর করে বুঝিয়ে দিলো যে বিশাল এই পৃথিবীতে লেখা ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই—সে যেন অন্য কোনো কাজ করবার চেষ্টা করে নিজের আর সময় নষ্ট না করে। দায়ে পড়ে তাকে যেসব কাজ করতে হয়েছে বা হচ্ছে তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই কারণ তা করতে হচ্ছে বলেই তার অভিজ্ঞতা বাড়ছে, মানুষের অনেক রূপ দেখবার সুযোগ হচ্ছে। আর সে নিজে লেখক বলে তাকে সব কাজ করবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে কেন না সব রকম চরিত্র নিয়ে সাহিত্যিকের করবার।

মারিয়ার কথা শুনতে শুনতে চঞ্চলের মনে যেন নতুন আলো জ্বলে উঠলো। এমন করে এর আগে সে নিজেকে আর কোনোদিনও দেখতে পায় নি। তার মনে হলো আর কেউ তার পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারবে না, আর কোনো বাধা তাকে নিরুৎসাহ করতে পারবে না। সব কিছু তুচ্ছ করে সে লেখার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবেই। নিজের কলমের উপর তার যেন বড়ো বেশি বিশ্বাস এসে গেলো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হলো যখন নতুন লেখার কল্পনায় তার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ জাগছে, পৃথিবীকে দেখছে সে সমবেদনার গভীর দৃষ্টিতে, যখন মনপ্রাণ সঁপে দিচ্ছে জীবনের বিচিত্র সঙ্গীতের উত্তাল কম্পনে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে যেন একটি একটি করে স্বাচ্ছন্দ্যের তার ছিঁড়ে যেতে লাগলো। বাবা আর টাকা পাঠান না, কোনো-দিনও পাঠাবেন না। চঞ্চল যা মাইনে পায় তাতে কোনোরকমে দুজনের সংসার চলে বটে কিন্তু একচুল এদিক-ওদিক হলে, একটু অসাবধান হলে আর দিন চলবে না! ওদিকে মারিয়ার সেই ইস্কুলের চাকরি হয় নি। মিস ডিকিনসন রীতিমতো অপমানজনক ব্যবহার করেছেন। তিনি মারিয়াকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে সে এখন ইণ্ডিয়ানের বউ। কাজেই তাঁর ইস্কুলে তাকে চাকরি দিলে কর্তৃপক্ষ নানারকম কথা তুলতে পারেন। কেন না ফ্রান্স থেকে এখন লেখাপড়া-জানা মেয়ে দলে দলে ইংল্যাণ্ডে আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাদের বাদ দিয়ে মারিয়াকে চাকরি দেয়া অন্যায় হবে। ইংল্যাণ্ড আগে ফ্রান্সকে সাহায্য করবে, পরে ভারতবর্ষকে। কাজেই মারিয়া সেই ইস্কুলে আর বৃথা চাকরির চেষ্টা না করে যেন ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরির চেষ্টা করে। চঞ্চলকে অনেক বুঝিয়ে ইণ্ডিয়া হাউসেও চাকরির চেষ্টা মারিয়া করেছে। অবশেষে চঞ্চলও তার জন্যে চেষ্টা করতে বাকি রাখে নি। কিন্তু সেখানেও শেষ অবধি মারিয়ার চাকরি করবার সুযোগ হলো না। একেবারে আসল কারণ জানতে না পারলেও চঞ্চল শুনেছে যে তার বাবা নাকি হাইকমিশনারকে সমস্ত কথা লিখেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে তার

ভালো হোক মন্দ হোক, সে খেতে না পাক্ কি মেতে থাক—কোনো খবর যেন তাঁকে কোনো-দিনও জানানো না হয় কারণ তিনি ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন এবং কানাকড়ি দিয়েও আর সাহায্য করবেন না। হয়তো আর একটু হলেই চঞ্চলের নিজের চাকরি চলে যেতে পারতো। কিন্তু সে মনের প্রচণ্ড তেজ নিয়ে স্বপক্ষে যুদ্ধ করেছে। তাই কমিশনারকে সটান বলেছে যে আপিসের কাজে তার কোনো ত্রুটি হয় নি, কোনো অন্যায় কাজ করে ভারতবর্ষের দুর্নামও সে করে নি, সব দিক বিবেচনা করে সে বিয়ে করেছে। এর জন্যে তার বাবা তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। চঞ্চলও বাবার সঙ্গে তর্ক করবে না কিংবা তাঁকে যুক্তি দিয়ে নানাকথা বুঝিয়ে তাঁর দয়া ভিক্ষা করবার চেষ্টা করবে না। কেন না সাধারণ মানুষ হিসাবে তিনি তাঁর খুশিমতো চলতে পারেন। কিন্তু কোনো সরকারী আপিস যদি এই কারণে চঞ্চলকে বরখাস্ত করে তাহলে সে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ জানাবে। অবশ্য চঞ্চলের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবার প্রয়োজন হয় নি কারণ ব্যাপারটা সেইখানে চাপা পড়ে যায় আর চঞ্চল যেমন কাজ করছিলো তেমনি কাজ করে যেতে লাগলো। যদিও চঞ্চলের চাকরি গেলো না তবু একথা বুঝতে তার দেরি হলো না যে কালো খাতায় তার নাম উঠে গেছে আর হাজার ভালো কাজ করলেও সহজে তার উন্নতি হবে না।

তা না হোক—চঞ্চল চাকরিতে উন্নতি করবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত নয়। চাকরি করবার জন্যে সে বিলেতে আসে নি। কিন্তু যে কাজ করবার জন্যে এদেশে সে এসেছিলো সে-কাজও বোধ হয় আর করা গেলো না।

একদিন সন্ধ্যায় সে মারিয়াকে বললো, মারিয়া, এখন কী হবে?

কিসের চঞ্চল?

পড়াশুনোর খরচ চালাবো কেমন করে?

ও এই ব্যাপারে? মারিয়া হেসে বললো, পড়াশুনো ছেড়ে দাও।

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ, অনেকদিন আগেই তো তোমায় সেকথা বলেছি।

কিন্তু যদি কোনোদিন দেশে ফিরি ?

যদি কেন, আমরা নিশ্চয়ই একদিন দেশে ফিরবো।

তখন কী করবো ?

চঞ্চল, তুমি একথা কেন জিজ্ঞেস করছো বুঝতে পারছি না। বলেছি না লেখা ছাড়া তোমার আর কোনো কাজ নেই।

কিন্তু তাতে যে চলে না।

লেখকের ক্ষমতার উপর তা নির্ভর করে। যাদের চলে না তাদের ক্ষমতা সামান্য। পৃথিবীর সব দেশেই এক নিয়ম। তুমি দেশে ফিরে লিখে কী উপার্জন করবে আমি তা জানি না কিন্তু যা পাবে তাতেই আমাদের চালাতে হবে। যদি সামান্য অর্থ হয় তাহলে আমাদেরও আয় বুঝে ব্যয় করতে হবে।

আর যদি কিছুই উপার্জন না হয় ?

এসব কথা আমাকে শুনিও না চঞ্চল। যারা বড়ো লেখক হয় তারা কখনও এসব কথা বলে নিজেদের ছোটো মনের পরিচয় দেয় না। একটু থেমে কী যেন ভেবে মারিয়া বললো, তুমি যদি সত্যি লিখে উপার্জন করতে না পারো তাহলে জেনে রেখো চঞ্চল, আর কিছু করে একটি পয়সাও আয় করতে পারবে না। কী হবে ব্যারিস্টারি পড়ে পয়সা নষ্ট করে ? সে কাজ কিছুতেই তুমি মন দিয়ে করতে পারবে না, করবার চেষ্টা করলে নিজেকে প্রতারণা করে শুধু মক্কেলের অপ্রিয় হবে।

কিন্তু এখানে যে ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি করছি ?

মারিয়া হেসে বললো, তার জন্যে তোমার যে কষ্ট হচ্ছে আর যে পরিমাণ সময় নষ্ট হচ্ছে সেকথা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি। তাই তো এতো কথা বলছি চঞ্চল, তার একটা হাত কোলে তুলে নিয়ে মারিয়া বললো, তোমাকে যাতে বেশিদিন এখানেও চাকরি করতে না হয় তার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি—

তুমি চাকরি করবে আর আমি বসে থাকবো ?

না, বসে থাকবে কেন, তুমি শুধু লিখবে। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মারিয়া বললো, যৌবনের এই ভরাদিনে যদি তোমার অক্লান্ত-কলমে পাতার পর পাতা না ভরে ওঠে তাহলে আর কবে লিখবে তুমি ?

মারিয়ার কথায় চঞ্চলের মনে কোন নিভৃত প্রদেশে সহসা যেন লক্ষ দীপশিখা জ্বলে ওঠে। সে সত্যি লিখবে। তাকে লিখতে হবেই। ভোরবেলা যখন চোখে থাকবে ঘুমঘোর, হিমেল হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠবে পৃথিবী, আস্তে আস্তে ঝরে পড়বে দিগন্তের আলো আর বেলা বেড়ে যাবে, মধ্যদিনের ক্লান্তি ছড়িয়ে যাবে চারপাশে, স্তিমিত অপরাহ্ণের ইঙ্গিতে ফ্যাকাশে হয়ে উঠবে পৃথিবীর রঙ, দীর্ঘকালস্থায়ী গোধূলি যখন কিছুতেই মিলিয়ে যেতে চাইবে না, সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন এপাশে-ওপাশে জোনাকির মতো জ্বলতে শুরু করবে আলোর সারি, রাত্রি গভীর হবে, স্তব্ধ হবে যন্ত্র আর মানুষের কোলাহল, সমস্ত পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে বিশ্রামের ঈপ্সিত ক্ষণ, বেজে উঠবে প্রকৃতির রিমঝিম ঘুমপাড়ানি গান—তখনও ক্লান্তি আসবে না চঞ্চলের। সে শুধু লিখবে—সারাদিন সারারাত। সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে অধীর আগ্রহে একজন প্রতীক্ষা করছে তার রচনার—সে তাকে শক্তি দিয়েছে, সাহস দিয়েছে, নব অনুপ্রেরণায় রোমাঞ্চ জাগিয়েছে সারা শরীরে। না লিখে চঞ্চল থাকবে কেমন করে!

তিন মাস পরে

জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি—এই দুমাস ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে খারাপ সময় বিদায় নেবার আগে শীত যেন প্রাণপণে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে যায়। কনকনে হাওয়া, অবিশ্রাম তুষারপাত আর অন্ধকার দিন—অধৈর্য হয়ে মানুষ দিন গোনে কবে সূর্যের আলোয় রঙ-বেরঙের ফুল ঝলমল করবে—কবে আসবে বসন্তের উজ্জ্বল দিন।

হাওয়ার বেগ বেড়ে যায় মার্চ মাসে। তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া পুরু গরম কাপড় তুচ্ছ করে যেন মানুষের হাড় বিঁধে দেয়। তবু তখন থাকে শুধু হাওয়ার জোর, ততো বেশি তুষার ঝরে না, দিনেব বেলায় তেমন করে অন্ধকার ভারি করে তোলে না মন। আসন্ন এপ্রিলেব আনন্দে মার্চ মাসের হাওয়ার গতি কঠিন দাগ কাটে না মানুষেব মনে। তাই শীতেব হিসেব করবার সময় জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারিকে লোকে যতো ভয়েব চোখে দেখে, মার্চ মাসকে ততো গ্রাহ্য করে না। যদিও অনেক সময় দেখা গেছে মার্চের ঠাণ্ডা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির শীত অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে, কঠিন হাওয়ার দুরন্ত বেগ কাঁপিয়ে গেছে গাছের সুদৃঢ় শিকড। তবু মার্চ যেন তীব্র সিক্ত এলোমেলো হাওয়ায় বারবার গান গেয়ে বলে যায়, এপ্রিলের দেরি নেই। নিকট থেকে নিকটতর হলো ফুল ফোটবার দিন।

কিন্তু আশ্চর্য প্রকৃতি লণ্ডনের। জানুয়ারি শেষ হয়ে গেলো, আজ তিরিশ তারিখ। এমাসে তুষার ঝরে নি একদিনও, শীতের কাঠিন্য তেমন করে পথে-প্রান্তরে আজও কাটে নি কোনও দাগ। যদিও প্রকৃতিকে বিশ্বাস করে না এদেশের লোক তবুও তারা যেন বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলো।

হঠাৎ তিরিশে জানুয়ারি ভয়ঙ্কর রূপ নিলো প্রকৃতি। সকাল থেকে বাতাস যেন প্রকৃতির শাণিত তীরের তূণ উজাড় করে দিলো। ভীত সূর্য পুরু মেঘের

আড়ালে কখন অদৃশ্য হলো জানতে পারলো না কেউ। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের জোর বেড়ে গেলো। উদ্দাম হাওয়ার ঝাপটায় দিগ্বিদিকে উন্মাদের মতো ছুটে বেড়াতে লাগলো ভারি তুষারকণার দল। তারপর অবিশ্রান্ত বয়ে চললো তুষারের ঝড়—যেমনি কঠিন তেমনি ভয়ঙ্কর। শুষ্ক মূক গাছগুলি তুমুল প্রতিবাদ জানিয়ে যেন বিদ্রোহ করছে। কিন্তু নিষ্ফল তাদের আক্রোশ। প্রবল তুষারের চাপে তাদের অবশেষে শুধু নির্বাক শ্বেতস্তম্ভের মতো মনে হলো। জানালা-দরজা বার বার নড়ে উঠেছে। ঘরদোর কাঁপছে হাওয়ার আঘাতে। এখুনি যেন চুরমার হবে সব।

আজ ইণ্ডিয়া হাউসে তেমন ভিড় নেই! শুধু যাদের বিশেষ প্রয়োজন তারা বরফের ঝড়ের মধ্যে দিয়েও কোনো রকমে পথ করে এসেছে!

সোমনাথ চঞ্চলের কাছে কিছু টাকার জন্যে এসেছিলো। এই প্রথমবার নয়, এর আগেও সে আর একবার মাত্র কয়েকদিনের জন্যে তার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলো। চঞ্চল তখনও বিয়ে করে নি। তখন তার কাছে দেবার মতো টাকা থাকতো। অবশ্য এখন চঞ্চলের অবস্থা কেমন সেকথা সোমনাথ জানে না। কিন্তু আজ টাকা জোগাড় করতে না পারলে তার কিছুতেই চলবে না। অ্যানালিসার জন্যে জুতো না কিনলেই নয়। তাছাড়া গত সপ্তাহের বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। সোমনাথের এমন অবস্থা বারবার হয় না। সে কারখানা থেকে যা পায় তাতে তাদের সংসার কোনো রকমে চলে যায়। কিন্তু অসুবিধা হয় জিনিসপত্র কিনতে হলে। শীতের আরম্ভেই নিজের জন্যে তাকে এবার দুজোড়া জুতো কিনতে হয়েছে। মিলনের জন্যে স্যুট করে দিতে হয়েছে। খরচের চাপ দেখে অ্যানালিসা নিজের জন্যে জুতো কিনতে চায় নি, বলেছিলো, পরে হলে চলবে। কিন্তু এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে জুতো না হলে তার পক্ষে রাস্তায় বেরিয়ে বাজারহাট করাও সম্ভব নয়।

সহজে কারুর কাছে কিছু চাইতে পারে না সোমনাথ। তার সব সময় ভয় হয় যদি চরম প্রয়োজনে কারুর কাছে চেয়ে না পায় তাহলে তার চেয়ে লজ্জার আর কিছুই হতে পারে না। তাই সংসার একেবারে অচল না হলে সে মুখ

যুটে নিজের অভাবের কথা কাউকে জানাতে পারে না। অন্তত এতোদিন পারে নি।

শুধু চঞ্চল একমাত্র ব্যতিক্রম। তার সঙ্গে আলাপের প্রথম দিন থেকেই কী কারণে সে নিজেই জানে না তার মনে হয়েছে যে এই পৃথিবীর আর কেউ যদি তার মতামত না মানে, তাকে না বোঝে, চঞ্চল নিশ্চয়ই তাকে বুঝবে। তারপর এই ইণ্ডিয়া হাউসেই তার সঙ্গে নানা আলোচনা করে সোমনাথের বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। চঞ্চলের বিয়ের পর যখন অনেকেই তাকে সমর্থন করে নি, কঠিন কথা বলেছিলো তখন সোমনাথ তাকে আশা দিয়েছে, আশ্বাস দিয়েছে, সাহস দিয়েছে। বয়সের কথা ভুলে দুজনে কতো মনের কথা বলেছে কতোদিন। কোনো বিষয় যখন চঞ্চল বুঝতে পারে নি কিংবা কোনো কথা বিশ্বাস করতে সন্দেহ জেগেছে তার মনে তখন সোমনাথের মত নিজের বলে গ্রহণ করেছে কতোবার।

এই তো কিছুদিন আগে চঞ্চল জিজ্ঞেস করেছিলো, আপনি বলেন যে এদেশে সংস্কৃতির বিনিময়ের জন্যে আপনি থেকে গেছেন কিন্তু আমি যে কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে আলাপ করেছি তারা কেউই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে নি। এমন যদি হয় তাহলে বিনিময় হবে কেমন করে?

সোমনাথ ব্যানার্জি হেসে উত্তর দিয়েছিলো, তুমি যখন এদেশের লোকের সঙ্গে আরও বেশি মিশবে, আরও বেশি আলোচনা করবে তখন দেখবে এদের আমাদের দেশ সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ আছে কেন না সংস্কৃতির বিনিময় না হলে এখন কোনো জাত বড়ো হতে পারে না।

শুধু চঞ্চলকে নয়, এসব কথা সোমনাথ সকলকে বলে। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে তার যেন সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়, তার হাতপা অবশ হয়ে যায়, মাথা ঝিমঝিম করে। সংস্কৃতির বিনিময়ের জন্যে সে দেশ ছাড়লো, বড়ো চাকরির মায়া কাটালো, যে কোনো অবস্থার মধ্যে দিয়ে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত হলো। কিন্তু শেষ অবধি নিজে কী পেলো?

মিলন তার মত মানে না, নিজের খুশিমতো চলে। সোমনাথ বুঝতে পারে যে সে তাকে আর মানবে না, তার কোনো কথা শুনবে না। অ্যানালিসা কিছু বলে না বটে কিন্তু সোমনাথ তার মুখ দেখে বুঝতে পারে যে হতাশায় তার দিন কাটছে। হয়তো স্বামীকে সে কৃপার চোখে দেখে, তার মতামতের কথা মনে করে দুঃখ পায়।

তার উপর দারিদ্র্য তো আছেই। তা নিয়ে মিলন কিংবা অ্যানালিসা কোনো কথা বলে না বটে কিন্তু সোমনাথ নিজে বিব্রত হয়ে পড়ে। এখন তার বয়স হয়েছে, কোনদিন শেষ হয়ে যায় ঠিক নেই, কী রেখে যাবে সে তার একমাত্র বংশধরের জন্যে ?

এ ভাবনা অবশ্য ক্ষণকালের। নিজের জন্যে সোমনাথ দুঃখ করে না। ব্যক্তিগত জীবনে সে কী পেলো আর কী পেলো না তা নিয়ে হিসেবনিকেশ করবার জন্যে সে প্রস্তুত নয়—তার জন্যে ভারতবর্ষ আর ইউরোপের কী লাভ হলো তাই তার একমাত্র ভাবনা। শুধু যখন অভাবের তাড়নায় সে চোখে অন্ধকার দেখে তখন তার দেহ যেন অবশ হয়ে যায়।

আর একটু তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়ে চঞ্চল নিচে নেমে এলো। ক্ষিধে পেয়েছিলো তার তাই সাড়ে বারোটার মধ্যে সে খাওয়া সেরে নিয়েছে। ব্রেকফাস্ট আজ ভালো হয় নি, ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়েছিলো বলে কোনোরকমে চা আর পরিজ খেয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

কী বিশ্রী দিন, সোমনাথ ব্যানার্জির পাশে বসে চঞ্চল বললো, দেখছেন এখনও বরফ পড়ছে।

তবু এখন তো একটু কম, আমি বরফের ঝড় মাথায় করে এসেছি। আশ্চর্য কাণ্ড, এমন তো এখানে কখনও দেখি নি।

এখানকার প্রকৃতির কথা কিছুই বলা যায় না, আর একটু পরেই হয়তো দেখবে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

চঞ্চল হেসে চুপ করে কাচের সার্সি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু কিছুই দেখা যায় না আর। সার্সির উপর যেন তুষারের স্তূপ জমা হয়েছে। এখনও

শুধু হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে আর মনে হচ্ছে খুব কাছ থেকে যেন সেই হাওয়া যেন তার গায়ে এসে ধারালো তীর বিঁধিয়ে দিচ্ছে।

সোমনাথ ব্যানার্জি ভাবছিলো কেমন করে কথা আরম্ভ করা যায়। চঞ্চল তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো। তার এখন উজ্জ্বল যৌবন—আনন্দের দিন। এ সময় নিজের দুঃখের কথা বলে চঞ্চলের কাছ থেকে টাকা নিতে সোমনাথের নিজেকে বড়ো ছোটো মনে হয়। তাই সে ভাবছিলো, না চেয়ে কোনোরকমে সামলে নেয়া যায় কিনা। সোমনাথ ব্যানার্জির জীবনে এমন অবস্থা অনেকবার হয়েছে। সংসারের জন্যে যখন তার টাকার দরকার হয়েছে আর সে ভেবেছে অমুকের কাছে চাইবে তখন অনেক ইতস্তত করেও সে কোনো বন্ধুর সঙ্গে হয়তো দেখা করেছে, একথা-সেকথা বলেছে, নানা আলোচনা করেছে কিন্তু শেষ অবধি টাকার কথা কিছুতেই বলতে না পেরে বিদায় নিয়ে চলে এসেছে। আজ চঞ্চলের পাশে বসে তার হঠাৎ আবার তেমন অবস্থা হলো। তাই সোমনাথ ব্যানার্জি মনে মনে ভাবছিলো কী করবে।

হঠাৎ অনঙ্গ দাশকে সেখানে আসতে দেখে সোমনাথ চঞ্চলকে টাকার কথা বলবার আশা একেবারে ছেড়ে দিলো। এখন অনঙ্গ দাশ লোকের নিন্দে করে শুধু সময় নষ্ট করবে, আর কাউকে কোনো কথা বলবার সুযোগ দেবে না।

কিন্তু চঞ্চল আর সোমনাথ দুজনেই তাকিয়ে দেখলো যে আজ অনঙ্গ দাশের চেহারা একেবারে অন্যরকম। চুল উস্কোখুস্কো, মুখে হতাশার ছাপ আর তার সমস্ত শরীর প্রবল উত্তেজনায় কাঁপছে। চঞ্চল ভাবলো হয়তো এখুনি সে বলবে যে মিসেস দাশ তার নামে মামলা করে এর মধ্যে তাকে মহাবিপদে ফেলেছে।

ওদের দুজনকে দেখতে পেয়ে অনঙ্গ দাশ সেই সোফার উপর যেন টলে পড়লো। তারপর চোখ বন্ধ করে এক হাতে চঞ্চলকে আর এক হাতে সোমনাথ ব্যানার্জিকে শক্ত করে ধরে সোফায় ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইলো। কিছুক্ষণ জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে অনঙ্গ দাশের।

রুদ্ধ সমবেদনার স্বরে সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে অনঙ্গ, তুমি কি অসুস্থ হয়ে পড়লে হঠাৎ ?

সোমনাথ, শীর্ণকণ্ঠে অনঙ্গ দাশ চিৎকার করে উঠলো, খবর শুনেছো ? গান্ধীজী মারা গেছেন।

কথা শুনে সোমনাথ ব্যানার্জির সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে গেলো। কিন্তু সে অনঙ্গ দাশের স্বভাব ভালো করেই জানে। তাই পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, এতো বড়ো বাজে খবর এমন করে ছড়িয়ে বেড়িও না অনঙ্গ—

শান্ত স্বরে অনঙ্গ দাশ বললো, বাজে খবর নয় সোমনাথ, আমি উপর থেকে শুনে এলাম। ভারতবর্ষ থেকে হাই কমিশনারকে টেলিফোনে এইমাত্র খবর দেয়া হয়েছে।

অনঙ্গ দাশের কথার একবর্ণও বিশ্বাস না করে চঞ্চল নির্বিকারভাবে বললো, কই আমি তো কিছু শুনি নি, আপনাকে কে বললো ?

অনঙ্গ দাশ চঞ্চলের কথার উত্তর দেবার আগেই একজন মাদ্রাজী চাকুরে ব্যস্তভাবে সেখানে এসে চঞ্চলকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, কারা মারলো ? মুসলমানেরা ?

চঞ্চল শুকনো মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি কী বলছেন মিঃ চারী ?

দিল্লীতে আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজী প্রাণ দিয়েছেন।

সোমনাথ ব্যানার্জি একথা শুনে আর বসে থাকতে পারলো না। উঠে দাঁড়িয়ে একবার অনঙ্গ দাশ, চঞ্চল আর চারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ভগ্নকণ্ঠে চিৎকার করে তীব্র প্রতিবাদ জানালো, মিথ্যা, মিথ্যা, একেবারে বাজে কথা। মহাত্মা গান্ধীকে গুলি করে মারবে কে !

দুই হাতে মাথা চেপে ধরে চোখ বুজে সোফায় বসে আছে অনঙ্গ দাশ। সোমনাথ ব্যানার্জির মুখে অবিশ্বাসের স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে। নির্বাক বিস্ময়ে স্থির হয়ে চঞ্চল চারীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু মনে মনে বলছে, এ খবর যেন মিথ্যা হয়।

একে একে উপর থেকে লোক নেমে এসে একতলায় জড়ো হচ্ছে। কেউ জোর করে বলতে পারছে না এ মর্মান্তিক সংবাদ সত্যি কিনা। এ ও মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলাবলি করছে, কী ব্যাপার। এ খবর কে রটাচ্ছে? দূর তাও কি হয়? মিথ্যা কথা। আপনি নিজে জানেন হাই কমিশনার খবর পেয়েছেন কিনা? শুষ্ক ম্লান মুখে লোকে আলোচনা করে যাচ্ছে এমনি অনেক কথা।

কিন্তু দেখতে দেখতে ইণ্ডিয়া হাউসের হাওয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই একেবারে ঘুরে গেলো। চারপাশে কেমন যেন দিশাহারা সন্ত্রস্ত ভাব। দলে দলে লাউঞ্জে লোক আসছে। কিন্তু কেউ জানে না এ খবর সত্যি কি না।

ওদিকে বাইরে তুষারের ঝড় হঠাৎ যেন থেমে গেছে। তুষারপাতও বন্ধ। গুম হয়ে গেছে প্রকৃতি। হিমশীতল কঠিন বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে চারপাশ। ইণ্ডিয়া হাউসের ভিতরে যখন লোকেরা এ মর্মান্তিক খবর সত্যি কি না জানবার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছে তখন অকস্মাৎ বাইরে খবরের কাগজের একদল ইংরেজ হকার যেন একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, গান্ধী কিল্‌ড্‌ বাই এ হিন্দু! গান্ধীজী অ্যাসাসিনেটেড! গান্ধী ডেড অ্যাট ডেল্লী—

মুহূর্তে ইণ্ডিয়া হাউসের বাইরে কাগজের হকারদের ঘিরে ফেললো অধৈর্য জনতা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেলো সমস্ত কাগজ।

বিলিতি দৈনিক পত্রিকাগুলির সান্ধ্য সংখ্যায় নির্মম হত্যার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তিরিশে জানুয়ারি লণ্ডনে যখন অঝোরঝরন তুষার-বিক্ষুব্ধ ভরা দুপুর, দিল্লীতে তখন কঠিন শীতের অপরাহ্ণের শেষ। সন্ধ্যা উপাসনার সময় মহাত্মার বুকে গুলি এসে লাগে। দারুণ যন্ত্রণায় টলে পড়লেও তাঁর মুখের ক্ষমাসুন্দর হাসি অন্তিম মুহূর্তে মিলিয়ে যায় নি। হত্যাকারীর নাম গডসে। বয়সে তরুণ এক হিন্দু। কাজ শেষ করে ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করার চেষ্টা করবার সময় জনৈক মার্কিন অতিথি তাকে গ্রেপ্তার করে।

নিরন্তর শুধু খবরের কাগজের ভ্যান আসছে—একের পর এক—অনেক। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে হকারদের কাছে আসছে তারপর রাশি রাশি কাগজ নামিয়ে

দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে যাচ্ছে অন্য রাস্তার মোড়ে হকারকে কাগজ দেবার জন্যে। ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড, ইভনিং নিউজ, স্টার—আরও কতো কাগজ তার ঠিক নেই। কিন্তু কাগজের নাম দেখবার মতো মনের অবস্থা তখন লোকের নয়। যে যা কাগজ হাতের সামনে পাচ্ছে তাই নিয়ে প্রবল উৎকণ্ঠায় ঝুঁকে পড়ছে প্রথম পাতার বড়ো বড়ো অক্ষরগুলির উপর।

শুধু ভারতীয় নয়, হকারদের চারপাশে অনেক ইংরেজ নরনারী ভিড় করছে। কেউ কেউ খবর পড়ে করুণ চোখে ইণ্ডিয়া হউসের দিকে তাকিয়ে থাকছে অনেকক্ষণ। অর্ধ-উত্তোলিত-করা তখন ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা।

সেদিন কাজ বন্ধ হলো ইণ্ডিয়া হাউসের। যারা মোটা মোটা ফাইল নিয়ে দরকারী চিঠি খোঁজবার চেষ্টা করছিলো তাদের চিঠি খোঁজ আর হলো না, হাত যেন অবশ হয়ে গেলো। কলম থেমে গেলো প্রত্যেকের। সেই কঠিন শীতের দুপুরে অসংখ্য ভারতীয় কর্মীর কপালে জমে উঠলো বিন্দু বিন্দু ঘাম।

তুচ্ছ হয়ে গেলো শীত, ব্যর্থ হলো হাওয়ার ধারালো তীর। লণ্ডনের চারপাশে যতো ভারতীয় ছিলো তারা এসে ম্লানমুখে জমা হলো ইণ্ডিয়া হাউসের লাউঞ্জে। উপরের ক্যানটিন একেবারে খালি হয়ে গেলো। ওয়েট্রেস একে একে অনেক ভরা প্লেট তুলে নিলো। প্রথম গ্রাস মুখে তোলবার সময় যারা খবর পেলো তারা আর মুখে তুলতে পারলো না অন্ন। ভরা থালা রইলো পড়ে। যে অবস্থায় ছিলো সে অবস্থায় লোক ঘোরাঘুরি করতে লাগলো হাই কমিশনারের ঘরের কাছে।

ইণ্ডিয়া হাউসে আর জায়গা নেই। দেশী-বিদেশী কতো দেশের মানুষ যে ভেঙে পড়েছে সেই অট্টালিকায়! তাদের মুখে হতাশা, তাদের চোখে জল। কেউ অশ্রুসংবরণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কেউ শিশুর মতো ফুপিয়ে উঠছে আর কেউ কেউ স্থানকাল ভুলে ভারি কান্না কাঁদছে। একতলা, দোতলা, তেতলা—কোথাও আর দাঁড়াবার জায়গা নেই। ইণ্ডিয়া

হাউসের দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘশ্বাস। ক্রন্দনের করুণ সুরে চারপাশ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ঘরের দরজা খুলে আস্তে আস্তে হাই কমিশনার বেরিয়ে এলেন। লণ্ডনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর নাকি এ সময় কিছু বলা দরকার। কিন্তু কী কথা বলবেন তিনি! এক মহান জাতি যিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন, অনেক ঝড়ের সমুদ্র যাঁর শক্তিমান বাহু অতি সন্তর্পণে পথ দেখিয়েছে ভারতবাসীকে—আজ তিনি তাঁরই দেশের লোকের হাতে প্রাণ দিলেন সেকথা অসংখ্য বিদেশীর সামনে কোনমুখে উচ্চারণ করবেন তিনি! তবু হাজার অনিচ্ছায় দুকথা বলবার চেষ্টা করতেই হলো। অবশ বিমূঢ় দেহকে হাই কমিশনার অনেক কষ্টে টেনে নিয়ে এলেন দোতলায় লাইব্রেরি ঘরে। ইণ্ডিয়া হাউসে যতো লোক জমা হয়েছিলো তারা সকলে এলো পিছনে পিছনে।

হাই কমিশনার ছোটো ছেলের মতো ফোঁপাতে ফোঁপাতে কোনো রকমে শুধু সেই নির্মম হত্যার বিবরণ সংক্ষেপে শোনালেন। তারপর হয়তো তিনি আরও দুএক কথা বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিপুল ক্রন্দনের চাপে সহসা তাঁর কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেলো, তিনি মূর্ছিতের মতো হয়ে পড়লেন। মাটিতে টলে পড়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে ধরে ফেললো। আস্তে আস্তে সরে গিয়ে নরনারী তাঁকে ঘরে নিয়ে যাবার পথ করে দিলো।

ইণ্ডিয়া হাউসে আর কিছু জানবার নেই। এবার বিশ্বাস করতেই হবে। অনেক দূর থেকে যারা গুজবে বিশ্বাস না করে আসল খবর জানবার জন্যে এসেছিলো তারা যেন নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে চললো। শূন্য হয়ে গেছে বুক। একটি একটি করে যেন পাঁজর ভেঙে যাচ্ছে। অনেকে দেশ ছেড়েছে বহু বছর আগে। আজ দেশের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু অকস্মাৎ তাদেরও বুকে যেন গুলি লেগেছে, দেহ মন প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে অব্যক্ত যন্ত্রণায়। ভারতবর্ষ বলতে আজও তারা যে মহাত্মা গান্ধীকেই জানে। এখন দেশে আর রইলো কে, দেশের আর রইলো

কী! কী হবে এখন সেখানে? কে দেখাবে পথ? কে দেবে নির্দেশ? বিশৃঙ্খল জনতাকে সজ্ঞবদ্ধ করবে কে? যদি দাঙ্গা বাধে? যদি রক্তগঙ্গা বয়ে যায়? যেন আলো নিভে গেছে, অসময়ে অন্ধকার নেমেছে। ভারতবর্ষের এই যুগসন্ধিক্ষণে কার অভিশাপে শক্তিমন্ত্রের দীক্ষাগুরু সরে গেলেন! বার বার বুক ঠেলে শুধু গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসতে চায়।

বাইরে এর মধ্যে অল্প অল্প অন্ধকার নেমেছে। ভারি হাওয়া বইছে—যেন দেশদেশান্তরে শোকের বার্তা বহন করে নিয়ে চলেছে। খবরের কাগজের হকাররা এখনও ভিড় করে আছে পথের ধারে। তাদের কাছে এখন আর ভারতীয় ক্রেতা নেই, শুধু বিদেশী-বিদেশিনীর ভিড়।

খবর দেখে কেউ কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রুমাল বের করে চোখের জল মুছছে। ইংরেজ নাকি জোরে কেঁদে শোক প্রকাশ করে না, তবু দেখা গেলো কতো বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সব ভুলে কেঁদে উঠলো। তারপর এগিয়ে এলো ইণ্ডিয়া হাউসের দিকে। তারা বোধহয় আরও ভালো করে খবর জানতে চায়।

যতো ভারতীয় রাস্তায় চলেছে আজ তাদের প্রত্যেকের হাতে অনেক খবরের কাগজ। কিন্তু বোধহয় জীবনে এই প্রথম বার নানা বয়সের নানা ধরনের ইংরেজ পথিক তাদের থামিয়ে নিজেদের মাথা থেকে টুপি নামিয়ে শক্ত করে হাত চেপে ধরে ধরা গলায় বলছে, তোমাদের দুঃখে আমার গভীর সমবেদনা জেনো!

একবার নয় দুবার নয়, পথ চলতে চলতে অসংখ্যবার লোকে এমন করে সমবেদনা জানাতে লাগলো। আজ এই গভীর শোকের মাঝেও ভারতীয়দের প্রবাস-বাস সার্থক হলো, অপরিচিত ইংরেজের কাছ থেকে বন্ধুর মতো এমন আন্তরিক ব্যবহার তারা এর আগে আর কখনও পায় নি। ভারতবর্ষে ভারতীয় হয়ে জন্মাতে পেরেছে বলে আজ গর্বে তাদের বুক ভরে গেলো। মহাত্মা গান্ধীর দেশে জন্মেছে বলে সার্থক জন্ম তাদের—সেকথা খুব সহজে আজ প্রত্যেক ভারতবাসী বুঝতে পারলো।

তখন সব অফিস ছুটি হয়েছে। বাসে, টিউব ট্রেনে অনেক লোকের ভিড়। প্রত্যেকের হাতে একটি করে খবরের কাগজ। প্রত্যেকে মাথা নিচু করে

এক দৃষ্টিতে মহাত্মার হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ইনি যেন তাদের বড়ো আপনার জন। ভারতবর্ষের লোক দেখলেই তারা সশ্রদ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছে। অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে সমবেদনা জানিয়ে বলছে, তুমি বোসো এবার। আমি অনেকক্ষণ বসেছি।

যারা এতোদিন দেশকে একেবারে ভুলেছিলো, দেশের ত্রুটি ছাড়া ভালো কিছুই যাদের চোখে পড়ে নি, সুযোগ পেলেই বিদেশীদের কাছে যারা পাঁচমুখে ভারতবর্ষের নিন্দে করেছে, যারা নিজের দেশের সব কিছু তুচ্ছ করে মনে-প্রাণে সাহেব হয়ে গেছে—আজ তাদের চতুর্গুণ আঘাত লাগলো। ভারতীয় বলে যখন অসংখ্য ব্রিটিশ নরনারী তাদের সমবেদনা জানাচ্ছে তখন তারা কথা বলতে পারছে না। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। এ সম্মান তো তাদের প্রাপ্য নয়। কী করেছে তারা জন্মভূমির জন্যে? দেশে কিছু করতে না পেরে ভীরুর মতো পালিয়ে এসে নিজেদের যা কিছু বিসর্জন দিয়েছে। পশুর মতো নকল করেছে বিদেশীকে, তাদের দেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছে বলে গর্ব অনুভব করেছে। ভারতবাসী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেছে। কিন্তু আজ এতোদিন পর প্রচণ্ড ধাক্কায় তারা যেন নিজেদের নতুন করে উপলব্ধি করলো। বারবার তারা ধিক্কার দিলো নিজেদের—মহাত্মার হত্যাকারীর চেয়ে তাদের অপরাধ যেন আরও বেশি।

লণ্ডনের আর কারুর খবর জানতে বাকি নেই। কুলি মজুর মধ্যবিত্ত বড়োলোক —কে না চেনে গান্ধীজীকে! সারা শহরে শোকের ছায়া নেমেছে। বি বি সি থেকে নতুন করে পূর্ণ বিবরণ প্রচারিত হচ্ছে—অন্তিম মুহূর্তে মহাত্মাকে গীতা পাঠ করে শোনানো হয় সে কথাও জানিয়ে দিলো ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন। ঘরে ঘরে ভিতরে-বাইরে থমথমে ভাব। পৃথিবীর আত্মীয়ের জন্যে যেন সমস্ত পৃথিবী শোক প্রকাশ করছে।

একে একে ইণ্ডিয়া হাউসের আলোগুলি নিভিয়ে দিচ্ছে ম্যাসেঞ্জার। একটু পরে তারাও বেরিয়ে যাবে। আর সকলে চলে গেছে। শূন্য ইণ্ডিয়া হাউস।

সোমনাথ মাথা থেকে হাত নামিয়ে দেখলো কেউ কোথাও নেই। এবার উঠে যেতেই হবে তা না হলে হয়তো ম্যানেজার এখুনি এসে বিনীত অনুরোধ করবে চলে যেতে।

কিন্তু যাবে কেমন করে সোমনাথ। তার বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়েছে, রক্ত হিম হয়ে গেছে, পা কাঁপছে, শরীর টলছে। ওঠবার ক্ষমতা তার নেই। এতোক্ষণ তার যেন ঘোর লেগেছিলো। একি সত্যি না দুঃস্বপ্ন! এখনো কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারছে না। মাথা যেন আর কাজ করছে না সোমনাথের! সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, ভাবতে পারছে না, ঠিক করতে পারছে না কী করবে, কোথায় যাবে।

একবার সমস্ত শক্তি দিয়ে সে ওঠবার চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুতেই পারলো না। আবার সশব্দে সোফায় বসে পড়তে হলো। অনেক কষ্টে পকেট থেকে সে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করলো। কিন্তু জ্বালাতেই চমকে উঠলো—আগুন! ভীষণ ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি সে সিগ্রেট দেশলাই দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। যতোদিন বেঁচে থাকবে আর কোনোদিনও সিগ্রেট স্পর্শ করবে না সোমনাথ—কোনোদিনও নিজের হাতে দেশলাই জেলে আগুন ধরাবে না।

কিন্তু ওকি, সোমনাথ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলো সারা পৃথিবীতে আগুন ধরে গেছে। লাল হয়ে গেছে চারধার। ধোঁয়ায় চোখে জল এসে পড়েছে তার। উত্তাপ এসে গায়ে লাগছে। এখুনি দেহ ঝলসে যাবে।

না—না ভয় নেই। শান্ত হাসি নিয়ে ধীর মন্থর গতিতে আগুন অগ্রাহ্য করে পথ করে নিয়ে কে চলেছে আগে আগে। সে মূর্তি কি ভোলবার! পরনে নামমাত্র বস্ত্র, হাতে লাঠি, সারা দেহে অপূর্ব জ্যোতি আর পিছনে লক্ষ নরনারী। তাদের কণ্ঠে জপমন্ত্রের মতো শুধু ধ্বনিত হচ্ছে, মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়।

যা ভেবেছিলো তাই। যথাসময় ম্যানেজার এসে সোমনাথের সামনে দাঁড়ালো। তাকে সেখানে সেভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হলো ম্যানেজার। জিজ্ঞেস করলো তার জন্যে কিছু করতে হবে কিনা।

ভাঙা গলায় সোমনাথ বললো, দয়া করে আমাকে শুধু হাত ধরে তুলে দাও—

ম্যানেজার তার হাত ধরে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলো, আর কী করতে পারি তোমার জন্যে?

আর কিছু না অনেক ধন্যবাদ, আস্তে আস্তে পা ফেলে সোমনাথ বাইরে বেরিয়ে এলো। ভারি ঠাণ্ডায় বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। কিন্তু তার শীত লাগলো না, শুধু মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। বেশিক্ষণ কিছুতেই সে হাঁটতে পারবে না। কানে শুধু গুলির শব্দ বাজছে—গুড়ুম! গুড়ুম! কোনো রকমে স্ট্র্যাণ্ডের উপরে এসে দাঁড়ালো সোমনাথ। তারপর শূন্য দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকালো। না, এমন করে সে আর চলতে পারবে না। একটা ট্যাক্সি চাই তার। কিন্তু চোখে পড়ছে না একটিও। কে তাকে ট্যাক্সি ডেকে দেবে। তখনও হকার চিৎকার করছে, গান্ধী কিল্‌ড বাই এ হিন্দু—গান্ধী অ্যাসাসিনেটেড—

সোমনথকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে একজন এগিয়ে এলো তার দিকে। চেহারা দেখে মনে হয় মজুর। এইমাত্র সামনের পাব্ থেকে বেরিয়ে এসেছে। মুখে মদের গন্ধ। নেশায় টলে টলে পড়ছে সে! সোমনাথের চেহারা দেখে থমকে দাঁড়ালো সেই মাতাল।

হ্যালো! ইণ্ডিয়ান? মাথা থেকে টুপি খুলে সোমনাথের একটা হাত ধরে জড়ানো স্বরে বললো, আই সেল্যুট মহাত্মা গান্ধী—আকাশের দিকে তাকিয়ে সে সেলাম জানালো!

তার দেহে ভর দিয়ে সোমনাথ বললো, দয়া করে আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবে?

নিশ্চয়ই, চারপাশে তাকিয়ে মাতাল চিৎকার করতে লাগলো, আই ক্যাবি—ট্যাক্সি—হিয়ার—

সোমনাথকে ট্যাক্সিতে তুলে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মাতাল আর একবার সেলাম জানালো।

স্ট্র্যাণ্ড থেকে হেণ্ডন অনেকটা পথ। বাড়িতে পৌঁছতে সময় লাগবে সোমনাথের। কটা বেজেছে কে জানে। ট্যাক্সিতে দেহভার এলিয়ে দিলো সোমনাথ। আস্তে আস্তে যেন মাটি সরে যাচ্ছে আর সে শুধু তলিয়ে যাচ্ছে। নিশ্বাস যেন

বন্ধ হয়ে যাবে সোমনাথের। তবু তার চোখের সামনে ছবি ফুটে উঠছে, নাকে এসে লাগছে ধূপের গন্ধ আর একই কথা বারবার তার মনে ঘুরে-ফিরে আসছে, রক্তপাতের বিরুদ্ধে আজীবন যাঁর সংগ্রাম তাঁর জীবনের অবসান হলো রক্তপাতে! এতো বড়ো কলঙ্কিত দিন ইতিহাসে আর কতোবার এসেছে? এ লজ্জা কার? সমস্ত জীবন দিয়ে কি সমস্ত জাতি এতো বড়ো লজ্জা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেবার চেষ্টা করবে না? কলঙ্ক মুছে দিক সকল জীবন। এ যে আমাদের সবচেয়ে বড়ো ঋণ! এ ঋণ শোধ করবার ভার প্রত্যেককে নিতে হবে।

দিল্লীতে সান্ধ্য উপাসনার আসর কেমন করে সাজানো হয়েছিলো! কতো লোক এসেছিলো সেখানে! কী কথা বলে উপাসনা আরম্ভ করেছিলেন মহাত্মা! হয়তো তখন একে একে জ্বলে উঠেছিলো অনেক প্রদীপ। পবিত্র মধুর গন্ধে আসর ভরে উঠেছিলো। তুচ্ছ মনে হয়েছিলো, অহং অর্থ যশ মান। সমবেত কণ্ঠে শুধু ধ্বনিত হয়েছিলো ভজন গান—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম—

যথাসময়ে ড্রাইভার হেণ্ডনে সোমনাথের বাড়িব সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে জানালো যে এবার নামতে হবে। খুব সাবধানে নামলো সোমনাথ। এখনো উত্তেজনায় থরথর করে শরীর কাঁপছে। কিন্তু ভাড়া দেবার কথা মনে হতেই চমকে উঠলো সে। টাকা কোথায় পাবে। তার পকেটে তো অতো পয়সা নেই। বাড়িতেও আছে কিনা সন্দেহ। থাকলেও তা কিছুতেই খরচ করা চলবে না। কারণ তাহলে কাল কারুরই বাড়ি থেকে বেরুনো সম্ভব না।

সোমনাথের বিমূঢ় ভাব দেখে ড্রাইভার বোধ হয় ব্যাপার বুঝতে পারলো। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সে বললো, কিছু যায় আসে না, আমি চললাম—

বাধা দিয়ে সোমনাথ বললো, দাঁড়াও দেখি বাড়ির ভেতর—

থাক স্যার, ট্যাক্সির ক্লাচ ছাড়তে ছাড়তে সজল চোখে সোমনাথের মুখের তাকিয়ে থেমে থেমে ড্রাইভার শুধু বললো, মে হিজ্ সোল্ রেস্ট ইন পীস!

ট্যাক্সি চলে গেলো। তবু সেই শীতের সন্ধ্যায় সোমনাথ নিজের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। এপাশে-ওপাশে জমা হয়ে আছে পুরু তুষার। শাদা হয়ে আছে চারপাশ। কী যেন নেই—কী যেন নেই। অসীম শূন্যতা যেন ঝরা তুষারে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই দেখতে দেখতে কান পেতে সোমনাথ শুনতে লাগলো হাওয়ার একটানা হাহাশ্বাস!

ছ মাস পরে

খুব বেশি প্রয়োজন না হলে অ্যানালিসা লণ্ড্রিতে গরম কাপড় কাচতে পাঠায় না। কিন্তু মাঝে মাঝে না পাঠালেই নয়। আর ওগুলো বাড়িতে কাচাও নিরাপদ নয়, নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা কাপড়ের বেলায় তাকে এতো কথা ভাবতে হয় না। নিজেই কেচে নেয়। বাড়িতে ইলেকট্রিক ইস্ত্রি আছে, সপ্তাহে একদিন তার কাপড় কেচে ইস্ত্রি করবার দিন।

সোমনাথের একটা স্যুট, মিলনের দুটো, তার নিজের একটা ওভারকোট কাচতে না পাঠালে নষ্ট হয়ে যাবে। এখন এতো বেশি ময়লা হয়েছে যে আর পরে বেরুবার উপায় নেই।

কিন্তু অতোগুলো কাপড় কাচাবার খরচ অনেক। সবশুদ্ধ প্রায় পাউণ্ড দেড়েক লাগবে। অতো টাকা কোথায় পারে অ্যানালিসা। মিলন বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের খরচ বেড়েছে কিন্তু খরচের তুলনায় উপার্জন বাড়ে নি। এখন যতোদিন না মিলন বড়ো হয়ে চাকরি করে, যতোদিন না সে বিয়ে করে আলাদা হয়ে যায় ততোদিন খরচ কমবার কোনো সম্ভাবনা নেই!

তবে মিলনের উপর আশা রাখে অ্যানালিসা। তার মতামত শুনে খুশী হয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস মিলন বড়ো হয়ে নাম করবে—সে মহামানব হবে। আসছে বছর বি-এ পরীক্ষা দেবে মিলন। পরীক্ষায় ভালো ফল তার হবেই। সকলেই মিলনের বুদ্ধির প্রশংসা করে, সকলেই তাকে ভালোবাসে।

কিন্তু কয়েক মাস থেকে অ্যানালিসা লক্ষ্য করেছে সোমনাথ যেন মিলনের উপর বেশ বিরূপ হয়ে উঠেছে। দুজনের বেশি বনে না, বাপ-ছেলের মতামত একেবারে আলাদা। সোমনাথ শান্ত স্বভাবের লোক। দুঃখে বুক জলে গেলেও মুখে কিছু প্রকাশ করে না। কিন্তু সেই চাপা প্রকৃতির মানুষ যখন মিলনের সঙ্গে তর্ক করতে করতে বেশ রেগে ঘর ছেড়ে যায় তখন অ্যানালিসা অবাক না

হয়ে পারে না। কেন না মিলন কোনো অন্যায় কথা বলে না আর তার কথায় যেন সোমনাথের চেয়ে বেশি যুক্তিও আছে। তাই মাঝে মাঝে সে যখন মিলনের যুক্তি সমর্থন করে তখন সোমনাথ আরও বেশি ক্ষুণ্ণ হয়। অ্যানালিসা বুঝতে পারে কোথায় তার স্বামীর আঘাত লাগে।

কিন্তু উপায় কি? আর কতোদিন এমন টানাটানি করে সংসার চালানো যায়। সম্পদ অ্যানালিসা চায় না কিন্তু তার বয়স হয়েছে—সে স্বাচ্ছন্দ্য চায়। তাই আজ তার মনে হয় তার স্বামী যদি সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলের কথা না ভেবে তার সংসারের মঙ্গলের কথা আগে ভাবতো তাহলে প্রায় সারা জীবন ধরে তাদের সকলকে এতোখানি কষ্ট করে দিন কাটাতে হতো না। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার চেষ্টা তার স্বামী করলো না কেন? নিজেদের উপবাসী রেখে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের সংস্কৃতির কথা ভেবে লাভ কি?

একদিন ছুটির দিনে লাঞ্চ খাবার পর অ্যানালিসা একটু ইতস্তত করে স্বামীকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলো, দেখো তুমি তো ইচ্ছে করলে ইণ্ডিয়ায় একটা চাকরি পেতে পারো?

সোমনাথ হেসে বললো, কেন ভারতবর্ষ দেখবার শখ তোমার এখনও আছে নাকি?

আছে বৈকি, হাতের উল টেবিলের উপর রেখে অ্যানালিসা বললো, এদেশে এভাবে থাকতে আমার আর ভালো লাগছে না। তুমি যা হয় একটা বন্দোবস্ত করো।

অ্যানালিসার কথা শুনে সোমনাথের মুখে একটা দুঃখের ছায়া নেমে এলো। তবু হাসবার চেষ্টা করে সে বললো, আমার ধারণা ছিলো এতোদিন আমার সঙ্গে ঘর করে তোমার কাছে কোনোদিনও সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা ব্যক্তিগত সুখ আদর্শের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে না।

অ্যানালিসা বললো, তুমি আজও সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো। কিন্তু তোমার যা পাওনা তা ছেড়ে দিলে চলবে কেন? তুমি তা আদায় করে নাও। কী আমার পাওনা অ্যানালিসা?

তোমার গুণের মূল্য। এদেশে কী পেলে তুমি? আমি তো তোমার সঙ্গে একেবারে প্রথম থেকেই আছি, একটু চুপ করে থেকে অ্যানালিসা বললো, আমি দেখেছি তোমার অনেক ঘুমহীন রাত, ভাবনায় দিশাহারা তোমার কতো মুহূর্ত —কিন্তু সেকথা কারা বুঝলো? এরা তোমার জন্যে করলো কী?

অ্যানালিসার মুখের দিকে তাকিয়ে সোমনাথ বললো, এদের তো আমার জন্যে কিছু করবার কথা নয়! এরা কেন করবে? বরং আমাদের দেশের জন্যে কিছু করবার জন্যে আমি এদেশে থেকে গেলাম। করবার কথা আমার, এদের নয়।

তুমি অনেক করেছো। আর না করলেও চলবে। এবার নিজের জন্যে করো, আমার জন্যে করো, সংসারের জন্যে করো।

আমি কী করতে পারি বলো অ্যানালিসা?

ভারতবর্ষে ফিরে চলো। সেখানে নিজের লোকের মধ্যে তুমি এখানকার চেয়ে অনেক ভালো থাকবে, অনেক সুখে থাকবে।

এখানেও আমি খুব সুখে আছি অ্যানালিসা।

না নেই, সোমনাথের গায়ে একটা হাত রেখে গভীর সমবেদনার সুরে অ্যানালিসা বললো, এই ভেবে আমরা দুঃখ হয় যে তুমি যে সুখে নেই সে কথাও তুমি জানো না। ওগো আমার কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা কোরো না, আমি সব বুঝি। এদেশে কে শুনলো তোমার কথা? কে এগিয়ে এলো তোমাকে সাহায্য করতে? এদেশে এতোদিন আমরা রইলাম অথচ দেখো একজন ইংরেজও আমাদের কাছে বন্ধুর মতো এগিয়ে এলো না।

অবাক হয়ে সোমনাথ বললো, এ তুমি কী বলছো? আমার তো সেকথা একবারও মনে হয় না। আজকাল খবরের কাগজ পড়লে দেখতে পাও না দেশ-বিদেশের সম্পর্ক কতো মধুর হয়ে গেছে, অপরিচয়ের প্রাচীর ধ্বসে পড়েছে।

মানি। কিন্তু তুমি দেশে থাকলেও তা ঘটতো। মাঝখান থেকে তুমি শুধু নিজেকে বঞ্চিত করে দীন জীবন কাটিয়ে গেলে। তুমি নিজেকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কার জন্যে কী করতে পারলে বলো?

নিজেকে আমি কষ্ট দিই নি অ্যানালিসা। আমি নিজের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়েছি বলতে পারো, একটু ভেবে সোমনাথ বললো, দারিদ্র্য হয়তো আমার চিরকালের সঙ্গী। দেশে থাকলেও কে জানে আমার এমন অবস্থা হতো কিনা। কিন্তু তাহলে আমার দুঃখের সীমা থাকতো না। তুমি বিশ্বাস করো অ্যানালিসা, এদেশে আমি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন না করতে পারি কিন্তু তবু দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়েও যা পেয়েছি, অনেক রাজা সমস্ত সম্পদ উজাড় করে ঢেলে দিলেও তা পেতে পারে না। আমি পৃথিবীকে পেয়েছি। আমি দূরদূরান্তের সকল মানুষকে বন্ধু মনে করতে পেরেছি। যদি এদেশে না থাকতাম তাহলে কিছুতেই এতো মানুষকে বুকের কাছে টেনে আনতে পারতাম না।

হতাশ দৃষ্টিতে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে অ্যানালিসা বললো, তুমি অন্য জগতে বিচরণ করো সোমনাথ। তুমি আদর্শবাদী আমি জানি। তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এতো ভক্তি আমি পৃথিবীর আর কাউকে কখনও করি নি। তাই আমি তোমাকে দেশে ফিরে যেতে বলছি। এদেশ তোমার মূল্য বুঝবে না! এদেশের জন্যে তুমি কোনোদিকে তাকাবার অবসর পেলে না অথচ এরা তোমার দিকে ফিরেও দেখলো না। শুধু তুমি ভারতীয় বলে তোমাকে কোণঠাসা করে রাখলো। অন্য কথা থাক, কিন্তু কারখানায় তোমার কি আরও অনেক বেশি উন্নতি হওয়া উচিত ছিলো না? তোমার মতো বিদ্যা ও-কারখানায় কজনের আছে? সোমনাথ বললো, কী যে বলো! আমি ভারতীয় বলে আমার উন্নতি হচ্ছে না সে কথা ঠিক নয়—

বাধা দিয়ে অ্যানালিসা বললো, সে কথাই ঠিক। এ জাতের কোনো ত্রুটি আমার চোখে পড়ে না। কিন্তু আমি খুব ভালো করে বুঝেছি যে জগৎ শুধু নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু ভেবে দেখে না। সংস্কৃতির বিনিময় এরা দায়ে পড়ে করতে পারে, অন্য কোনো কারণে করবে না। চোখে বিদ্বেষ নিয়ে অ্যানালিসা বললো, আজ যদি তুমি জার্মানিতে থাকতে সেখানে অসংখ্য লোক তোমাকে শ্রদ্ধা করতো, ভালোবাসতো। এমন করে একঘরে করে কৃপার চোখে দেখতো না।

এরা আমাকে কৃপার চোখে দেখে সে কথা তোমাকে কে বললো অ্যানালিসা ? বলবে আবার কে, এতোদিন এখানে বাস করে আমি নিজেই বুঝতে পেরেছি। তুমি যখন পৃথিবীর কল্যাণের কথা ভেবে এদের নানা কথা বলো, তখন তুমি কি বুঝতে পারো না যে এরা ভাবে শ্রেষ্ঠ জাত বলে তুমি এদের কৃপা ভিক্ষা করছো ?

না-না, সে কথা ঠিক নয়। এসব তোমার অভিমানের কথা, রাগের কথা, বিদ্বেষের কথা।

না, এগুলি সত্যি কথা। দুএক মিনিট চুপ করে থেকে অ্যানালিসা বললো, আজ আমার মনে হয় তুমি ভারতবর্ষ থেকে কাজ করলে তোমার পরিশ্রম সার্থক হতো, তুমি সম্মান পেতে, তোমার এমন অবস্থা হতো না।

সোমনাথের শান্ত মুখে অব্যক্ত বেদনার ছায়া ফুটে উঠলো। আস্তে আস্তে সে শুধু বললো, আমার যা কাজ, যে আদর্শ, তাতে লাভ-লোকসানের হিসেব করা চলে না। সমস্ত বিদ্বেষ ভুলে আমি শুধু পৃথিবীর সেবা করতে চাই সে কথা তুমি জানো, সোমনাথ থেমে গেলো। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললো, সংসারের জন্যে আমি দুঃখিত। আমি অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছি দেশ ছেড়ে এই অভাবের মধ্যে থাকতে তোমার খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে। বেশ তুমি বলো, আমি কী করলে তুমি খুব খুশী হও ?

লজ্জা পেয়ে অ্যানালিসা বললো, ছি ছি, এমন কথা তুমি আমাকে বোলো না। যদি কিছু অন্যায় বলে থাকি তুমি ক্ষমা করো। অভাবের মধ্যে থাকতে আমার এতোটুকু কষ্ট হচ্ছে না, তুমি বিশ্বাস করো। আমি জার্মান, অভাব দারিদ্র্য কোনো কিছুকেই আমি ভয় করি না। কিন্তু তোমার মুখের দিকে তাকালে দুঃখে আমার বুক ভেঙে যায়। চুলচেরা হিসেব করে যারা পা ফেলে তাদের দেশে আর যাকে মানাক, তোমাকে একেবারেই মানায় না সেকথা ভেবে আমি শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি।

না অ্যানালিসা, আমার জন্যে দুঃখ কোরো না। স্বীকার করা ভালো যে তোমার সব কথা আমি মেনে নিতে পারলাম না। কিন্তু আমি যতোদিন বেঁচে থাকবো

ততোদিন বিশ্বাস রাখবো যে পৃথিবীতে শান্তি আসবেই। শুধু আমার একার কাজে রাতারাতি ফললাভ হবে না সেকথা ঠিক, কিন্তু একথাও তোমাকে বলি যে আরও অনেকে আমি যা করেছি তাই করবে। এমনি করে যখন অনেক মানুষ শান্তির কথা ভাববে, মহামিলনের কথা ভাববে তখনি দিকে দিকে বেজে উঠবে মৈত্রীর গান। আমার একার ক্ষমতা কতোটুকু।

সোমনাথের মুখ থেকে এতো কথা শোনবার পর অ্যানালিসা আর কথা বাড়াতে চাইলো না। তার আজকাল সব সময় ভয় হয় পাছে স্বামী তার কথার সঠিক অর্থ বুঝতে না পারে, পাছে সে তাকে ভুল বোঝে।

মহাত্মা গান্ধী মারা যাবার পর সোমনাথ যেন কেমন হয়ে গেছে। তাঁর কথা উঠলেই আজও সোমনাথের চোখ ছলছল করে ওঠে। এ হত্যা যেন তার সবচেয়ে বড়ো পরাজয়। অ্যানালিসা তাই ঠিক করলো যে এখন স্বামীর সঙ্গে আদর্শের আলোচনা না করাই ভালো, একেই গান্ধীজীর মৃত্যুতে সোমনাথ প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, তার উপর সে যদি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে যে স্ত্রী আর তার আদর্শে আস্থা রাখে না তাহলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হবে।

সোমনাথ মুখে কিছু না বললেও তার চেহারা দেখলেই অ্যানালিসা বুঝতে পারে যে অন্তর্দ্বন্দ্বে তার মন জ্বলে যাচ্ছে। হয়তো সোমনাথ বুঝতে পেরেছে এতো বছর ধরে এতো কাণ্ড করলেও এদেশের লোকে তাকে প্রবাসী মনে করে দূরে সরিয়ে রেখেছে। হয়তো দেশে থাকলে এতো কষ্ট তাকে কিছুতেই পেতে হতো না, এতো অল্প অর্থে সংসার চালাতে হতো না। এদেশে না এসে দেশে বসে সত্যি সে এর চেয়ে বেশি কাজ করতে পারতো। তার মনের আসল খবর জানবার জন্যেই অ্যানালিসা কথা তুলেছিলো, ভারতবর্ষে নিজে সুখে বাস করবার কল্পনায় নয়। যা হোক, আজ স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো যে যা হয় হোক, আর কখনও এমন করে সংসারের অভাব-অনটনের কথা তুলে সোমনাথকে কোনো পরামর্শ দেবে না। আর কদিনই বা তাদের আয়ু! এতোদিন যখন এমন করে কাটিয়ে দিতে পারলো

তখন বাকি কটা দিনও অনায়াসেই কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু দারিদ্র্যের জালায় দিশা হারাবে না কোনোদিন।

অনেকদিন পরে আবার দেশের কথা মনে পড়লো অ্যানালিসার। আর বোধহয় জীবনে জার্মানিতে ফিরে যাওয়া হবে না। যদি স্বামীর সঙ্গে বার্লিনে সে থাকতে পারতো তাহলে দেশের যেমন হোক না কেন তাদের সুখের অন্ত থাকতো না। তার দৃঢ়বিশ্বাস যে সোমনাথ সেখানে অনেক বেশি সম্মান পেতো। কিন্তু আজ এতোদিন পর সে আশা করা বৃথা। অ্যানালিসা জানে না জার্মানি এখন কী রূপ নিয়েছে। তবু মাঝে মাঝে তার এই শুকনো আন্তরিকতাহীন দেশে থাকতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। আজও তার স্বামীর সঙ্গে জার্মানি বেড়িয়ে আসা সম্ভব হলো না। কেবলই অর্থাভাব। বিয়ের পর থেকেই ওরা ভেবেছে সুযোগ হলেই জার্মানি ঘুরে আসবে। কিন্তু কই আজও সুযোগ হলো না। কিন্তু তবু আশা রাখে অ্যানালিসা। স্বামীর সঙ্গে না হোক, মরবার আগে মিলনের সঙ্গে নিশ্চয়ই সে দেশে যাবে। হে ঈশ্বর, তার শেষ নিশ্বাস যেন মাতৃভূমিতেই পড়ে। আহা, কতোদিন যে সে ভুলে আছে জার্মানিকে। তাড়াতাড়ি অ্যানালিসা অন্য কথা ভাববার চেষ্টা করলো। দেশের কথা ভাবলেই আজকাল তার চোখ ছলছল করে ওঠে। সে কিছুতেই বুঝতে পারে না এতোদিন পর হঠাৎ কেন জন্মভূমি তাকে এমন করে ক্ষণে ক্ষণে ডাকে। এদেশে যখন আসে তখন সে তো চিরকালের জন্য দেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলো। সে তো ভাবে নি যে আর কোনোদিন সেখানে ফিরে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হবে। দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলো বলেই তো এমন স্বামী পাবার সৌভাগ্য তার হয়েছে। তাই সোমনাথের সঙ্গে ঘর করে দেশের জন্যে তার মন আকুল হয়ে ওঠে নি। স্বামীর মধ্যে সে নতুন পৃথিবী খুঁজে পেয়েছিলো। তার সব কিছুই কি ব্যর্থ হলো! কেন বারবার কানে বাজে দেশমাতৃকার আহ্বান। কেন সকলকে, সব কিছুকে তুচ্ছ মনে হয়।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন সংসারে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলো। তার জন্যে ওরা কেউ প্রস্তুত ছিলো না। মিলন ভাবে নি যে তার কথায় সোমনাথ

অতোখানি আঘাত পাবে আর অ্যানালিসা কল্পনা করতে পারে নি যে মিলন এমন করে তার বাপের মুখের উপর অতো কঠিন কথা বলতে পারে। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে অপ্রীতিকর কিন্তু অ্যানালিসা যেন ছেলের মুখে আশ্চর্য নতুন কথা শুনলো। অনেকদিন আগে সোমনাথ তাকে নতুন কথা শুনিয়ে জয় করে নিয়েছিলো। আজ সে কথাগুলি অ্যানালিসা সেদিনকার মতো সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে মেনে নিতে পারে না। অথচ প্রতিবাদ করতেও সাহস পায় না কারণ সোমনাথ আঘাত পাবে আর তার নিজেরও অন্য কোনো যুক্তি নেই। মিলনের কথা শুনে সে খুশী হলো আর ছেলের মত মেনে নিতে ইতস্তত করলো না। কিন্তু তার মনের অবস্থা হয়ে উঠলো মর্মান্তিক। ছেলের মত সে সমর্থন করতে চায় কিন্তু স্বামীকে আঘাত দিতে চায় না। কেমন করে সোমনাথকে বোঝাবে সেই ভাবনায় অশান্তিতে অ্যানালিসার দিন কাটতে লাগলো। আর সংসারে শুধু নিরানন্দের ছায়া নামলো।

মিলনের সঙ্গে অ্যানের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেছে। সে প্রায়ই তাকে এ বাড়িতে নেমন্তন্ন করে। অ্যানালিসা বলে, সুন্দর মেয়ে, ওকে একটু লেখাপড়া শিখিয়ে নে মিলন।

মিলন হেসে বলে, শেখাচ্ছি তো।

মাঝে মাঝে শনিবারে ওদের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে আসে অ্যান। তারপর মিলন আর সে বেরিয়ে পড়ে। ওরা যাবার সময় ওদের দুজনকে জড়িয়ে ধরে অ্যানালিসা বেশ জোরে জোরে বলে, হ্যাভ এ নাইস টাইম চিলড্রেন! ওরা তাকে আদর করে হাত ধরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।

সোমনাথ তখন পাশের ঘরে গুম হয়ে বসে থাকে। মেয়ে বন্ধু নিয়ে ঘুরে বেড়ানো এদেশের রীতি। তাতে সোমনাথের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু অ্যানালিসা এসে যখন তাকে বলে, অমন মুখ কালো করে বসে আছো কেন? ওরা যাচ্ছে, যাও ওদের গিয়ে একবার বলো, হ্যাভ এ নাইস টাইম! সোমনাথ উত্তর দেয় না। তেমন করে বসে থাকে। মেয়ে বন্ধু নিয়ে বেড়াতে যাওয়া এদেশের রীতি হলেও তার ছেলেকে শুভেচ্ছা জানাতে কেমন যেন

সঙ্কোচ হয়। অনেক কষ্ট করে মিলনকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে সোমনাথ। সে ভেবেছিলো যে তার বাকি কাজ ছেলে করবে, ব্যাপক আদর্শে বাপের মতো অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে। সোমনাথ ভালো বংশের ছেলে। মিলন তার একমাত্র বংশধর। রেস্তোঁরার একজন ঝি নিয়ে তার ঘুরে বেড়ানো মোটেই কাম্য নয়। বরং তার পক্ষে এ চরম লজ্জার কথা। অনেকদিন আগে থেকে সোমনাথ ভাবছে যে এ বিষয় নিয়ে মিলনের সঙ্গে একদিন খোলাখুলি আলোচনা করে জেনে নেবে এমন ঘনিষ্ঠতা করবার আসল উদ্দেশ্য কী। সে কি অ্যানকে বিয়ে করবে? তাই যদি করে তাহলে সোমনাথ মিলনকে এখন থেকে সতর্ক করে দেবে। এমন বিয়ে কখনও সুখের হয় না। ওরা অশিক্ষিত ছোটোলোক। ওরা লেখাপড়া জানে না। অমন মেয়ে নিয়ে ঘর করা ভদ্রলোকের শিক্ষিত ছেলের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। দুদিন পরেই দুজনের মোহ ভেঙে যায়। তারপর বাধে গণ্ডগোল। আর জীবন অশান্তিতে ভরে ওঠে। অতো কথা মনে মনে ভেবে রাখলেও আজও মিলনের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব হয় নি। কেন না সোমনাথ ভেবে পায় নি কেমন করে কথা তুলবে। যদিও সে বাইরে থেকে ওদের সম্পর্কে নানাকথা শুনেছে কিন্তু মিলন নিজে তখনও কিছু বলে নি। সোমনাথ অ্যানালিসাকে জিজ্ঞেস করলো, মিলনের কি আর কোনো ভালো বন্ধু নেই? অ্যানের সঙ্গে ও কী অতো কথা বলে?

বন্ধু আছে হয়তো, আমি ঠিক জানি না। তবে অ্যানের সঙ্গেই ওর সবচেয়ে বেশি ভাব।

তা তো দেখতে পাই। কিন্তু বাঙালী মহলে পাঁচজনে পাঁচকথা এর মধ্যেই বলতে আরম্ভ করেছে। ওদের মধ্যে প্রেম নেই নিশ্চয়?

জানি না। থাকলেই বা ক্ষতি কি?

অবাক হয়ে সোমনাথ বললো, কী বলছো অ্যানালিসা! ক্ষতি নেই? ওকে কি আমরা কষ্ট করে লেখাপড়া শেখালাম রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেসের সঙ্গে প্রেম করবার জন্যে?

কিন্তু কাউকে ছোটো করে দেখতেও তো শেখাই নি।

কয়েক মুহূর্ত সোমনাথ চুপ করে রইলো। একটু পরে অ্যানালিসার কথা এড়িয়ে গিয়ে বললো, আমার এসব দিকে চোখ রাখবার কথা নয়। কিন্তু তুমি লক্ষ্য রেখো ও যেন লেখাপড়া শিখে অধঃপাতে না যায়। ভালো লোকের সঙ্গে মিশে ভালো কথা না শুনলে ওর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না সে কথা তুমি তো সহজেই বুঝতে পারো।

পারি, কিন্তু অ্যানের ব্যাপারটা তুমি যতো বড়ো করে দেখছো আমি ঠিক ততো বড়ো করে দেখতে পারছি না। মিলনের বয়সই বা কতো! অনেকের সঙ্গেই ও এখন মিশবে। তারপর, আমার মনে হয়, বয়স হলে ঠিক মনের মানুষ খুঁজে বের করবে। কাজেই ওকে এসব ব্যাপার নিয়ে কিছু বলা আমি এখন সমীচীন মনে করি না। দরকার হয় তুমিই বলো।

তুমি না বলতে পারলে আমাকেই বাধ্য হয়ে বলতে হবে। বয়স ওর কম হলেও, এখনই হলো ভালোমন্দ বোঝবার সময়।

কিন্তু অ্যান তো বেশ বুদ্ধিমতী সুন্দরী। চমৎকার কথাবার্তা বলতে পারে। পারলেও ও একটা রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেস।

দৈবদুর্বিপাকে হয়তো ওকে একাজ করতে হচ্ছে, একটু ইতস্তত করে অ্যানালিসা হঠাৎ বলে ফেললো, আমাকেও যেমন একদিন ঝিয়ের কাজ করতে হতো—

সোমনাথ ভাবতে পারে নি যে অ্যানালিসা এতোদিন পর একথা তুলতে পারে। কিছুক্ষণ সে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে অন্য ঘরে বসলো।

সোমনাথ কেন হঠাৎ ঘর থেকে উঠে গেলো সেকথা অ্যানালিসা বুঝতে পারলো না। আজ তা বোঝবার চেষ্টাও করলো না সে! অ্যান আর মিলনের অন্তরঙ্গতা নিয়ে স্বামীর উক্তি তার ভালো লাগে নি। হোক না অ্যান ওয়েট্রেস, তাতে ক্ষতি কি! মিলনের যদি তাকে ভালো লেগে থাকে তাহলে কেন বাধা দেয়া। একজনের ভালো লাগা নানা যুক্তি দিয়ে বিস্বাদ করে করে দেয়ার কোনো অর্থ অ্যানালিসা খুঁজে পেলো না। সোমনাথ ভারতীয়। হয়তো অ্যানালিসার

তাই তাকে ভালো লেগেছিলো। তখন কেউ কি নানাকথা বুঝিয়ে তার মন থেকে সোমনাথকে মুছে ফেলতে পারতো। তাই মিলনকে আজ বাধা দিতে গেলে সে শুনবে কেন! স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার পূর্ণ অধিকার সকলের। মিলন আর অ্যানের সম্পর্ক কতো গভীর তা নিয়ে অ্যানালিসা ছেলের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে বটে কিন্তু কোনো কারণে কখনও বন্ধন ছিন্ন করবার উপদেশ দিতে পারে না। আজ বোধ হয় জীবনে প্রথম সোমনাথের কথাগুলি অ্যানালিসার ভালো লাগলো না।

যা হোক হঠাৎ সোমনাথ পাশের ঘরে উঠে যাওয়ায় অ্যানালিসা ভাবলো যে এ প্রসঙ্গ এইখানেই চাপা পড়লো। এ নিয়ে সোমনাথ আর কোনোদিনও কোনো কথা তুলবে না। কারণ ব্যাপার সামান্য।

কিন্তু শিগগিরই তার ভুল ভাঙলো। কয়েকদিন পর এক শনিবারে একটু বেশি রাত করে মিলন বাড়ি ফিরলো। এর জন্যে চিন্তা করবার অবশ্য কিছু ছিলো না কারণ অ্যানালিসাকে সে জানিয়ে গিয়েছিলো যে আজ অ্যানের সঙ্গে স্ট্র্যাটফোর্ড অন-অ্যাভনএ থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে।

খবর পেয়ে সোমনাথ জেগে বসেছিলো। মিলনের সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার। এভাবে ব্যাপারটা আর বেশি বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। ভরা গ্রীষ্মের রাত। চাঁদ উঠেছে। এ পাড়ার কোলাহল একেবারে থেমে গেলেও মাঝে মাঝে পথিকের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আজ অ্যানালিসারও ঘুম আসে নি। তারা দুজনে ছেলের অপেক্ষায় বসে ছিলো। অবশ্য অ্যানালিসা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে বাপ-ছেলেতে এমন তর্কবিতর্ক হতে পারে। তার স্বামী শান্তিপ্রিয় লোক। সাধারণত কারুর কোনো ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামায় না কিংবা কারুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। মিলনও বাপের স্বভাব পেয়েছে। কথা বলে কম। পরের নিন্দে করে না। কেউ জিজ্ঞেস না করলে গায়ে পড়ে কাউকে নিজের কথা কখনও বলে না। এমন স্বভাবের এক প্রৌঢ় আর এক তরুণ আজ প্রায় মধ্যরাত্রে অ্যানালিসার ধারণা আগাগোড়া বদলে দিলো।

ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন অ্যাভন থেকে রাত বারোটার পর মিলন বাড়ি ফিরলো। তখন বাস বন্ধ হয়ে গেছে। তাই গোল্ডার্সগ্রীন টিউব স্টেশন থেকে সে ট্যাক্সি করে এসেছে।

অতো রাত্তিরে বসবার ঘরে আলো জলতে দেখে মিলন অবাক হলো। আস্তে দরজা খুলে মা-বাবাকে সেখানে বসে থাকতে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করলো, একি তোমরা এখনো জেগে আছো যে?

বোসো মিলন, আমি তোমারই অপেক্ষা করছি, সোফায় সোজা হয়ে বসে সোমনাথ বললো, কী থিয়েটার ছিলো আজ?

চেয়ারে বসে কোটের বোতাম খুলতে খুলতে মিলন বললো, জুলিয়াস সিজার। সুন্দর করেছে বাবা—

অ্যানের কেমন লেগেছে?

খুব ভালো। আমারা দুচার দিন ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভনএ গিয়ে থাকবো ভাবছি।

হুঁ, একটু চুপ করে থেকে সোমনাথ বললো, অ্যানের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব কতোদিনের?

প্রশ্ন শুনে মিলন অবাক হলো। সে ঠিক বুঝতে পারলো না এতো রাত্তিরে কেন সোমনাথ তাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করছে। অ্যানালিসার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো মিলন। মায়ের মুখ দেখে মনে হলো সে যেন বেশ বিচলিত হয়ে উঠেছে।

অ্যানালিসা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, ওসব কথা পরে হবে। আজ অনেক রাত্তির হয়ে গেছে—

তা হোক, মিলন কী করবে না করবে সেকথা আমার অনেক আগেই জানা উচিত ছিলো। বলো মিলন? হ্যাঁ, আর একটা কথা, অ্যান কি ওসব থিয়েটার দেখে মানে বুঝতে পারে?

মিলন উত্তর দিলো, বুঝতে না পারবার তো কোনো কারণ নেই। ইংরেজি ওর মাতৃভাষা—

তা জানি। কিন্তু শেক্সপীয়রের রস উপলব্ধি করতে হলে বিদ্যে থাকা দরকার। রেস্তোর্ঁার ওয়েট্রেসের সে-বিদ্যে আছে কি ?

বাপের মুখ থেকে এমন কথা জীবনে কখনও শোনে নি মিলন। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সোমনাথ তাকে এতোকাল সকল মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে, নিজেও শ্রদ্ধা করে এসেছে। তাই মিলন প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না। হতভম্ব হয়ে চুপ করে রইলো।

মিলন উত্তর দিতে পারলো না দেখে সোমনাথ একদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বললো, আমার কথার উত্তর দিচ্ছো না কেন মিলন ? আমি জানি তুমি সহজে উত্তর দিতে পারবে না কারণ তোমার বলবার কথা কিছু নেই। তোমার এখন বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে। আমি তোমাকে কিছু বারণ করবো না। আর বারণ করলেও তুমি শুনবে না। শুধু আমি তোমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করবো। যদি উত্তর দিতে পারো ভালো আর যদি উত্তর দিতে না পারো তাহলে বুঝবো তুমি অন্যায় করেছো। তোমাকে যদি আমি বুঝিয়ে দিতে পারি যে তুমি অন্যায় করেছো তাহলে আমি বিশ্বাস করি তুমি সে কাজ আর করবে না—

মাথা তুলে মিলন বললো, বলো, কী তোমার জিজ্ঞেস করবার আছে ?

অ্যানের সঙ্গে তুমি এতো বেশি মেশামেশি করো কেন ? লেখাপড়া-জানা কোনো ভদ্র মেয়ের সঙ্গে তোমার কি আলাপ নেই ?

আছে, মিলন দৃঢ়স্বরে বললো, কিন্তু তাদের কাউকে আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া হয়তো আমি ভারতীয় বলে তারাও আমাকে যেন কৃপার চোখে দেখে। তাই আমি আমার আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তাদের কৃপা কুড়োনো সঙ্গত মনে করি না।

মিলন এমন অসঙ্কোচে এসব কথা বলছে দেখে সোমনাথ আশ্চর্য হলো। এবং আরও অনেক কথা তার মুখ থেকে শোনবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বললো, তোমার এ ধারণা ভুল মিলন। আমার মনে হয় তুমি কোনো ভদ্র মেয়ের সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করো নি—

না। চেষ্টা করে সমবেদনা পেতে আমি চাই না। যা স্বতঃস্ফূর্ত তাই আমি চাই।

অ্যানের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী রকম ?

একটু সঙ্কোচ না করে মিলন উত্তর দিলো, প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে আমাদের। আমি অ্যানকে ভালোবাসি।

দেখতে দেখতে সোমনাথের মুখ বিকৃত হয়ে উঠলো। কপাল ঘেমে উঠলো তার। অ্যানালিসা সোমনাথের এমন জ্বালাময় চেহারা আর কখনও দেখে নি। ভাঙা গলায় থেমে থেমে মিলনের কথার উত্তরে সোমনাথ বললো, তুমি আমার একমাত্র বংশধর। আমি এদেশে থেকে দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছি আমার মহৎ আদর্শের জন্যে। তবু আমার বংশে কোনো কালি মাখাই নি। কিন্তু এ তুমি কী করলে মিলন ?

অবাক হয়ে মিলন বললো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কী বলতে চাচ্ছো বাবা ?

তুমি কি অ্যানকে বিয়ে করবার কথা ভাবছো নাকি ?

শুধু ভাবছি না। আমি পাশ করে চাকরি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ওকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি।

মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে সোমনাথ বললো, আমি জানতাম তুমি এইরকম একটা কিছু বলবে তাই তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে এতো রাত্তির অবধি বসে আছি।

আমি যথাসময়ে তোমাকে জানাতাম। এতো আগে জানিয়ে কিছু লাভ নেই বলে আমি কোনো কথা বলি নি।

মিলন, সোমনাথ বললো, তোমাকে আমি কোনোদিন কোনো কিছু করতে বারণ করি নি। বরং ছেলেবেলা থেকে আমি তোমাকে যে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছি, তুমি খোঁজ নিয়ে দেখলে জানতে পারবে, কোনো বাপ এতোখানি স্বাধীনতা ছেলেকে দেয় না।

সেকথা আমি জানি বাবা।

তাহলে সেই স্বাধীনতা তুমি কেন এমন করে নষ্ট করলে ?

আমার মনে হয় না আমি কিছু নষ্ট করেছি। আমাকে বুঝিয়ে দাও কেন তুমি একথা বলছো ?

অ্যানকে বিয়ে করা মানে আমাকে চরম অপমান করা।

কেন ?

কারণ সে একটা ওয়েট্রেস—

আমাকে বিয়ে করার পর আর ওয়েট্রেস থাকবে না। পেটের দায়ে লোককে অনেক কিছু করতে হয় কিন্তু সেটা তাদের একমাত্র পরিচয় নয়, বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে মিলন হঠাৎ বলে ফেললো, এই যেমন তোমাকে ইংল্যাণ্ডের কারখানায় কুলিগিরি করতে হচ্ছে—

সোমনাথের সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো, আমার সঙ্গে তুমি যার তার তুলনা করবে না মিলন। জানো যে আমি পেটের দায়ে এখানে থেকে যাই নি, আমি থেকেছি একটা বিরাট আদর্শের জন্যে, একটা মহা কাজের জন্যে—

তা জানি বলেই তো অ্যানের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠতা করেছি। আমার ধারণা ছিলো তুমি এতে খুশি হয়ে আমার সৎসাহসের প্রশংসা করবে। কারণ ছেলেবেলা থেকে তুমি আমাকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছো। তুমি বার বার বলেছো, শ্রদ্ধা যার ধর্ম নয় সে কারুরই শ্রদ্ধা পায় না। তাই আজ বারবার তুমি অ্যানকে ওয়েট্রেস বলে তুচ্ছ করছো জেনে আমি মনে মনে কম অবাক হচ্ছি না। আর তোমার আদর্শ কি তাও বুঝতে পারছি না।

ধীর গম্ভীর স্বরে সোমনাথ বললো, আশ্চর্য মিলন! তুমি জানো না আমার আদর্শ হলো সংস্কৃতির বিনিময়।

এতোদিন তাই জানতাম। কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার ধারণা বদলে যাচ্ছে। আমি অ্যানকে বিয়ে করবো ও মানুষ বলে, ওয়েট্রেস বলে ওকে তুচ্ছ করে দূরে সরিয়ে রাখবার মনের শিক্ষা আমার নয়।

কিন্তু তার যে শিক্ষা সংস্কৃতি কিছুই নেই—

নেই তা হতে পারে না, তোমার যা আদর্শ তাতে হয়তো অ্যানের শিক্ষা সংস্কৃতি চোখে পড়বার কথা নয়—চোখে পড়লেও তুমি তার কোনো মূল্য দেবে না। কিন্তু আমি দেবো বললে ভুল হবে, এর মধ্যেই দিয়েছি বলা ভালো।

মিলন আমি তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি এ সম্পর্ক ভেঙে দাও। একজন লেখাপড়া-জানা ভদ্র মেয়েকে বিয়ে করো। এদেশে আমাকে পাঁচজন শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। তুমি এ বিয়ে করলে আমি কারুর কাছে কিছুতেই মুখ দেখাতে পারবো না। সকলে আমাকে বিদ্রূপ করবে।

শুধু এই তুচ্ছ কারণের জন্যে আমি অ্যানকে প্রবঞ্চনা করতে পারি না বাবা।

কারণ তুচ্ছ নয় মিলন। তোমার বয়স কম বলে তুমি বুঝতে পারছো না কী সাংঘাতিক কাজ তুমি করতে যাচ্ছো। একেই আমাদের দেশের সকলের ধারণা ভারতীয়মাত্রই ইংল্যাণ্ডে ঝি বিয়ে করে—তুমি যদি সত্যি শেষ অবধি একজন ওয়েট্রেসকে বিয়ে করো তাহলে এত বড়ো বংশের নাম তুমি একেবারে ডুবিয়ে দেবে।

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে মিলন উত্তর দিলো, আমি না ডোবালেও এই কারণে যে বংশের নাম ডোবে সে-বংশের নাম আজ হোক কাল হোক ডুবে যাবেই। বাবা আজ প্রথম নয়, আমি অনেকদিন আগেই তোমাদের মতো আদর্শ যাদের তাদের ওপর শ্রদ্ধা হারিয়েছি। তাই আজ তোমার সামনে বলতে পারছি যে তোমার ওপর আমার কোনো সহানুভূতি নেই, তোমার আদর্শের কোনো মূল্য আমি দিই না।

ম্লান স্বরে সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি বলতে চাও মিলন আরও স্পষ্ট করে বলো।

আমি জানি আমার কথায় তুমি আজ প্রচণ্ড আঘাত পাবে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আর উপায় নেই বলে যখন কথা উঠেছে তখন আমাকে স্পষ্ট করে সব কথা বলতেই হবে। একটু থেমে অ্যানালিসার ভীত চোখের দিকে

তাকিয়ে মিলন আবার বলতে লাগলো, কলেজে ভর্তি হবার পর বর্তমান সমাজের কথা, সমাজ-ব্যবস্থার কথা আমি যখন সামান্য বুঝতে শিখলাম তখন তোমার আদর্শের ওপর আমার আস্থা কমতে শুরু করলো। তুমি ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে যে অনেকদিন হলো তোমার কথা আমি মন দিয়ে বোঝা ছেড়ে দিয়েছি, তোমার কাজে কোনো উৎসাহ প্রকাশ করি নি। তুমি যখন আশা রাখতে যে আমিও তোমার মতো সংস্কৃতির বিনিময়ের তালে তাল মেলাবো তখন আমি তোমাকে অনেকবার আকারে-ইঙ্গিতে চেষ্টা করতাম যে আমার কাজ একেবারে অন্য রকম। তবু এতোদিন তোমার আদর্শের ওপর আমার শ্রদ্ধা না থাকলেও সহানুভূতি ছিলো কিন্তু তোমার কথা শুনে আজ থেকে তাও বোধ হয় আর থাকবে না। কারণ তোমার ও আদর্শ হলো স্বার্থপর সুবিধাবাদীদের জন্য—আর কারুর জন্যে নয়।

এতো বড়ো কথা তুমি বিনা দ্বিধায় আমাকে বলতে সাহস করো? তুমি বলতে চাও আমি স্বার্থপর—সুবিধাবাদী?

আমাকে ভুল বুঝো না বাবা। আমি তোমাকে কোনো অপবাদ দিতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই তোমার যা আদর্শ তাতে শুধু স্বার্থপর আর সুবিধাবাদী লোকের লাভ হবে আর তোমার হবে শুধু লোকসান।

একটা বিরাট কাজের ভার নিয়ে নিজের লাভ-লোকসানের কথা ভাবলে চলে না মিলন। তুমি জেনে রেখো আমি এতোদিন শুধু সমস্ত পৃথিবীর শান্তি কামনা করে এসেছি।

হ্যাঁ কিন্তু নিজেকে বঞ্চিত করে। তুমি ভেবে দেখো বাবা আজ তোমার কি আছে। নাম যশ অর্থ কিছু নেই। আমি জানি তুমি এখুনি বলবে, ওসবে আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুমি যাদের জন্যে শান্তিমন্ত্র জপে এসেছো তাদের কি তোমাকে দেবার কিছুই নেই? ভারতবর্ষ কিংবা ইউরোপ— তোমার কাছে কেউ কোনো ঋণ স্বীকার করবে না। কারণ তোমাকে বঞ্চিত করে, তোমাকে কৃপার চোখে দেখে, তোমাকে কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে শুধু দুই দেশের এক শ্রেণীর লোক গুছিয়ে নিয়েছে।

না মিলন, আমাকে কেউ কৃপার চোখে দেখে নি—

দেখতো না যদি তুমি অ্যান আর যারা তার মতো অবস্থার লোক তাদের আপনার মনে করতে পারতে, দেশে দেশে সেই শ্রেণীর লোকের সংস্কৃতির বিনিময়ের চেষ্টা করে যদি তাদের শক্তিমান করে তুলতে পারতে। কিন্তু তুমি নিজেকে যাদের একজন ভেবে যাদের সুবিধার পথ প্রস্তুত করতে গেছো তারা এদেশের লোক হোক কিংবা ভারতবর্ষের মানুষ হোক তোমাকে কৃপার চোখে দেখবেই কারণ তুমি আজ দরিদ্র।

দরিদ্র হলেও শুধু আমার মুখ থেকে ভারতবর্ষের কথা শুনে এদেশের হাজার হাজার লোক আমার দেশকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে।

কিন্তু সেকাজের জন্য ভারত সরকার প্রতিনিধি পাঠিয়ে এদেশে আপিস খুলেছে। নিজের স্বার্থ সরকারমাত্রেই দেখে। তুমি এদেশে না থাকলেও কাজের কোনো ক্ষতি হতো বলে আমার মনে হয় না। তাই তোমার আদর্শ আর কাজকে শ্রদ্ধা করলেও আমি খুব বেশি মূল্য দিই না; বাপের বিচলিত মুখের দিকে তাকিয়ে না থেমে মিলন বলে চললো, তোমার কাজের আশ্চর্য মূল্য তুমি পেতে যদি তুমি দেশ-বিদেশের গরিবদের দিকে তাকিয়ে দেখতে। কিন্তু তা তুমি পারো নি কারণ মুখে হাজার সংস্কৃতি-বিনিময়ের মন্ত্র আওড়ালেও একমুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারো নি যে তুমি বড়ো বংশের ছেলে। অবশ্য এ দোষ তোমার নয়। তুমি যে চোখে অ্যানকে দেখো, এই ডেমক্রেসির দেশেও তোমার মতো বড়ো বংশের আরও অনেকে ঠিক সেই চোখেই দেখে। তারা শুধু ডেমক্রেসির ভান করে। কিন্তু এই কৃপার চোখে দেখা আর খুব বেশিদিন চলবে না কেননা যারা দরিদ্র তারা বোধহয় আর নির্বিকারভাবে নিজেদের বঞ্চিত করে বংশের নাম রাখবার জন্যে আমাদের কোনো সুবিধা দেবে না।

মিলনের কথা শুনতে শুনতে সোমনাথ আর সোফায় বসে থাকতে পারলো না। ট্রাউজারস-এর পকেট থেকে রুমাল বের করে বার বার নাকের ঘাম মুছতে মুছতে পায়চারি করতে লাগলো। আর অ্যানালিসা শুধু নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে মিলনের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলো।

ভগ্নস্বরে এক সময়ে সোমনাথ আস্তে আস্তে বললো, মিলন তুমি এখন ঘরে গিয়ে শুতে পারো, তোমাকে জিজ্ঞেস করবার আর আমার কিছু নেই। তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো।

সোমনাথের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিলন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি জানতাম আমার কথা শুনলে তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়বে—

সোমনাথ নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে বললো, না মিলন আমি উত্তেজিত হই নি।

তুমি আমাকে ক্ষমা করো বাবা। আজ এ কথাগুলি তোমাকে না বললে চলতো না। সংস্কৃতির বিনিময়—এ দুটি কথা শুনতে ভালো হলেও পরিষ্কার অর্থ বোঝা কঠিন। তাই আমি শুধু আমার মত তোমাকে জানালাম—

ঠিক আছে মিলন। সব বুঝেছি। তুমি শুতে যাও।

চোখে মুখে বিষণ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ধীর পাদক্ষেপে মিলন দোতলায় নিজের শোবার ঘরে চলে গেলো। সোমনাথ অনেকক্ষণ অ্যানালিসার সঙ্গে কোনো কথা বললো না। ছেলের কথাগুলি শোনবার পর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে তার যেন লজ্জা করতে লাগলো।

এক সময় অ্যানালিসা উঠে এসে তার হাত ধরে বললো, রাত হয়েছে, শুতে যাবে না?

হ্যাঁ যাবো, শূন্য দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সোমনাথ বললো, যার যা খুশি করুক, হলোই বা নিজের ছেলে, আমি বাধা দিতে যাবো কেন!

অ্যানালিসা মৃদুস্বরে আর একবার বললো, অনেক রাত হয়েছে, এবার শোবে চলো।

চলো, সোমনাথ যেন তার ক্লান্ত দেহ অ্যানালিসার কাঁধে এলিয়ে দিতে চাইলো।

এক বছর পরে

অনেক গোলমালের মধ্যে দিয়ে সমস্ত বন্ধন অবশেষে ছিন্ন করা হলো। অনঙ্গ দাশ জানতো যে এমন হবেই। এখন সে একেবারে একা। তার আর কোনো দায় নেই, দায়িত্ব নেই। প্যাট্রিসিয়া আগে মামলা করেছিলো। অনঙ্গ দাশের হার হলো মামলায়। প্যাট্রিসিয়া যে জিতবে সেকথাও অজানা ছিলো না তার। শাদা লোকের দেশ শাদা লোকের পক্ষ নেয় সব সময়।

এই ব্যাপারে অনঙ্গ দাশের প্রায় পাচশ পাউণ্ড খরচ হয়ে গেল। এতো টাকা অকারণে লোকসান দেবার জন্যে সে প্রস্তুত ছিলো না। কিন্তু আইনের গেরো ছাড়াবার উপায় রইলো না তার।

যাক আপদ বিদায় হলো। কিন্তু মামলার রায় বেরুবার পর কিছুদিন অনঙ্গ দাশের চোখে ঘুম ছিলো না। টাকার জন্যে তাকে দোরে দোরে ঘুরতে হয়েছিলো। কিন্তু পাঁচশ পাউণ্ড জোগাড় করা সহজ কথা নয়। রাগে দুঃখে অপমানে অভিমানে দেহমন জলে যাচ্ছিলো অনঙ্গ দাশের। এর মধ্যে প্যাট্রিসিয়া আবার কঠিন তাগাদা দিয়েছে। তাড়াতাড়ি টাকা না দিলে সে উকিলের সাহায্য নিয়ে সে টাকা আদায় করে নেবে। ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করে বিলেতে থাকার সাধ মিটে গেছে তার। অনঙ্গ দাশ জানে কোনো সহানুভূতি প্যাট্রিসিয়া দেখাবে না, তাকে অবিলম্বে যেমন করে হোক টাকা দিতেই হবে। তবু এই ভেবে অনঙ্গ দাশ শান্তি পেলো যে অল্প টাকার ওপর দিয়ে ব্যাপারটা চুকে গেলো। কিছু বিশ্বাস নেই এদেশের মেয়েদের। ইচ্ছে করলে আরও নানারকম অপবাদ দিয়ে প্যাট্রিসিয়া অনেক বেশি টাকা আদায় করে নিতে পারতো। এদেশের মেয়েদের যখন সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার ইচ্ছে হয় তখন টাকা ছাড়া তাদের আর কোনো কিছুর দিকে চোখ থাকে না, দয়া মায়া সমবেদনা—ক্ষণকালের জন্যেও তাদের মন বিচলিত করে না কিছুতেই। অনঙ্গ দাশের আর্থিক অবস্থা প্যাট্রিসিয়া ভালো করেই জানে। তবু সে তো

একবারও তার কথা বিবেচনা করে দেখলো না। সমস্ত জেনে শুনেও বারবার তাগাদা দিয়ে অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে তুললো। কিন্তু এতে অবাক হবার কিছু নেই, এমন হয়, এমন হবেই।

কারুর কাছ থেকে টাকা জোগাড় করতে না পেরে অবশেষে বাড়ি বন্ধক দিয়ে অনঙ্গ দাশকে টাকা নিতে হলো। সেই সময় যখন কাগজপত্র সই করছিলো সে তখন তার চোখে জল চিকচিক করে উঠেছিলো। হয়তো এই প্যাট্রিসিয়া চেয়েছিলো তাই বারবার টাকার জন্যে তাগাদা দিচ্ছিলো। সে নিশ্চয়ই জানতো যে বাড়িতে হাত না দিলে কিছুতেই অনঙ্গ দাশের পক্ষে টাকা জোগাড় করা সম্ভব হবে না। আর সে হয়তো আরও ভেবে আনন্দ পেয়েছিলো যে একবার বাড়ি বন্ধক দিলে তা মুক্ত করবার ক্ষমতা এ জীবনে আর অনঙ্গ দাশের হবে না। ভেবেছিলো, ভিখিরির মতো গিয়ে তার কাছে সময় চাইবে, আস্তে আস্তে টাকা দেবার বন্দোবস্ত করবে।

কিন্তু অনঙ্গ দাশের শিক্ষা হয়ে গেছে। এদেশের মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে তার মতো গভীর জ্ঞান বোধ হয় খুব বেশি লোকের হয় নি। এখন যদি সে খেতে না পেয়ে কঠিন রোগের দারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করে তবু প্যাট্রিসিয়া ফিরে তাকাবে না তার দিকে, মানুষের সনাতন মনোবৃত্তি নিয়ে কাছে এসে স্পর্শ করবে না কিছুতেই। বরং দূর থেকে মজা দেখবে আর আরও পাঁচজনকে ডেকে তার অবস্থার বর্ণনা করে বলবে, দেখো লোকটা কেমন জব্দ হয়েছে। হাতে হাতে পাপের ফল পেয়েছে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

এরা যখন ধর্মের কথা বলে আর টুপি মাথায় দিয়ে ঘন ঘন গির্জেয় যায় তখন তাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে অনঙ্গ দাশ ভাবে, এতো বড়ো প্রবঞ্চকের জাত বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। পরের কথা যারা ভাবে না, পরের দুঃখে যাদের চোখে জল জমে না তারা আর যাই হোক না কেন, মানুষ নয়। স্বার্থ ছাড়া এরা এক পাও চলে না। সব সময় শুধু নিজের সুখ-সুবিধার কথা ভাবে। অনঙ্গ দাশ তার এতো বছরের অভিজ্ঞতায় এদের পশু বলে মনে করে। তাই পশুর সঙ্গে এদের সবচেয়ে বেশি ভাব। মানুষের

দুঃখে এরা তেমন করে কাঁদে না কিন্তু কুকুরের শোকে পৃথিবী ভাসিয়ে দেয়। স্বার্থ ছাড়া আর কীই বা থাকবে এদের। খ্রীষ্ট ধর্মের গুরু স্বয়ং যীশু জাতে ছিলেন ইহুদি। তাই এরাও হাত টান করে চলতে শিখেছে। পরকে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে ভারতবর্ষের লোকে যে গভীর তৃপ্তি পায় তার স্বাদ পাবার যোগ্যতা খ্রীষ্টানদের নেই—থাকতে পারে না। শুধু শুষ্ক নীরস ভয়ঙ্কর স্বার্থ এদের সম্বল। তাই এদের মধ্যে আন্তরিকতা নেই, শুধু আছে প্রাণহীন লৌকিকতা। দরিদ্র ভাই যদি মারা যায় তাহলে তার ছেলেমেয়েদের দাদা দেখে না। তারা ভর্তি হয় অনাথ আশ্রমে। সেখানে মানুষ হওয়া এদের কাছে লজ্জার বিষয় নয়। শুধু ইহজীবনে বিশ্বাস করে বলে এরা শরীর-বিলাসের কথা অতো বেশি করে ভাবে। তা ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই ইংল্যাণ্ডে দার্শনিকের সংখ্যা কম। শুধু খাও দাও আর ফূর্তি করো। দরদ নেই, সমবেদনা নেই, সহানুভূতি নেই। এসব কথা ভাবতে ভাবতে শরীর মন জ্বলতে থাকে অনঙ্গ দাশের। তার দুর্ভাগ্য যে সোনার ভারতবর্ষ ছেড়ে এই স্বার্থপরের দেশে তাকে মরতে হবে।

দেশে ফিরে যাবার আর কোনো উপায় নেই। সেখানে তার আপনার কেউ কিছু না করলেও অজস্র দেশের লোক আছে, যারা ভালোবাসতে জানে, যারা শ্রদ্ধা করতে জানে, যারা নিজের সুখসুবিধা তুচ্ছ করে সর্বস্ব উজাড় করে ঢেলে দিয়ে পরের সেবা করতে জানে। সেখানে কী নিয়ে ফিরবে অনঙ্গ দাশ? সেখানে কী নিয়ে যাবে? সে যে তার নিজের দেশ—তার অনুপমার জন্মভূমি। অনঙ্গ দাশের স্থির বিশ্বাস যে যদি কোনো রকমে সে ভারতবর্ষে ফিরে যেতে পারে তাহলে সেখানকার কোমল মৃত্তিকা পায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। এ জীবনে অনেক আঘাত পেলেও দেশের হাওয়ায় নিশ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গেই মুছে যাবে তার গ্লানি। সে শান্তিতে মরতে পারবে। কিন্তু সে যে অনেকদূর—কতদূর—কতদূর! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনঙ্গ দাশের। পঞ্চাশের ওপর বয়স হলো। এদেশে এতোদিন রয়েছে সে, স্বাস্থ্য খারাপ হবার কথা নয়। কিন্তু বিচ্ছেদের মামলায় হেরে যাবার পর কী যেন হয়েছে তার।

কিছু আর ভালো লাগছে না; কাউকে আর মনে ধরছে না। শুধু সারাদিন নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে। চুল টেনে দেয়ালে অনেকক্ষণ মাথা ঠুকলে বোধ হয় সে শান্তি পায়। ঘরে মন টেঁকে না, বাইরে ভালো লাগে না। শুধু পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কাউকে আর চায় না সে, কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। তবু ক্লান্তিতে যখন দেহ ভেঙে পড়ে, মন অবসন্ন হয়, খাটে শুয়ে বুকের অব্যক্ত যন্ত্রণায় অকারণে এপাশ ওপাশ করে, তখন তার গলা চিরে যেন বেরিয়ে আসে, ভগবান, কোনো ভারতীয় যেন এ দেশের মেয়ে বিয়ে না করে, কারুর যেন এদেশে চিরকাল বাস করবার দুর্মতি না হয়।

অনঙ্গ দাশের নিজের কাছে স্বীকার করতে আজ আর লজ্জা নেই যে কেবলমাত্র যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে ভারতীয়রা এদেশে চিরকাল বাস করবার আগ্রহ প্রকাশ করে। ছাত্র অবস্থায় প্রথম এখানে এসে তারা সুলভে যৌবন উপভোগ করতে শেখে। তারপর এদেশে স্বার্থপর জাতের সঙ্গে থাকতে থাকতে দেশের যা-কিছু ভালো গুণ নষ্ট হয়ে যায় আর প্রবল হয় শুধু ভোগের লিপ্সা। তখন আর কিছুতেই দেশে ফিরতে ইচ্ছে করে না। যৌন প্রবৃত্তির কাছে সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ এক সময় ফুরিয়ে আসে দিন। খেলা শেষ হয়। তখন যৌবন নেই, বার্ধক্যের ক্লান্তি আচ্ছন্ন করেছে শরীর মন। মোহ ভেঙে গেছে। দেহের ক্ষুধা আজ আর দিশাহারা করে না, আজ প্রবল হয়ে ওঠে মনের ক্ষুধা। সে-ক্ষুধা মেটাবার সাধ্য নেই ইউরোপের। তখন প্রত্যেক ভারতীয়র তীর্থ ভারতবর্ষ—প্রত্যেকের সম্পদ ভারতীয় দর্শন। কিন্তু সে-তীর্থ দর্শনের উপায় তো নেই আর। তাই বুকে জমে দীর্ঘশ্বাস, চোখে আসে জল, তাই গ্লানি আর অবসাদে ভেঙে পড়ে মন।

ঠিকমতো অফিস করতে পারলো না অনঙ্গ দাস। হঠাৎ সে যেন খুব বেশি দুর্বল হয়ে পড়লো। বাইরে একথা প্রকাশ করবার লোক সে নয়। কিন্তু তার মুখ দেখলেই বোঝা যায় যে শরীরের অবস্থা খুব বেশি ভালো নয়। দু-একজন সে কথা তাকে জানাবার পর সে সাবধান হয়ে গেলো। বাইরের লোক যদি

বুঝতে পারে যে এই বিচ্ছেদের মামলায় হেরে গিয়ে তার এই দুর্গতি হয়েছে তাহলে লজ্জার সীমা থাকবে না। কিন্তু তবু অনঙ্গ দাশ ছুটি নিতে বাধ্য হলো।

ব্লাড প্রেসার তার আগে থেকেই ছিলো। সম্প্রতি আরও বেড়েছে। তাছাড়া কয়েক দিন হলো জ্বর হয়েছে তার। মাঝে মাঝে জ্বর বেশ বেড়ে যায়। এদেশে ডাক্তার ডাকলে কিছু খরচ হয় না, ওষুধের দাম লাগে না, হাসপাতালে গেলেও টাকা দিতে হয় না। তবু অনঙ্গ দাশ ডাক্তার ডাকলো না। সে মরে যেতে রাজী আছে কিন্তু কিছুতেই হার মানবে না। অসুখের কথা গোপন রাখবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। যদি লোকে জানতে পারে যে সে শয্যাশায়ী তাহলে তখুনি নানা কথা আলোচনা করবে। সাত সমুদ্র পেরিয়ে এলেও বাঙালীর স্বভাব যাবে কোথায়! দরকারের সময় সাহায্য করবে না কেউ, কিন্তু মজা দেখবার বেলায় দু পা তুলে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসবে। তাই অনঙ্গ দাশ ছুটি নেবার সময় রটিয়ে দিলো যে সে বাড়িতে ফুলের বাগান করবে বলে কিছুদিন অফিস আসবে না। একথাও জানিয়ে দিতে ভুললো না যে বাগান না করলেও সে ছুটি নিতো কারণ তা না হলে পাওনা ছুটি নষ্ট হয়ে যাবে।

এসব কথা শুনলেও অনঙ্গ দাশের মুখ দেখে আসল ব্যাপার বুঝে নিতে চঞ্চলের দেরি হলো না। সে ভেবেছিলো এই ধরনের একটা কিছু ঘটবেই। মানুষের মন যতো কঠিন হোক, সবচেয়ে বড়ো আশ্রয় হারালে কোনো পক্ষের পরিণাম সুখের হয় না। চঞ্চল ঠিক করলো একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে। এমন করে অনঙ্গ দাসকে মরতে দেয়া হবে না। সে সাহিত্যিক, হৃদয় নিয়ে তার কারবার। মানুষের জীবনে শান্তি এনে দিতে না পারলে ব্যর্থ তার সাহিত্য সাধনা। দুঃখের বিষয় মিসেস দাশের সঙ্গে তার আলাপ নেই। ঠিক সময় যদি প্যাট্রিসিয়াকে সে বুঝিয়ে বলতে পারতো তাহলে হয়তো কলহ সহজে মিটে যেতো। কেননা কি জানি কেন মাঝে মাঝে চঞ্চলের মনে হয় প্যাট্রিসিয়া স্বামীর মতো অবুঝ নয়। যুক্তি দিয়ে তার সঙ্গে কথা বললে সে নিশ্চয়ই

ছেলেমানুষের মতো কথা বলতো না। কেউ যদি সমবেদনা নিয়ে এই দুজনের মাঝে থেকে বন্ধুর কাজ করতো তাহলে হয়তো সব গোলমাল মিটে গৃহে আবার শান্তি ফিরে আসতে পারতো।

কোনো খবর না দিয়ে এক ছুটির দিনে সকালবেলা চঞ্চল একা সটান ক্যাম্পডেন টাউনে অনঙ্গ দাশের বাড়ি এসে হাজির হলো। সে ঠিকানা জানতো, বাড়ি ঠিক কোনখানে তাও জানা ছিলো। কাজেই খুব বেশি ঘুরতে হলো না তাকে।

আরে, কী খবর? বিচলিত হয়ে অনঙ্গ দাশ বললো, তুমি যে হঠাৎ এসে হাজির হলে। অমল দত্ত মজা দেখতে পাঠিয়েছে বুঝি?

মজা? চঞ্চল হেসে বললো, আপনাকে দেখতে এলাম।

আমি কি সিনেমা নাকি যে দেখতে আসবে? কে পাঠিয়েছে ঠিক করে বলো দেখি?

আমি মিথ্যা কথা বলি না—

খবরদার, মহাভারতের ওসব বড়ো বড়ো কথা বলবে না আমার কাছে—

বাধা দিয়ে চঞ্চল বললো, আপনার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না তাই গল্প করতে এলাম। জানেন তো আপনাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি।

হুঁ, আচ্ছা এসে যখন পড়েছো, এসো ওপরে। কিন্তু আমি যদি কখনও শুনি যে আমার শরীর খারাপের কথা বাইরে রটিয়ে খুব হে হে করে ঘুরে বেড়াচ্ছো তাহলে লণ্ডন থেকে তোমার বাস তুলে ছাড়বো।

চঞ্চল দেখলো অনঙ্গ দাশের শোবার ঘর বড়ো অগোছালো। বিছানার চাদর ময়লা হয়েছে। একপাশে পড়ে আছে খালি সিগ্রেটের প্যাকেট। চেয়ার-টেবিলে পুরু ধুলো জমেছে।

ঘর পরিষ্কার জন্যে ঠিকে ঝি রাখেন নি আপনি!

না। কেন বলো তো?

বড়ো আগাছালো হয়ে আছে যে—

দেখো মেয়েমানুষের মতো কথা বলবে না। হাঁড়ির খবর নেবার চেষ্টা করছো কেন বাছাধন।

আপনার শরীর কিন্তু বেশ খারাপ দেখছি।

আবার প্যানপ্যান করছো—আঃ, তুমি বড়ো জ্বালালে দেখছি—

কথা বলতে বলতে অনঙ্গ দাশ আস্তে আস্তে বিছানায় শুয়ে পড়ে চঞ্চলকে বসতে বললো।

বিছানার অবস্থা দেখে চঞ্চল ঘরে ঢুকেই বুঝতে পেরেছিলো যে অনঙ্গ দাশ এতোক্ষণ শুয়েছিলো। তার চেহারাও খুব খারাপ হয়ে গেছে। গাল বসে গেছে। চোখের কোণে কালি বসেছে। চঞ্চল আরও লক্ষ্য করে দেখলো যেন অনঙ্গ দাশের শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি নেমে এসেছে। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না, কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়ে।

দেখুন, একটা ডাক্তার দেখান।

কোন দুঃখে? তোমার মতলবখানা কী বলো তো? হঠাৎ আমাকে নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন?

কারণ আগেই বলেছি, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। কাজেই আপনাকে দেখা-শোনা করবার অধিকার আমার আছে। আপনি বোধ হয় বুঝতে পারছেন না আপনার চেহারা কতো খারাপ হয়ে গেছে।

বুঝতে পারছি, হঠাৎ অনঙ্গ দাশ ক্লান্তিতে দেহ এলিয়ে দিয়ে থেমে থেমে বললো, বয়স হয়েছে। এবার যেতে হবে। কিন্তু এ হতভাগাদের দেশে মরতে হবে ভাবলেই রাগে আমার শরীর জ্বলে যায়।

ওসব কথা ভাবছেন কেন, চঞ্চল খুব সাবধানে বললো, আপিসে বেশি পরিশ্রম করেছিলেন বলে সামান্য খারাপ হয়েছে। একটু চুপ করে থেকে আবার চঞ্চল বললো, আমার মনে হয় একবার ডাক্তার বটব্যালকে দেখালে ভালো হয়।

কে? কার নাম করলে? ডাক্তার বটব্যাল? হো হো করে হেসে অনঙ্গ দাশ বললো, তাহলেই হয়েছে। ভবযন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে ওর জুড়ি মেলা ভার।

কিন্তু বাঙালী ডাক্তার সহজে বাঙালীর রোগ বুঝতে পারে।

ঘোড়ার ডিম পারে! আর বিলেতে বসে যদি বাঙালী ডাক্তারের হাতে পটল তুলতে হয় তাহলে একেবারে নিশ্চিন্ত স্বর্গবাস।

তাহলে না হয় একজন ভালো ইংরেজ ডাক্তার দেখান।

সেকথা যেন শুনতে পায় নি এমন ভাব করে অনঙ্গ দাশ বললো, তা তোমার হঠাৎ বটব্যাল ডাক্তারের কথা মনে পড়লো কেন? ওর মেয়েটির দিকে চোখ পড়েছে বুঝি? কিন্তু এদিকে যে লেজ কেটে বসে আছো—

বাধা দিয়ে চঞ্চল বললো, কী যে বলেন!

উঃ, ঘোড়ার ডাক্তারের দেমাক কতো! বাঙালী স্ত্রী বলে যেন মাথা কিনে বসে আছে। ভূতো ভাঁড়ের মতো চেহারা বেটার, এদেশে কোন ডেনমার্কের রাজকুমারী জুটতো বলা যায় না, হাসতে হাসতে অনঙ্গ দাশ বললো, ওর বুদ্ধির বহর কতো শোনো। একবার এক বাঙালী ভদ্রলোকের এক অপারেশন হয়। ভালোয় ভালোয় কাজ চুকে যায়, ভদ্রলোক যথাসময় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন। ভদ্রলোক নাকি ডাক্তার বটব্যালের রোগী। সেই ছুতোয় হাতুড়ে ডাক্তার কী বলে বেড়াতে লাগলো জানো?

চঞ্চল জিজ্ঞেস করলো, কী?

বললো যে অপারেশনের সময় ইংরেজ ডাক্তার নাকি ছুরি চালাতে ঘাবড়ে গিয়েছিলো; তখন আমাদের বটব্যাল সাহেব অপারেশন করে, হেসে অনঙ্গ দাশ বললো, ওর হাত এড়িয়ে রোগী স্বর্গে না গিয়ে পৃথিবীতে চলেফিরে বেড়ায়— একথাও বিশ্বাস করতে হবে!

চঞ্চল বললো, কিন্তু অনেকে তো ওর প্রশংসা করেন।

যারা এখানে নতুন আসে তাদের বাধ্য হয়ে করতে হয়। কেননা ইংরেজ ডাক্তারকে রোগের কথা বোঝাতে গেলে তাদের প্রাণ বেরিয়ে যায়। তাই নিরুপায় হয়ে ওর শরণ নেয়। আর কথা বলতে জানে লোকটা। ভেতরে কিছু না থাকলে যা হয়, বোলচালে পৃথিবী ফাটে। একবার হাই কমিশনারের অসুখ করেছিলো। অসুখের সময় অনেকেই তাঁকে দেখতে যায়। বটব্যাল যাকে দেখে তাকে বলে, আমি হাই কমিশনারকে দেখতে যাই। ভাবটা যেন সেই হাই কমিশনারের চিকিৎসা করছে—

আপনার শরীর কিন্তু বেশ খারাপ দেখছি।

আবার প্যানপ্যান করছো—মাঃ, তুমি বড়ো জ্বালালে দেখছি—

কথা বলতে বলতে অনঙ্গ দাশ আস্তে আস্তে বিছানায় শুয়ে পড়ে চঞ্চলকে বসতে বললো।

বিছানার অবস্থা দেখে চঞ্চল ঘরে ঢুকেই বুঝতে পেরেছিলো যে অনঙ্গ দাশ এতোক্ষণ শুয়েছিলো। তার চেহারাও খুব খারাপ হয়ে গেছে। গাল বসে গেছে। চোখের কোণে কালি বসেছে। চঞ্চল আরও লক্ষ্য করে দেখলো যেন অনঙ্গ দাশের শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি নেমে এসেছে। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না, কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়ে।

দেখুন, একটা ডাক্তার দেখান।

কোন দুঃখে ? তোমার মতলবখানা কী বলো তো ? হঠাৎ আমাকে নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন ?

কারণ আগেই বলেছি, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। কাজেই আপনাকে দেখা-শোনা করবার অধিকার আমার আছে। আপনি বোধ হয় বুঝতে পারছেন না আপনার চেহারা কতো খারাপ হয়ে গেছে।

বুঝতে পারছি, হঠাৎ অনঙ্গ দাশ ক্লান্তিতে দেহ এলিয়ে দিয়ে থেমে থেমে বললো, বয়স হয়েছে। এবার যেতে হবে। কিন্তু এ হতভাগাদের দেশে মরতে হবে ভাবলেই রাগে আমার শরীর জ্বলে যায়।

ওসব কথা ভাবছেন কেন, চঞ্চল খুব সাবধানে বললো, আপিসে বেশি পরিশ্রম করেছিলেন বলে সামান্য খারাপ হয়েছে। একটু চুপ করে থেকে আবার চঞ্চল বললো, আমার মনে হয় একবার ডাক্তার বটব্যালকে দেখালে ভালো হয়।

কে ? কার নাম করলে ? ডাক্তার বটব্যাল ? হো হো করে হেসে অনঙ্গ দাশ বললো, তাহলেই হয়েছে। ভবযন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে ওর জুড়ি মেলা ভার।

কিন্তু বাঙালী ডাক্তার সহজে বাঙালীর রোগ বুঝতে পারে।

ঘোড়ার ডিম পারে! আর বিলেতে বসে যদি বাঙালী ডাক্তারের হাতে পটল তুলতে হয় তাহলে একেবারে নিশ্চিন্ত স্বর্গবাস।

তাহলে না হয় একজন ভালো ইংরেজ ডাক্তার দেখান।

সেকথা যেন শুনতে পায় নি এমন ভাব করে অনঙ্গ দাশ বললো, তা তোমার হঠাৎ বটব্যাল ডাক্তারের কথা মনে পড়লো কেন? ওর মেয়েটির দিকে চোখ পড়েছে বুঝি? কিন্তু এদিকে যে লেজ কেটে বসে আছো—

বাধা দিয়ে চঞ্চল বললো, কী যে বলেন!

উঃ, ঘোড়ার ডাক্তারের দেমাক কতো! বাঙালী স্ত্রী বলে যেন মাথা কিনে বসে আছে। ভূতো ভাঁড়ের মতো চেহারা বেটার, এদেশে কোন ডেনমার্কের রাজকুমারী জুটতো বলা যায় না, হাসতে হাসতে অনঙ্গ দাশ বললো, ওর বুদ্ধির বহর কতো শোনো। একবার এক বাঙালী ভদ্রলোকের এক অপারেশন হয়। ভালোয় ভালোয় কাজ চুকে যায়, ভদ্রলোক যথাসময় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন। ভদ্রলোক নাকি ডাক্তার বটব্যালের রোগী। সেই ছুতোয় হাতুড়ে ডাক্তার কী বলে বেড়াতে লাগলো জানো?

চঞ্চল জিজ্ঞেস করলো, কী?

বললো যে অপারেশনের সময় ইংরেজ ডাক্তার নাকি ছুরি চালাতে ঘাবড়ে গিয়েছিলো; তখন আমাদের বটব্যাল সাহেব অপারেশন করে, হেসে অনঙ্গ দাশ বললো, ওর হাত এড়িয়ে রোগী স্বর্গে না গিয়ে পৃথিবীতে চলেফিরে বেড়ায়— একথাও বিশ্বাস করতে হবে!

চঞ্চল বললো, কিন্তু অনেকে তো ওর প্রশংসা করেন।

যারা এখানে নতুন আসে তাদের বাধ্য হয়ে করতে হয়। কেননা ইংরেজ ডাক্তারকে রোগের কথা বোঝাতে গেলে তাদের প্রাণ বেরিয়ে যায়। তাই নিরুপায় হয়ে ওর শরণ নেয়। আর কথা বলতে জানে লোকটা। ভেতরে কিছু না থাকলে যা হয়, বোলচালে পৃথিবী ফাটে। একবার হাই কমিশনারের অসুখ করেছিলো। অসুখের সময় অনেকেই তাঁকে দেখতে যায়। বটব্যাল যাকে দেখে তাকে বলে, আমি হাই কমিশনারকে দেখতে যাই। ভাবটা যেন সেই হাই কমিশনারের চিকিৎসা করছে—

কথার মোড় ফেরাবার জন্যে চঞ্চল বললো, আপনি যদি কোনো ডাক্তার ডাকতে না চান, হাসপাতালে চলে যান না, তারা ভালো করে পরীক্ষা করে বলে দেবে আপনার শরীর কেন খারাপ হচ্ছে—

আচ্ছা সে দেখা যাবে, আর কিছুদিন যাক না—

শুধু শুধু কষ্ট করে কী লাভ? অনেকদিন হয়ে গেলো—

ওহো শোনো, ডাক্তার বটব্যালের কাণ্ড, চঞ্চলকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে অনঙ্গ দাশ বলতে আরম্ভ করলো, একবার এক রোগীকে শেষ করলো ওই হাতুড়ে ডাক্তার। ডেথ্ সার্টিফিকেট লেখবার সময় ছাপা ফর্মের যেখানে লেখা থাকে কজ্ অব্ ডেথ্ সেখানে আহাম্মক ডাক্তার নিজের নাম সই করে বসলো। আর যাবে কোথায়, লাইসেন্স নিয়ে টানাটানি। শেষে হাই কমিশনারকে ধরপাকড় করে বলে ভুল করে ওখানে নিজের নাম সই করেছি। অনঙ্গ দাশ বললো, সেই ডাক্তারের হাতে তুমি আমাকে তুলে দিতে চাচ্ছো। কেন, আমার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হলে তোমার কী লাভ হয় বাপু?

চঞ্চল হেসে বললো, ওসব কথা বলবেন না, আপনি বেঁচে থাকলেই আমাদের লাভ, ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখে চঞ্চল বললো, কিন্তু আমার মনে হয় এখন আপনার কাছে সব সময় একজন লোক থাকা দরকার।

খালি বাড়ি পেয়ে মালপত্র নিয়ে ঢুকে পড়বার তালে আছো বুঝি? আমার এখানে ওসব স্থবিধা হবে না—বুঝেছো?

চঞ্চল হেসে উত্তর দিলো, মুখে বললে হবে কি, আমি যদি সত্যি এখানে এসে উঠি, আপনি কি না বলতে পারেন!

তা পারবো না বটে, কি ভেবে অনঙ্গ দাশ বললো, তোমাকে আমি বোধহয় একটু ভালোবাসি, শুধু মেমসাব গলায় ঝুলিয়ে সব মাটি করেছো। খবরদার ওকে কখনও আনবে না আমার এখানে, মুখ দেখতে চাই না এদেশের মেয়ে-মানুষগুলোর—

চঞ্চল উত্তর না দিয়ে অনঙ্গ দাশের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তার জন্যে চঞ্চলের দুঃখ হচ্ছিলো। মুখে যাই বলুক না কেন অনঙ্গ

দাশ, চঞ্চল জানে তার আসল রোগ কোথায়। এই অসুখের সময় শূন্য বাড়িতে একা থাকতে তার কতো যে খারাপ লাগছে তা বুঝতে চঞ্চলের দেরি লাগলো না। হঠাৎ মিসেস দাশের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে চঞ্চল ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সম্পর্ক ভেঙে যাক, কিন্তু এতোদিন এক সঙ্গে বাস করবার পর প্যাট্রিসিয়ার মনের গহনে কি কোনো সঞ্চয় অবশিষ্ট নেই? নিশ্চয়ই আছে। তাই আজ সেই দাবি নিয়ে চঞ্চল তার সঙ্গে দেখা করে তাকে অনঙ্গ দাশের অসুখের কথা যদি জানায় তাহলে নিশ্চয়ই সে অন্তত একবার তাকে দেখতে আসবে। তখন মনে অনেকখানি শক্তি পাবে অনঙ্গ দাশ। আর তারপর যদি আবার দুজনে মিলেমিশে একসঙ্গে থাকতে পারে তাহলে তো সব দিক রক্ষা হয়। এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে চঞ্চল ঠিক করলো আজ যেমন করে হোক অনঙ্গ দাশের কাছ থেকে প্যাট্রিসিয়ার ঠিকানা জেনে নিতে হবে।

দেয়ালে এঅটা প্রকাণ্ড অয়েল পেইন্টিংএর দিকে তাকিয়ে চঞ্চল জিজ্ঞেস করলো, ওটা কার ছবি?

বিদ্রূপের সুরে অনঙ্গ দাশ বললো, বেহুলার। কেন বলো তো? মেম সাহেবের ছবি দেখে মাথা ঘুরেছে বুঝি?

মিসেস দাশের ছবি না?

হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে অনঙ্গ দাশ বললো, ওটা আমি স্মৃতির পূজা করবার জন্যে রাখি নি। ফেলতে পারি নি কারণ ওটা করাতে অনেক খরচ পড়েছিলো। মাঝে মাঝে ওই ছবির দিকে তাকিয়ে ভাবি, আক্কেল সেলামি—যতো যায় ততো জ্ঞান বাড়ে। তোমারও সময় হয়ে এলো, আর বেশিদিন নয়।

চঞ্চল জিজ্ঞেস করলো, মিসেস দাশ আপনার অসুখের কথা জানেন?

হঠাৎ রেগে গিয়ে অনঙ্গ দাশ চিৎকার করে উঠলো, কেন? সে-মাগীকে খবর দেবার জন্যে তুমি চর হয়ে এসেছো বুঝি? তাকে গিয়ে কাঁদুনি গেয়ে বলবে যে আপনার বিরহে তিনি একেবারে খতম হতে চলেছেন?

না ঠিক তেমন করে বলবো না, ধীর স্বরে চঞ্চল বললো, শুধু বলবো যে আপনি অসুস্থ—

বিছানার ওপর উঠে বসে হাত নেড়ে মুখভঙ্গি করে বললো, কেন? সে আমার কে? তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

সম্পর্ক আপনাদের যাই হোক, আমার মনে হয় আজও তিনি আপনার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু…

থামো ভেঁপো ছোকরা, দুকলম লিখতে পারো বলে ভাবো যে সকলের সবকিছু তোমার নখদর্পণে, অনঙ্গ দাশ পায়চারি করতো লাগলো, তাকে আমি কোন দুঃখে খবর দিতে যাবো? সে ছাড়া কি পৃথিবীতে আর কেউ নেই?

না, আপনার আর কেউ নেই—

সকলেই বোধহয় তোমার মতো। তোমাদের মতো মিনমিনে কবিরা সব সময় মেয়েমানুষের কাছে কাঁদুনি গায়, বুঝলে? কিন্তু আমি অত্যন্ত শক্ত লোক। বিলেতে এসে আমি দুনিয়া চিনেছি, যদি আমি তিল তিল করে শেষ হয়ে যাই তা হলেও কোনো মেয়েমানুষের কাছে কাঁদুনি গেয়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করবো না। তুমি যদি দূত সেজে এবাড়ি ওবাড়ি কথা চালিয়ে বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করো তাহলে এখুনি এখান থেকে সরে পড়ো।

ঠিক আছে। আপনি যা চান না, আমি তা কেন করতে যাবো, কিন্তু দয়া করে আপনি আমার কাছে কখনও কোনো সংকোচ করবেন না, এই রইলো আমার টেলিফোন নম্বর, দরকার হলেই খবর দেবেন।

সরল হাসি হেসে অনঙ্গ দাশ বললো, আমার ওপর রাগ করে চললে নাকি?

না, আপনাকে ভালোবাসি বলেই আপনার কথা বেশি করে ভাবি—

তা ভাববে বৈকি, আমার কোনো অসুবিধা হলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে খবর দেবো। কিন্তু প্যাট্রিসিয়া আমার কে? আমি বিছানায় পড়ে আছি শুনলে সে খুশিতে আরও বেশি করে নেচে বেড়াবে। এদেশের মানুষকে তুমি চেনো না চঞ্চল।

অব্যক্ত গম্ভীর দৃষ্টিতে অনঙ্গ দাশের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল বললো, হয়তো চিনি না তবু এইটুকু না মেনে পারি না হাজার খারাপ লোক হলেও দু-একটি ভালো গুণ সব মানুষেরই থাকে। আপনি মিসেস দাশকে অতো ছোটো করে দেখবেন না কাকাবাবু—অনঙ্গ দাশকে আর কোনো কথা বলবার অবসর না দিয়ে চঞ্চল নমস্কার করে বেরিয়ে পড়লো।

এতোক্ষণ চঞ্চলের সঙ্গে কথা বলে অনঙ্গ দাশ বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। চঞ্চল চলে যাবার পর সে গভীর অবসাদে আবার শুয়ে পড়লো বিছানায়। এমনি হয় তার আজকাল। একটু বেশি উত্তেজিত হলে তার প্রতি রোমকূপ যেন অবশ হয়ে যায়। কয়েক দিন থেকে নিয়মিত জ্বরও আসছে তার।

ডাক্তার হয়তো একবার দেখানো উচিত। কিছুতেই হাসপাতালে গিয়ে থাকতে পারবে না সে। আর ডাক্তার দেখিয়ে হবেই বা কি। তাড়াতাড়ি মরে যেতে পারলেই সে যেন বেঁচে যায়। দেশে ফেরবার যখন কোনো উপায় নেই তখন এদেশে বেঁচে থেকে কষ্ট পেতে সে আর চায় না। তবু মাঝে মাঝে মনে হয় যদি কোনোরকমে দেশে ফিরে মরতে পারতো তাহলে সকল দাহ জুড়িয়ে যেতো যেন।

আসলে কী হয়েছে অনঙ্গ দাশের? নিজেকে প্রায়ই সে আজকাল প্রশ্ন করে। থাইসিস? প্লুরিসি? শিরা-উপশিরার কোনো রোগ? কেন তার জ্বর আসে? কেন বুক জ্বলে? কেন কোনো কাজে মন বসে না? কেন দিনরাত্রি কঠিন পাথরের মতো ক্লান্তি নেমে আসে শরীরে? তবু ডাক্তারের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না তার। মুখের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে, তেজ কমে যাচ্ছে দিনে দিনে, দেহমনের যা-কিছু সঞ্চয় সব যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে একে একে। এমন করে আর কতোদিন কাটবে সেকথা বুঝতে পারে না অনঙ্গ দাশ।

গোপন রাখবার চেষ্টা করলে হবে কী, অনঙ্গ দাশ বুঝতে পাবে যে তার রোগের কথা কারুর জানতে বাকি নেই। বিছানায় শুয়ে দুর্বল মুহূর্তে অনেক কথা মনে পড়ে তার। ছেলেবয়সের কথা মনে পড়ে, ইস্কুল-কলেজের

দিনগুলি চোখের সামনে ভাসে, অনুপমার স্মৃতি পীড়া দেয়। আর এদেশ ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করে যেখানে কেউ তাকে চেনে না। তেমন কোনো দেশে গিয়ে অনঙ্গ দাশের আবার নতুন করে বাঁচতে সাধ হয়।

প্যাট্রিসিয়া কেন তাকে ছেড়ে গেলো! স্বামীকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে যে স্ত্রী চলে যেতে পারে সে আর যাই হোক মানুষ নয়। এদেশের মেয়েরা মানুষ নয়।

তবু এর মধ্যে কোনোরকমে রান্না করে অনঙ্গ দাশ সামান্য কিছু খেয়ে নেয়। মাঝে মাঝে পাড়ার দোকানেও যেতে হয় তাকে। ফিরে এসে আরও ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

সকাল থেকে রাত্তির অবধি ঘরে বসে থেকে তার শরীর যেন আরও ভেঙে পড়ে আর মনে হয় লোকের মাঝে থেকে কাজে মন দেবার চেষ্টা করলে হয়তো তার এতো যন্ত্রণা হতো না। শূন্য ঘরগুলি সারাদিন তাকে যেন গ্রাস করে নিতে চায়। বারবার অনুপমার কথা মনে পড়ে।

অনঙ্গ দাশের আর কিছুই ভালো লাগে না। এদেশ তাকে ঠকিয়ে তার সব কিছু যেন চুরি করে নিয়েছে। তার সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য যে তাকে এদেশে মরতে হবে। কখনও কখনও রেডিও খুলে সে অন্য দিকে মন দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু কয়েক মিনিট পর বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে দেয়। সেই একই কথা, বেকনের দাম কমেছে, অস্ট্রেলিয়া থেকে নতুন ভেড়া এসেছে, আলুর দাম কমবার কথা হচ্ছে—শুধু খাওয়া-দাওয়ার কথা। এ জাতের ব্যবসা ছাড়া আর কী বা হবে। বিধবা বুড়িরা যখন জিবে প্রচুর জল নিয়ে দোকানে ঝোলানো বাসি মাংসের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে তখন অনঙ্গ দাশ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বলে ওঠে, ধরণী দ্বিধা হয়ে এদের গ্রাস করে নাও। আয়ু শেষ হয়ে এলো বলে দুঃখ করে না অনঙ্গ দাশ, কিন্তু যে জাতের ওপর তার বুকভরা ঘৃণা তাদের দেশে শেষ নিশ্বাস ফেলতে হবে বলেই তার যতো জ্বালা। শুধু একবার সে যদি ভারতবর্ষে ফিরে যেতে পারতো! শরতের আলো-ঝলমল-করা সকাল, স্তিমিত রোদে ভরা শীতের মন্থর মধ্যাহ্ন, কঠিন

গ্রীষ্মের অপরূপ অপরাহ্ণ, হেমন্তের হালকা কুয়াশায় পাতার ওপর টলমল-করা মৃদু শিশির, উদাস চৈত্রের কতো দিশাহারা মুহূর্ত আর বর্ষার ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ—আজও কিছুই তো ভোলে নি অনঙ্গ দাশ। মাথা ঝিমঝিম করে, অবশ শরীর কখন সহসা টলে পড়ে বিছানায় আর দুঃসহ অবসাদে চোখে আসে গভীর ঘুম।

একদিন অনেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলো অনঙ্গ দাশের। ঘড়ি দেখলো সে। না, রাত খুব বেশি হয় নি, মোটে দশটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে। রক্তের চাপ হঠাৎ ভীষণ বেড়ে গেছে তার, অসহ্য যন্ত্রণায় বুক ভেঙে যাচ্ছে যেন, আর বোধহয় খুব বেশি জ্বর হয়েছে তার। সন্ধ্যেবেলায় খাওয়া সমস্ত অন্ন যেন গলা চিরে বেরিয়ে এলো। মেঝের উপর পরপর কয়েকবার বমি করলো সে। বাথরুমে গিয়ে মুখ ধোবার সামর্থ্য তার আর নেই। মনে হচ্ছে সে যেন এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। আজ রাত্তিরে তার কাছে একজন কারুর থাকা দরকার। ব্যস্ত হয়ে কোনোরকমে ভাঙা গলায় সে শুধু টেলিফোনে চঞ্চলকে বললো, আমি মরে যাচ্ছি চঞ্চল। শিগগির এসো।

চঞ্চল তখন লিখছিলো। সে ভাবতে পারে নি এতো তাড়াতাড়ি অনঙ্গ দাশের অসুখ বেড়ে যাবে। সাংঘাতিক রকম বাড়াবাড়ি না হলে অনঙ্গ দাশ এতো রাত্তিরে যে কিছুতেই তাকে খবর দিতো না সেকথাও সে জানতো। তাই চঞ্চল একটু বিচলিত হলো। টেলিফোনে অনঙ্গ দাশের গলা শুনে মনে হলো সে সত্যি বড়ো দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু কোনো কথা জিজ্ঞেস করবার অবসর পেলো না চঞ্চল। শুধু বুঝতে পারলো অনঙ্গ দাশের হাত কেঁপে রিসিভার মাটিতে পড়ে গেলো।

ব্যাপার শুনে মারিয়া বললো আমিও যাবো। তাকে কখনও দেখি নি আমি কিন্তু তোমার কাছ থেকে তার সম্বন্ধে অনেক শুনেছি। চলো আজ দুজনে মিলে রাত জেগে তার সেবা করি।

খুশি হয়ে চঞ্চল বললো, তাই চলো। তুমি যতো তাড়াতাড়ি পারো তৈরী হয়ে নাও। বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে নেবো।

ট্যাক্সিতে ফিঞ্চলে রোড থেকে ক্যাম্পডেন টাউনে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগলো না তাদের। অনঙ্গ দাশের বাড়ির দরজা খোলাই ছিলো। তারা দুজনে সটান দোতলায় তার শোবার ঘরে চলে এলো।
পায়ের আওয়াজ শুনে অনঙ্গ দাশ বুঝতে পারলো কে এসেছে। চোখ না খুলে বললো, চঞ্চল এসেছো? এসো—কিন্তু পাশ ফিরে চোখ খুলে অনঙ্গ দাশ চীৎকার করে উঠলো, এ কি? একে এনেছো কেন? মুখ দেখতে চাই না ওদের। গেট আউট ইউ হোয়াইট উইচ—অনঙ্গ দাশের অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনে মারিয়া ভয় পেলো, ফ্যাকাশে হয়ে গেলো তার মুখ।
চঞ্চল আস্তে আস্তে বললো, কিছু মনে কোরো না মারিয়া। ওর মাথার ঠিক নেই। তুমি দয়া করে পাশের ঘরে গিয়ে বসো। তাকে অন্য ঘরে বসিয়ে রেখে চঞ্চল আবার ফিরে এলো অনঙ্গ দাশের ঘরে।
এতোক্ষণ চঞ্চল ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখবার সময় পায় নি—এবারে দেখলে যে অনঙ্গ দাশ করে বমি করেছে। সে ঝুঁকে পড়ে দেখলো সামান্য রক্তও মেশানো রয়েছে যেন। অনঙ্গ দাশের কপালে হাত দিতেই তার মনে হলো গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।
ব্যস্ত হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, কদিন থেকে শরীর এতো বেশি খারাপ হলো আপনার?
কে জানে! তবে এবার বোধ হয় সব শেষ হয়ে যাবে—
ছি ছি, ওকথা বলবেন না।
না চঞ্চল, আমার মরে যাওয়াই ভালো। এমন করে বেঁচে থাকা যায় না। আত্মীয়স্বজনকে অনেক জ্বালিয়েছি, তোমাদের অনেক গালমন্দ করেছি! সব ভুলে যেও চঞ্চল—
আপনার শরীর আজ সত্যি ভালো নেই, অনঙ্গ দাশের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে চঞ্চল বললো, তাই এসব বাজে কথা মনে হচ্ছে। কিন্তু আমাকে তো অনেক আগে খবর দেয়া উচিত ছিলো—

তোমরা সুখে আছো, সুখে থাকো। শুধু শুধু তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে ইচ্ছে হয় না—

শুধু শুধু কেন, আপনার এতো বড়ো অসুখ—

অনঙ্গ দাশ বাধা দিয়ে বললো, কিন্তু ওকে সঙ্গে করে এনেছো কেন? ওদের নিশ্বাসে বিষ। চঞ্চল, ওকে চলে যেতে বলো। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।

একটু ব্যথা পেলো চঞ্চল। সে বুঝতে পারলো অনঙ্গ দাশ মারিয়াকে লক্ষ্য করে কথাগুলি বলছে।

সে আস্তে উত্তর দিলো, তাকে আমি চলে যেতে বলেছি।

মারিয়া তখন পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে উঁকি মেরে দেখছে চঞ্চল অনেক পুরানো খবরের কাগজ জোগাড় করে বমি পরিষ্কার করছে। তারপর সে বাথরুমে এলো জলভরা বালতি নিয়ে যেতে। মারিয়া চঞ্চলকে সাহায্য করতে এসেছিলো। কিন্তু অনঙ্গ দাশের ক্রুদ্ধস্বর শুনে সে শুধু আশ্চর্য হলো না, ভয় পেলো। অনঙ্গ দাশের চেহারায় অদ্ভুত বিজাতীয় ঘৃণা ফুটে উঠেছিলো। তাই ইচ্ছে থাকলেও সে-ঘরে আবার প্রবেশ করে চঞ্চলকে সাহায্য করতে যেতে সে কিছুতেই পারলো না।

জলভরা বালতি নিয়ে মারিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে চঞ্চল বললো, বুঝতেই পারছো অবস্থা খুব খারাপ। আজ সারারাত আমাদের এখানে থাকতে হবে—

সমবেদনার ম্লান স্বরে মারিয়া বললো, নিশ্চয়ই। কিন্তু তুমি এখনও ডাক্তারকে খবর দিচ্ছো না কেন?

দেবো বৈকি, আগে ঘরটা একটু পরিষ্কার করে নিই, চঞ্চল কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরের চেহারা ফিরিয়ে দিলো।

বারবার বাধা দেবার চেষ্টা করলো অনঙ্গ দাশ, আমি তোমাকে ডেকেছি মরবার সময় মুখে একটু জল দেবার জন্যে, এখানে এসে রাত দুপুরে চাকরের কাজ করবার জন্যে নয়—

চঞ্চল বাধা দিলো, আর কথা বলবেন না। এবার চুপ করে ঘুমোন। কিছু খাবেন নাকি এখন?

না না, একেবারে ক্ষিধে নেই।

কি খেয়েছেন আজ?

বার্লি। তাছাড়া আর কিছু খেতে ইচ্ছে করে না।

তৈরী করে দিলে কে?

নিজেই করে নিয়েছি।

এই অসুখে বার বার ওঠাউঠি, চঞ্চল যেন আপন মনেই বললো, হাসপাতালে গেলে কতো আরামে থাকতে পারতেন!

থামো ছোকরা, সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠলো অনঙ্গ দাশ, আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে বাজারে ঢি ঢি ফেলে একটা মজা দেখতে চাও, না? খবরদার, আমার অসুখের কথা যেন কাকপক্ষীও না টের পায়—

এতো বড়ো অসুখের কথা গোপন রাখবার জন্য কেন অনঙ্গ দাশ ব্যস্ত সেকথা চঞ্চল কিছুতেই বুঝতে পারে না। কিন্তু সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো অনঙ্গ দাশের রোগ কঠিন। অবিলম্বে এক্স রে করা দরকার। কিন্তু সেকথা মুখ ফুটে বলতে সাহস হলো না তার। শুধু মনে হলো এ সময় মিসেস দাশ উপস্থিত থাকলে সবচেয়ে ভালো হতো! পরিচর্যার কোনো ত্রুটি হতো না, অনঙ্গ দাশকে কথা শুনতে বাধ্য করাতো। তাকে এ বাড়িতে আনতে পারলে হয়তো এখনও সব দিক রক্ষা হয়। কিন্তু তার আগে একজন ডাক্তার ডাকা দরকার। তা না হলে যদি আজ রাত্তিরে সাংঘাতিক কিছু ঘটে যায় তাহলে চঞ্চলের দুঃখের সীমা থাকবে না।

দেখুন, অনঙ্গ দাশের বিছানায় বসে তার মাথায় আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে চঞ্চল বললো, আপনার ডাক্তারের নাম আর টেলিফোন নম্বর দিন আমাকে—

চুপ করো ছোকরা, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও, পৃথিবীর কোনো ডাক্তারের আমাকে বাঁচাবার ক্ষমতা নেই; কাজেই ভিড় বাড়িয়ে হট্টগোল কোরো না।

কিন্তু শুনুন, বেশ উত্তেজিত হয়ে চঞ্চল বললো, কেন আপনি আমাকে ডাক্তার ডাকতে দিচ্ছেন না? দয়া করে ছেলেমানুষি করবেন না। যদি কিছু বাড়াবাড়ি হয় তাহলে কাল সকালে লোকে যে আমাকে দায়ী করে অপবাদ দেবে।

চঞ্চলের কথা শুনে অনঙ্গ দাশ খুকখুক করে হেসে ফেললো হঠাৎ, চঞ্চল তুমি পাগল! কোথায় আছো, অ্যাঁ? এটা বিলেত। আমাদের মতো অনেক হৃদয়হীন বর্বর এখানে দুবেলা মরছে। কেউ তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। উচিত শাস্তি হলো আমার। এমনি করে কুকুরের মতো আমাদের মরা দরকার। আমি মরে যাবার পর তুমি পাঁচজনকে ডেকে বেশ ঘটা করে বলো যে মরবার সময় আমার মুখে জল দেবার কেউ ছিলো না। কেউ যেন এদেশে না থাকে। বুকে বড়ো যন্ত্রণা হচ্ছে, আবার বোধহয় বমি হবে, অনঙ্গ দাশ কাশলো কয়েকবার, চঞ্চল, গায়ের উপর কম্বলটা ঠিক করে দাও— ভগবান, আর একবার আমাকে ভারতবর্ষে জন্মাতে দিও! অনুপমা— অনু—

চঞ্চল অনঙ্গ দাশের মুখের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ে বললো. আমার একটা কথা দয়া করে শুনুন কাকাবাবু, মিসেস দাশের টেলিফোন নম্বর আমায় দিন, তাকে একবার আসতে বলি?

কে প্যাট্রিসিয়া? স্তিমিত স্বরে অনঙ্গ দাশ বললো, সম্পর্ক চুকিয়ে গেলে ইংরেজ মেয়ে পিছনে তাকায় না। তবু তাকে ডাকো। কারণ আমি নিশ্চিন্ত সে এসে আমাকে আর দেখতে পাবে না, আমার হয়ে এসেছে। আমার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও এ বাড়ি আমি তারই নামে লিখে গেলাম। আরও স্বামী হয়তো তার হবে কিন্তু ভারতীয় স্বামীকে সে যেন কোনোদিনও ভুলতে না পারে। ইংরেজ স্ত্রী যা চায় তাই পাবে। আমাকে শেষ করে আমার সম্পত্তি ভোগ করবে—

আপনি আমায় মিসেস দাশের ফোন নম্বর দিন।

অনঙ্গ দাশের কাছ থেকে টেলিফোন নম্বর নিয়ে চঞ্চল প্যাট্রিসিয়াকে ফোন করে সব খবর দিয়ে বললো, দয়া করে আপনি এখুনি চলে আসুন।

টেলিফোনে প্যাটি সিয়ার গম্ভীর কণ্ঠস্বর বাজলো, আপনি কে কথা বলছেন?

আমি তাঁর আত্মীয়ের মতো—

কী নাম আপনার?

আপনি আমাকে চিনবেন না, আমার নাম চঞ্চল সেন। কিন্তু মাপ করবেন, বেশি কথা বলবার সময় নেই। আপনি দয়া করে আসুন।

আপনিও মাপ করবেন, আমি যেতে পারবো না।

কেন? আমি আপনাকে ব্যাকুল অনুরোধ করছি মিসেস দাশ, আপনি আসুন। মিঃ দাশ মৃত্যুশয্যায়, তিনি আর বেশিক্ষণ বাঁচবেন না, তবু আপনি এলে হয়তো তাঁকে বাঁচানো যেতে পারে—

বাধা দিয়ে প্যাট্রিসিয়া বললো, তাঁর বাঁচামরা সম্বন্ধে আমার কোনো কৌতূহল নেই। আমি আপনাকে চিনি না, আমি জানি না আপনি আমাদের সব কথা জানেন কিনা। কিন্তু শুধু এইটুকু জেনে রাখুন মিঃ সেন যে আপনার বন্ধুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই—

সম্পর্কের কথা নয় মিসেস দাশ, কিন্তু আপনি মানুষ। তাই একজনের অন্তিম মুহূর্তে আমি আপনাকে ডাকছি। তিনি আমাদের কোনো কথা শুনছেন না, এমনকি ডাক্তার অবধি ডাকতে দিচ্ছেন না—

কিন্তু আমি গেলে কি সুবিধা আপনার হবে?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার কথা তিনি শুনবেন।

ম্লান স্বরে প্যাট্রিসিয়া বললো, তিনি কখনও কারুর কথা শোনেন না, বিশেষ করে যারা তার ভালো চায়।

মিসেস দাশ আর সময় নেই, দয়া করে আসুন—

বেশ, অবশেষে প্যাট্রিসিয়া আসতে রাজী হলো, কিন্তু একটি শর্ত আছে—

বলুন?

আমি ট্যাক্সিতে যাবো, ট্যাক্সিতে আসবো। রোগীর অবস্থা যতোই খারাপ হোক না কেন, আমাকে আপনি কিছুতেই রাত্তিরে থাকতে অনুরোধ করবেন না। ও বাড়িতে আমি থাকতে পারবো না।

বেশ। কিন্তু দয়া করে আপনি চলে আসুন।

আমি এখুনি যাচ্ছি।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে চঞ্চল নিশ্চিন্ত হলো। এখন মিসেস দাশ এসে পড়লে

সব দিক রক্ষা হয়। চঞ্চল যেমন করে পারে তাকে আটকে রাখবে। অনঙ্গ দাশকে বাঁচিয়ে তুলতে হলে তাকে সে-কাজ করতে হবে। অনঙ্গ দাশ যাই বলুক না কেন, চঞ্চল জানে তার রোগের আসল কারণ কি!

কিন্তু অনঙ্গ দাশের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল শিউরে উঠলো। সে সহসা ভেবে পেলো না এখন তার কী করা উচিত। যন্ত্রণায় অনঙ্গ দাশের মুখ বিকৃত হয়ে গেছে, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হঠাৎ কাশি আরম্ভ হলো তার। গলা চিরে কার্পেটের ওপর এক ঝলক রক্ত পড়লো।

চঞ্চল—

কী বলছেন কাকাবাবু? চঞ্চল সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে চেপে ধরে সুস্থ করবার চেষ্টা করলো।

অনেক চেষ্টা করেও অনঙ্গ দাশ কথা বলতে পারলো না। শুধু তার কাশির বেগ বেড়ে গেলো। এমন সময় দরজার ঘণ্টা বেজে উঠলো। চঞ্চল বুঝলো প্যাট্রিসিয়া এসে পড়েছে। সে মারিয়াকে চেঁচিয়ে বললো, দরজা খুলে তাকে সটান ওপরে নিয়ে আসতে।

কিন্তু দরজার ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে অনঙ্গ দাশের কাশি হঠাৎ থেমে গেলো। হৃৎস্পন্দন বন্ধ হলো, তার মুখে তখনও যন্ত্রণার সুস্পষ্ট চিহ্ন। শিথিল দেহভার কোলে নিয়ে মূক বধির দর্শকের মতো চঞ্চল স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লম্বা জিব বের করে গাঁকগাঁক করতে করতে দুটো কালো রঙের বিরাট অ্যালসেশন কুকুর অনঙ্গ দাশের মৃতদেহের কাছে এসে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। পেছনে পেছনে এলো প্যাট্রিসিয়া। শান্ত গম্ভীর সুন্দর চেহারা।

অনঙ্গ দাশের নিস্পন্দ দেহের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল কোনোরকমে শুধু বললো, বড়ো দেরি করে এলেন মিসেস দাশ। সব শেষ হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠলো প্যাট্রিসিয়ার মুখ। তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। কিন্তু অল্পক্ষণ মাত্র। হঠাৎ সে আছড়ে পড়লো অনঙ্গ দাশের স্থির দেহের ওপর। তারপর অস্বাভাবিক জোরে চীৎকার করে

কেঁদে উঠলো, তুমি আমাকে ভুল বুঝে গেলে—তুমি আমাকে ভুল বুঝে গেলে !

প্যাট্রিসিয়াকে কাঁদতে দেখে তার অ্যালসেশন কুকুর দুটোও বিচলিত হয়ে সামনের দুপা খাটের উপর তুলে মনিবের গা ঘেঁষে কেঁদে উঠলো।

চঞ্চল স্থির নির্বাক। কিন্তু মারিয়া তখনও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। পাছে আবার অনঙ্গ দাশ চীৎকার করে ওঠে, গেট আউট ইউ হোয়াইট উইচ—

দু বছর পরে

চঞ্চল সারাদিন মনে মনে কাজ করে আজকাল। খুব বেশি ভাবতে হয় না তাকে। চোখের সামনে রয়েছে প্রত্যেকটি চরিত্র। তাদের শুধু কাহিনী রচনা করা। সে আর এমন কঠিন কি! উপন্যাস লিখতে লিখতে নিজের কথাও ভাবে সে। নিজেকেও বাদ দেবে না, সগৌরবে মারিয়ার কথা জানাবে তার দেশের পাঠককে। নিজেকে নিয়ে লেখা বোধহয় সবচেয়ে সহজ আর সবচেয়ে জীবন্ত। পাতার পর পাতা ভরে তোলে চঞ্চল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দেখেছে সে। অনেক জেনেছে। জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা আগাগোড়া বদলে গেছে। যদি সে এমন করে এখানে না আসতো তাহলে এইসব চরিত্র, যারা তার আশেপাশে ঘুরে তার মনে বারবার ছায়া ফেলেছে, তাদের ফুটিয়ে তুলতে পারতো না কোনো দিন। তার দেশের এতো লোক এখানে পৃথিবীর কতো অসংখ্য লোকের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বাস করছে, তাদের কথা কজন জানে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে প্রথমেই মারিয়ার কথা মনে হয় তার। কোনো দূর দেশের একেবারে অপরিচিতা মেয়ে সব কিছু ছাড়লো তার শিল্পী-প্রাণ বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। একথা ভেবে চঞ্চলের মন খুশিতে ভরে ওঠে, শুধু মারিয়ার জন্যে আজ সে তার মধ্যে এক দুঃসাহসী শিল্পীকে খুঁজে পেয়েছে। খুঁজে পেয়েছে বললে হয়তো ঠিক বলা হবে না, মারিয়া তাকে নতুন করে তৈরী করেছে। না হলে দারিদ্র্যের এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় মাথা ঠিক রেখে অগ্রসর হওয়া চঞ্চলের পক্ষে হয়তো সম্ভব হতো না। মারিয়া তাকে জাগিয়ে তুলেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে, সৃষ্টির নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে।

অর্থ নেই। ঐশ্বর্যের সামান্য ছাপ নেই ঘরে। চারপাশে দারিদ্র্য বিকট ছায়া ফেলেছে। মাঝে মাঝে চঞ্চলের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কেমন করে মুক্তি পাবে তাবা!

এর মধ্যে বাবা তাকে আর একটিও চিঠি লেখেন নি। মারিয়া আশা রাখলেও চঞ্চল জানতো যে তিনি কোনোদিনও তাকে আর ক্ষমা করতে পারবেন না। চঞ্চল তার জন্যে দুঃখ করে না। সে জানে যে যদি সে এতোটুকু প্রসিদ্ধ হয় তাহলে তার সবটুকু কৃতিত্ব মারিয়ার। যদি তাকে কোনোদিন লোকে চেনে তাহলে পৃথিবী স্বীকার করবে যে বাবার অমতে বিয়ে করে সে কোনো অন্যায় করে নি। হাজার দুঃখকষ্ট আর অর্থাভাবের মধ্যে থাকলেও শুভ-কামনার প্রদীপ জ্বেলে মারিয়া যেন সোনা করে তুলেছে প্রতিটি মুহূর্ত। তার দিকে চেয়ে চেয়ে আজকাল প্রায়ই চঞ্চল ভাবে যে এতো বড়ো মন সে পেলো কোথায়। কে তাকে এমন করে ভালোবাসতে শেখালো!

কিন্তু এর মধ্যে সংসারে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক চেষ্টা করেও মারিয়া কোনো চাকরি পায় নি। ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি হবার উপায় ছিলো না তার। যেখানে যেখানে হবার আশা ছিলো সেসব জায়গায় স্পষ্ট কিছু না বললেও মারিয়া বুঝতে পারলো যে শুধু ভারতীয় স্বামী বলে তার কোথাও চাকরি হবে না। কিন্তু তবু ভেঙে পড়বার মেয়ে সে নয়। সে ঠিক করলো চঞ্চলকে কিছুতেই আর বেশিদিন চাকরি করতে দেয়া হবে না। দিনরাত তাকে লিখতে হবে। লণ্ডনের খরচের তুলনায় চঞ্চলের উপার্জন সামান্য। কাজেই চঞ্চল চাকরি ছেড়ে দিলে ক্ষতি নেই। মারিয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাকরি খুঁজবে। এমন অনেক ইংরেজ আছে যারা বাড়িতে লোক রেখে ফরাসী শেখে। তেমন বাড়ির সন্ধান করতে হবে।

চাকরি সে পেলো বটে কিন্তু সে চাকরির উপর ভরসা করা চলে না। আজ আছে কাল নেই। আর পয়সাও বেশি পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা বাড়ি আনতে আনতে শেষ হয়ে যায়। মারিয়া ভেবে দেখলো যে এমন করে আর বেশিদিন চলবে না। ছেলেমেয়ে না থাকলেও সংসারের খরচ দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। চঞ্চলের মাইনে সামান্য বেড়েছে বটে কিন্তু যত বাড়া উচিত ছিলো ততো বাড়ে নি। মারিয়া মাঝে মাঝে ফরাসী শেখানোর চাকরি পায় বটে কিন্তু সেগুলো যেতেও দেরি লাগে না।

মারিয়ার মতো মনের জোর চঞ্চলের নেই। তাই আজকাল মাঝে মাঝে সে চুপ করে বসে নিজের কথা ভাবে। লেখা সে আরম্ভ করে দিয়েছে। লিখতে লিখতে সে পৃথিবী ভুলে যায়। তার কেমন যেন নেশা ধরে গেছে আজকাল। এর মধ্যে তার উপন্যাস নিয়ে সে মারিয়ার সঙ্গে অনেকবার আলোচনা করেছে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত শুধু ভেবেছে কেমন করে আরম্ভ করবে, কতটা বলবে আর কোথায় থামবে। অথচ এর জন্যে চঞ্চল একেবারে প্রস্তুত ছিলো না, অমল অনঙ্গ দাশ সোমনাথ ব্যানার্জি আর তার কর্মস্থান ইণ্ডিয়া হাউস—লিখতে লিখতে চঞ্চলের মনে হয় এদের সঙ্গে যেন তার জন্মজন্মান্তরের পরিচয়। এদের সঙ্গে যেন তার নাড়ীর যোগ। লেখবার আগে মারিয়ার সঙ্গে আলোচনা করলেও লিখতে বসে চঞ্চলের কখনও মনে হয় না যে তাকে পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তার কলম যেন কথা বলে, গান গায়, থামতে চায় না। হুড়মুড় করে ওরা ভিড় করে আসে। চেষ্টা করে সেই সব চরিত্রকে চঞ্চলের দেখতে হয় নি। তারা আপনি তার কাছে এসেছে, পাশে বসে গল্প করেছে, ভালোবেসে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে। তাই এদের কথা বলতে গেলে তাকে কষ্ট করে ভাবতে হয় না, তারাই যেন তাকে দিয়ে তাদের কথা বলিয়ে নেয়।

লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে চঞ্চলের শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। আর থেকে থেকে ভয়ও লাগে তার। সত্যি কথা ভালো করে বলতে পারবে তো! যদি অনেক কথা বলে আসল কথা বলা না হয়! অনঙ্গ দাশ কী চেয়েছিলো? সোমনাথ ব্যানার্জি কী পেয়েছে? অমল কী পেলো আর সে নিজে কী লাভ করলো —এসব কথা ভাবতে ভাবতে শিহরণ লাগে তার। এখন সে নাম ধরে মারিয়াকে জোরে ডাকে।

কি বলছো চঞ্চল?

মাঝে মাঝে সব যেন গোলমাল হয়ে যায় মারিয়া?

চঞ্চলের কথা শুনে মারিয়া অবাক হয় না। এমন কথা তার মুখে সে প্রায়ই শোনে। কিছুক্ষণ চুপ করে স্বামীর লেখা পাতাগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে সে

নিশ্বাস ফেলে বলে, আমি যদি বাংলা পড়তে পারতাম! কী আশ্চর্য সব অক্ষরগুলি! আমার কাছে একেবারে একরকম মনে হয়!

ভাগ্যিস তুমি বাংলা পড়তে পারো না, মারিয়ার একটা হাত ধরে চঞ্চল বলে, তাহলে আমাকে কিছুতেই জিনিয়স বলে মনে করতে পারতে না।

তোমাকে তো আমি একটা অসাধারণ কিছু বলে মনে করি না চঞ্চল। বরং তোমাকে এক অসহায় জীব বলে মনে করতাম।

আর এখন?

এখনও পুরোপুরি মানুষ হও নি।

কলম বন্ধ করতে করতে চঞ্চল বললো, তাহলে কী করি বলো তো?

মারিয়া চঞ্চলকে আদর করে বললো, শুধু লিখে যাও। তাহলে একদিন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখবে যে তুমি পুরো মানুষ হয়ে গেছো।

কিন্তু লেখা যে কিছুতেই শেষ করতে পারছি না।

কেন? কি হলো আবার? মনে মনে সবই তো সাজানো হয়ে গিয়েছিলো।

ভয় লাগছে আবার।

কিসের ভয়?

এ ধরনের লেখা যদি আমার দেশের পাঠকের ভালো না লাগে? আর সব চরিত্রই চেনা তাই ভয় হচ্ছে যদি কারুর ওপর অবিচার করে ফেলি?

অবিচার কি সুবিচার সেকথা তুমি বলতে পারো না চঞ্চল। এটা তো জানো ঠিক যেমন দেখেছো তেমন লিখলে হয়তো সাহিত্য হবে না। প্রত্যেক লেখকই ঘটনা বাছে, চরিত্র বেছে নেয়। তুমিও তেমনি বেছে নেবে। যে বাছাই করতে জানে সে-ই বড়ো লেখক।

কিন্তু বিলেতে বাঙালীদের নিয়ে লেখা এমন উপন্যাস লোকের যদি ভালো না লাগে? যদি আমার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়?

মারিয়া হাসলো, ধৃষ্টতা মার্জনা করো। তাই বলি যে তুমি আজও পুরো মানুষ হয়ে উঠতে পারো নি। লোকের ভালো না লাগলে তোমার কি এসে যায়? লোকের মুখ চেয়ে যারা লেখে তুমি তো তেমন শিল্পী নও। তুমি লিখবে

নিজের খেয়ালে, যেমন ভাবে নিয়েছো তেমন ভাবে ফুটিয়ে তুলবে জীবন। কারুর যদি ভালো না লাগে তাহলে উপায় নেই।

কিন্তু পাঠক না থাকলে লিখে লাভ কী?

বড়ো লেখক লেখে নিজের তৃপ্তির জন্যে। সমাজের যে ঘুণ লোকের শাদা চোখে ধরা পড়ে না, বড়ো শিল্পী তাদের দংশনে অধীর হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমার লেখা উপন্যাসে ঘুণের দংশন কোথায়?

চঞ্চলের পাশে আর একটা চেয়ারে বসে মারিয়া বললো, একজন লেখক লেখে মনের তাগিদে। তার পক্ষে নিজের উপন্যাসের স্বরূপ উপলব্ধি করা অনেক সময় হয়তো কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন তোমার বর্তমান উপন্যাসের বেলায় হয়েছে। আমি তোমাকে এখুনি বলবো সমাজের কোন ঘুণের কথা উপন্যাসে ফুঠে উঠবে যদি তুমি আমাকে আগে বলো যে কেন তুমি এই বই লিখছো।

চঞ্চল বললো, একথা বলা তো খুব সোজা। আমি লিখছি, কারণ না লিখে থাকতে পারছি না বলে।

মারিয়া বললো, তার মানে তুমি মনের তাগিদে লিখছো। তাই তোমার লেখায় থাকবে জীবন-স্পন্দন। নতুন পরিবেশে নানা দৃষ্টিতে তুমি সেই জীবনকেই দেখছো। সত্যিই যদি তুমি প্রাণের তাগিদে লেখো তাহলে দেখবে তোমার অজ্ঞাতে তোমার উপন্যাসে জীবনের জয়গান বেজে উঠেছে।

এসব কথা চঞ্চল জানে। তবু আজও তার মাঝে মাঝে ভয় হয়। এদেশে এসে এতোদিন পর লেখায় সে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছে। সে ঘর ছেড়েছে, দেশ ছেড়েছে, বাবা তাকে ত্যাগ করেছে। মারিয়ার অনুরোধে সে পড়াশুনোও ছেড়েছে। চঞ্চল শুধু অফিস করে আর বাড়ি বসে লেখে। এখন তার ভরা যৌবন। তার জীবনে সৃষ্টি করবার এই হলো শ্রেষ্ঠ সময়। কোনো ভাবনায় কিংবা দুর্ভাবনায় সে যেন এই রঙীন দিনগুলির এক মুহূর্তও নষ্ট না করে।

তবু থেকে থেকে চঞ্চলের মাথার মধ্যে বড়ো বেশি যন্ত্রণা হয়। লেখা নিয়ে, যখন মেতে থাকে তখন অবশ্য কোনো ভাবনা পীড়িত করে না মন। সে শুধু চোখের সামনে দেখে লণ্ডনে তার পরিচিত মহল।

তার চোখের সামনে অনঙ্গ দাশ শেষ হয়ে গেছে। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে শান্তি চেয়েছিলো। ভুল বুঝলো প্যাট্রিসিয়াকে। বিদেশে কাটালো অনেক বছর তবু কিছুতেই ছাড়তে পারলো না নিজের সংস্কার। দেশের মায়ায় মন ভরে রইলো সব সময়। অথচ দেশে গিয়েও বিদেশিনী স্ত্রী নিয়ে বাস করতে পারলো না। আমাদের সামাজিক জীবনে এমন লোকের কি কোনো মূল্য নেই? দেশেও থাকা হলো না, বিলেতেও মানিয়ে নিতে পারলো না। ভুল বোঝাবুঝির মধ্য দিয়ে হঠাৎ একদিন জীবনের অবসান হলো। মুখে জল দেবার জন্যে কোনো আত্মীয় রইলো না শিয়রে। কোথায় গলদ? কেন এমন হয়?

অথচ দেশকে কী ভালোই যে বাসতো অনঙ্গ দাশ। তার খেয়াল খুশিতে আবোল তাবোল কত কথাগুলির মধ্যেও ফুটে উঠতো গভীর দেশপ্রেম। কিন্তু দেশে ফেরবার উপায় ছিলো না। একদিনকার কথা চঞ্চলের স্পষ্ট মনে পড়ে।

খাবার পর ইণ্ডিয়া হাউসে লাউঞ্জে অনেকে জমা হয়েছিলো। তাদের মধ্যে ক্যাম্ব্রিজের ছাত্র ছিলো দুজন, কয়েকজন ছাত্রীও এসেছিলো তাদের সঙ্গে। তারা নিজেদের মধ্যে নানাকথা আলোচনা করছিলো। হঠাৎ এক সময় শোনা গেলো যে একটি ছেলে ইংরেজ মেয়েদের বলছে, ভারতবর্ষ কুসংস্কারে ভরা। তুমি শুনলে অবাক হবে যে ছাত্রজীবনে প্রেম করলে অভিভাবকেরা রেগে যান। আর সেখানে কড়া শাসনে যৌবনকে দাবিয়ে রাখবার নানারকম চেষ্টা করা হয়। তাই তোমাদের দেশের মতো আমাদের দেশে এতো প্রেম নেই। আমাদের কবিতায় ঈশ্বরের কথা আছে, অনেক গভীর কথা আছে কিন্তু প্রেমের কথা খুব কম—নেই বললেই চলে।

আর যাবে কোথায়। এতটা শুনেই অনঙ্গ দাশ উঠে সেই ছাত্রটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, খুব বোঝাচ্ছো দেখছি ছোকরা। তোমার মতো গাধাদের কেন যে বিলেতে আসবার পাসপোর্ট দেয়া হয় বুঝতে পারি না—

বাধা দিয়ে গম্ভীর ভাবে ছেলেটি বললো, আপনি কী বলতে চান?

বলতে চাই যে তুমি একটি গাধা। ভারতবর্ষে প্রেম নেই, প্রেম আছে ইউরোপে—এমন কথা তোমার মগজে কিছু থাকলে তুমি এদের বলতে পারতে না।

ছেলেটি উত্তর না দিয়ে অবাক হয়ে অনঙ্গ দাশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

পড়েছো,

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
লাখো লাখো যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

কিছু জানো না, খবর রাখো না অথচ বড়ো মুখ করে নিজের দেশের নিন্দে করো কোন লজ্জায়?

ছেলেটি বাধা দিয়ে বললো, নিন্দে তো আমি করি নি।

নাঃ, তুমি একেবারে ঢাক পিটিয়ে দেশের গুণগান করছিলে। নতুন এসেছো তাই মেমসাব দেখে যা মনে হচ্ছে তাই বলে যাচ্ছো। একটা কথা জেনে রাখো, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে প্রেম হয় কিন্তু এদের মতো বাঁদরামি করা হয় না। আর ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে যে প্রেমের গান গাওয়া হচ্ছে এদের পক্ষে তার রূপ গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব। একটু থেমে অনঙ্গ দাশ আবার বললো,

কে না বাঁশি বায়ে বড়ায়ে কালিনী নই কুলে
কে না বাঁশি বায়ে এ গোঠ গোকুলে
আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন
বাঁশির শবদে মোর আউলাইলো রন্ধন।

এসব কথার মানে বোঝবার সাধ্য এদের নেই। কেননা বাঁশির শব্দে এদের মন ব্যাকুল হয় না, রন্ধনও আউলায় না। এরা আগে পেটের চিন্তা করে, পরে প্রেমের চিন্তা করে। থাকো এদেশে কয়েক বছর, তারপর দেখবে এদেশের প্রেম কাকে বলে!

লিখতে লিখতে আরও বেশি করে চঞ্চল সোমনাথ ব্যানার্জির কথা ভাবে। তার কথা বলতে গিয়ে চঞ্চলের মনে হয় সত্যি মারিয়ার ভাষায় সমাজের কোথায় যেন ঘুণ জমা হয়ে আছে। তা না হলে সোমনাথের মতো উচ্চ মনের লোককে শুধু শুধু অর্থাভাবে কষ্ট পেতে হবে কেন! সে তো শান্তি চায়। সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টায় সে নিজেকে নিঃস্ব করে তুললো। কিন্তু কী পেলো অবশেষে? সে কথাই লোককে জানাবে চঞ্চল। এমনি অসংখ্য লোক, তরুণ বয়সে যারা ব্যাপক জীবনের স্বপ্ন দেখলো, ব্যক্তিগত সুখশান্তি তুচ্ছ করে যারা মানুষকে ভালোবাসলো, সাত হাজার মাইল দূরে বসে যারা নতুন সমাজ গড়ে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করলো তাদের কথা সারা জীবন ধরে লিখে যাবে চঞ্চল। কিন্তু এরা তো ঠকে গেলো শেষ অবধি। কেন এমন হয়!

মারিয়া বলে, না এরা ঠকে নি। লোকসানের কথা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও কেন চঞ্চল? এরা যা পেয়েছে তার তুলনায় যা হারিয়েছে তা কিছু নয়। না-পাওয়ার কথা তুমি ভুলে যাও। বিশ্বের তরঙ্গে পড়ে এরা যা লাভ করলো তুমি সেকথা লিখে যাও।

তাই লিখে যাবে চঞ্চল। লাভের গান, পাওয়ার কাহিনী—তার তুলনা নেই। কতো দিনেরই বা এ মহাজীবন। যা রইলো না, যারা ভালোবাসলো না সেকথা ভেবে সে কোনদিনও ম্লান করে তুলবে না তার কোনো রচনার কোনো অধ্যায়। যা আছে, যা থাকবে, যারা ভালবাসলো, যারা পরের জন্যে উৎসর্গ করলো নিজেদের—চঞ্চলের সাহিত্য হবে তারই ইতিহাস।

একথা ভাবলে অদ্ভুত শান্তিতে চঞ্চলের মন ভরে যায়। সে নিজে যা পেয়েছে তার তুলনায় যা হারিয়েছে তা সামান্য। যখন লেখা নিয়ে মেতে থাকে তখন যা হারিয়েছে সেকথা তার মনেও থাকে না। মনে হয় তার যা আছে কোনো সম্রাট তার এক কণাও পেলে ধন্য হয়ে যেতো। চঞ্চলের আছে ভরা মন।

কিন্তু সে যখন শূন্য মনে বসে থাকে, যখন সংসারের অভাবের ছবি চোখে পড়ে আর বুঝতে পারে কী অসহ্য কষ্ট মারিয়া তার জন্যে দিনের পর দিন সহ্য করছে তখন তার মাথার মধ্যে দারুণ যন্ত্রণা হয়। এর শেষ কোথায়? এমনি করে আর

কতোদিন কাটবে ? দেশে ফেরবার কোনো আশা তাদের যেন আর নেই। সে লেখে বাংলায়। এখানে থেকে সে যদি একটার পর একটা উপন্যাস লিখে যায় তাহলে সেগুলি ছাপা অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করবে কেমন করে ? বাংলাদেশে লেখক বলে তার কোনো নাম নেই। কোনো প্রকাশক তাকে আমন্ত্রণ জানাবে না। তাই তাকে একবার দেশে ফিরতেই হবে। কিন্তু দেশে ফেরবার কথা মনে হলে তার সব কিছু যেন বিস্বাদ হয়ে যায়। বাবার কথা মনে পড়ে। কে যেন কানেব কাছে ফিসফিস করে বলে, তুমি অন্যায় করেছো। আর দেশে চঞ্চল কেমন করে ফিরবে! সে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। লোকে যখন প্রশ্ন করবে তুমি বিলেত থেকে কী করে এলে তখন তার উত্তর দেবার কথা থাকবে না। মারিয়া চঞ্চলের এ দুর্ভাবনার কথা জানে। কিন্তু এ নিয়ে সে মোটেও মাথা ঘামায় না বরং চঞ্চলের ব্যথা বুঝে তাকে শক্তি জোগাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

এসব কথা তুমি ভাবো কেন চঞ্চল ?

ভাবছি এদেশে কিছুই তো করলাম না। দেশে ফিরে লোকে জিজ্ঞেস করলে কী উত্তর দেবো ?

তোমার যা কাজ তুমি তাই করছো। দেশে ফিরে লোককে তুমি সেই কথাই বলবে।

লোকে তাহলে হাসবে মারিয়া।

কিন্তু আমাকে তুমি হাসিও না চঞ্চল। লোকের কথা ভেবে সময় নষ্ট কোরো না। তোমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো কাজ তুমি করে যাচ্ছো। সে কাজ ভালো করে করলে সবচেয়ে আগে নিজেকে অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু আজও তুমি তা করতে পারছো না, মারিয়া হেসে বললো, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, যতোক্ষণ না নিজেকে একেবারে ভুলতে পারছো ততক্ষণ তোমার সাহিত্য সম্পূর্ণ রূপ পাবে না।

কিন্তু আমি যা লিখছি তা প্রকাশিত হবে কেমন করে ?

বাঃ, আমরা কি কোনোদিনও ভারতবর্ষে যাবো না ?

কেমন করে যাবো ?

কয়েকটা উপন্যাস তুমি শেষ করে নাও তারপর আমি ভারতবর্ষে যাবার উপায় বের করবো।

চঞ্চল হেসে জিজ্ঞেস করলো, কেমন করে ?

মারিয়াও হেসে উত্তর দিলো, ইচ্ছে করলে আমি সব করতে পারি। আমার পিসির অনেক টাকা। তার কাছ থেকে আমি ধার নেবো।

শোধ করবে কেমন করে ?

তোমার বইগুলি প্রকাশিত হবার পর সেকথা ভাববো।

আর আমার কোনো বই যদি পাঠকের ভালো না লাগে ?

তাহলে আমি ফরাসী ভাষায় সেগুলি অনুবাদ করবো। আমাদের দেশের পাঠক তোমার লেখা পছন্দ করবেই। আর ভারতীয় লেখকের ফ্রান্সে খুব বেশি আদর।

সুতরাং এখন আমার কাজ হলো শুধু লিখে যাওয়া।

সেই কথাটি আমি তোমাকে বহুদিন ধরে বলে আসছি। বাজে ভাবনা না ভেবে তুমি শুধু কাজ করে যাও। একটা কথা আমি খুব বেশি বিশ্বাস করি চঞ্চল যে কাজ করে গেলে মানুষ একদিন না একদিন তার ফল পায়। কোনো কিছুতেই তার আটকায় না।

মারিয়ার কথা শুনতে শুনতে অসামান্য শক্তিতে চঞ্চলের মন ভরে ওঠে। দুঃখ কষ্ট দুর্ভাবনা—সে তো চিরকালের। এ থেকে কারুর মুক্তি নেই। কবে দুঃখ-কষ্টের অবসান হবে সে ভেবে বসে থাকলে জীবনে কোনোদিন হয়তো কারুর লেখা হবে না। দুঃখের মধ্যে রচনা করতে হবে, হাজার অভাবেও লিখতে হবে। জীবনে সময় বড়ো কম। যৌবন ক্ষণকালের।

নিজের সম্পর্কে কোনো বিশেষ ইচ্ছে চঞ্চলের নেই। লেখা ছাড়া আর কোনো দিকে তার মন নেই, স্বপ্ন সে দেখে না। শুধু বিয়ের পর কয়েকদিনের জন্যে মারিয়ার সঙ্গে সে প্যারিস যেতে চেয়েছিলো। এতোদিন হয়ে গেলো তাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু আজও তার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হলো না। সে মারিয়ার

মাকে দেখতে চায়, জানতে চায়, তার বাবা কেমন, দাদা বৌদি পিসির সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতে চায়।

মারিয়া একথা জানে। তারও খুব ইচ্ছে চঞ্চলকে প্যারিসে নিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। কিন্তু তবু মুখ ফুটে স্বামীকে সে একথা স্পষ্ট করে জানাতে পারে নি। কারণ বিয়ের পর থেকেই সংসারে অভাব দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। তাই সে ইচ্ছে করেই প্যারিস যাবার প্রসঙ্গ তোলে নি। সে গ্রাহ্য করে না কিছু। কিন্তু চঞ্চলকে প্যারিসে নিয়ে গেলে প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে। চঞ্চলের সেখানে অনেক কিছু দেখবার আছে। আর তার মা বাবা পিসি সেকেলে লোক। নিজেদের বর্তমান অবস্থা তাদের জানতে না দেয়া ভালো। মারিয়া জানে, সে মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে যে এমন দিন থাকবে না, সব অন্ধকার দূর হয়ে শিগগির একদিন আলোর রেখা ফুটে উঠবে। এখন ধৈর্য ধরে শুধু সেদিনের অপেক্ষা করতে হবে।

মারিয়া একবার ভেবেছিলো যে তারা এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও শুধু একটা ছোটো ঘর নিয়ে দুজনে থাকবে। কারণ এতো অভাবের মধ্যে আর সংসার চালানো যাচ্ছে না। অথচ তার সব সময় ভয় পাছে চঞ্চল এ নিয়ে মাথা ঘামায়—পাছে তার লেখার ব্যাঘাত হয়। তাই মারিয়া চঞ্চলের উপন্যাস শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে চায়। মারিয়া একথা ভেবে মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয় যে চঞ্চল বিয়ে করে হারালো অনেক কিছু। প্রাসাদ থেকে নেমে এলো পর্ণকুটীরে, বঞ্চিত হলো ধনী পিতার স্নেহ আর সম্পত্তি থেকে। কিন্তু পেলো কি? এই অভাবের জন্যে অকারণে মারিয়ার নিজেকে দায়ী মনে হয়। তাই সে সব সময় সতর্ক থাকে যেন কিছুতেই এর সামান্য স্পর্শ চঞ্চলের গায়ে না লাগে। তাই সে নিজে চঞ্চলের অলক্ষ্যে পরিশ্রম করে বেশি, আহার করে কম। যতোদিন না চঞ্চলের উপন্যাস শেষ হয় ততোদিন খরচ কমাবার কথাও ভাবতে পারে না। কারণ চঞ্চলের স্বভাব সে জানে। একটুতেই সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, সামান্য কাজে সে দিশা হারায়। বিয়ের পর অন্তত একটি লাভ তার হোক, একটি উপন্যাস সে শেষ করুক। তারপর দেখা যাবে কী করা যায়।

কিন্তু এমন কৃচ্ছ্রসাধন করে আর কদিন চলে! মারিয়া বুঝতে পারে যে তার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। প্রায়ই বুকে ব্যথা হয়। একটু জরও হয় যেন। ও হয়তো কিছু নয়। সময় ভালো নয়, তাই বোধহয় মাঝে মাঝে শরীর ঠিক থাকে না। চুপে চাপে এক সময় ডাক্তার দেখিয়ে নিলেই চলবে এখন। চঞ্চলকে তার শরীরের কথা কিছুতেই জানতে দেয়া হবে না। মারিয়ার দুঃখ হয় না, এই ভেবে সে খুশী হয় যে সে কাজে লাগছে। বিয়ের আগে কখনও দারিদ্র্যের মধ্যে তার দিন কাটে নি। বরং তার জন্যে নানারকম আলাদা ব্যবস্থা ছিলো। লেখাপড়ায় ভালো ছিলো বলে পিসি তাকে একটু বেশি যত্ন করতেন। কিন্তু এসব কথা আজকাল মারিয়ার মনে হয় না। সে শুধু বারবার নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলে সে যেন চিরদিন নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থায় মধ্যেও হাসিমুখে ফুল ফুটিয়ে যেতে পারে।
মারিয়া আর কিছু চায় না জীবনে।

মারিয়া কিছুতেই উঠতে পারলো না। বেশ জ্বর হয়েছে। কাশছে থেকে থেকে। যন্ত্রণায় শিরদাঁড়া ভেঙে যাচ্ছে। হঠাৎ শরীরের এমন অবস্থা হলো কেন সেকথা সে বুঝতে পারলো না। শরীরের ওপর অত্যাচার সে করেছে বটে। তা না করে উপায় ছিলো না। সে নিজে মরলে ক্ষতি নেই কিন্তু চঞ্চলকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।
হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। শরীর এতো সহ্য করবে কেন! প্রায় বছর খানেক থেকে লাঞ্চ খাওয়া সে ছেড়ে দিয়েছে। সামান্য এটা ওটা খেয়ে থাকে। চঞ্চল তখন অফিসে, একথা তার জানবার কথা নয়। তারপর আস্তে আস্তে রাত্তিরের খাওয়াও সে কমিয়ে দিলো। সপ্তাহে তিনদিন সন্ধ্যে বেলা একটি ইংরেজ মেয়েকে ফরাসী শেখাতে যায়। চঞ্চলকে বলে, তারা ডিনার খাওয়ায়। এমন করে সপ্তাহে তিনদিন রাত্তিরে দিনের পর দিন চা আর বিস্কুট খেয়ে চঞ্চলকে ভালো খাইয়েছে। যখন দিনের বেলা মাঝে মাঝে সামান্য জ্বর হয়েছে, চঞ্চল চিন্তা করবে বলে তাকে সেকথা জানায় নি। যদি

তখন একটু সাবধান হতো তাহলে আজ শরীরের এতো কাহিল অবস্থা হতো না এখন সে কী করবে, চঞ্চল ফিরে এলে তাকে কী বলবে? এবার আর তার কাছে কিছু লুকিয়ে রাখা চলবে না। মুখে কিছু না বললেও তার শুকনো মুখ আর দুর্বল দেহ আসল কথা চঞ্চলের কাছে প্রকাশ করে দেবে।

মারিয়া ঠিক বুঝতে পারে নি চঞ্চল কখন অফিস থেকে ফিরে এসেছে। ঘুমের ঘোরে তার হঠাৎ এক সময় মনে হলো কে যেন তার মাথায় আর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বড়ো শীতল সে স্পর্শ।

কখন এলে চঞ্চল?

অনেকক্ষণ ডাক্তারকে ফোন করে দিয়েছি, এসে পড়লো বলে।

কেন শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছো, সামান্য অসুখ দুদিনে সেরে যাবে।

তবু সাবধানের মার নেই।

কিন্তু তোমার বড়ো কষ্ট হবে যে। তুমি যে এক কাপ চাও করে নিতে পারো না—

খুব পারি। তুমি চা খাবে মারিয়া?

না না, আমার কথা নয়, আমি তোমার কথা ভাবছিলাম। তোমাকে খুব সকালে বেরুতে হয়। আমি পড়ে থাকলে কেমন করে রান্না করবে তুমি?

কী যে বলো। ওসব বাজে কথা থাক। সব কিছু করবার অভ্যাস আছে। বিয়ের আগে কতোবার রান্না করেছি—

জানি। সে কথা ভাবছি না, ভাবছি তোমার লেখার কথা। বেচারী তুমি কতোদিক সামলাবে!

তোমার জন্যে কয়েকদিন লেখা বন্ধ রাখলে এসে যাবে না—

সেটাই তো আমার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ, আমার জন্যে তোমার এক মুহূর্ত নষ্ট হয় আমি তো কিছুতেই চাই না। যদি কোনোদিন বুঝতে পারি আমার জন্যে তোমার অনেক মুহূর্ত সোনা হয়ে গেছে তাহলে আমার আনন্দ রাখবার জায়গা থাকবে না চঞ্চল।

বেশি কথা বোলো না। চুপ করে শুয়ে থাকো মারিয়া।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই স্তব্ধ হয়ে গেলো চঞ্চল। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে মারিয়াকে পরীক্ষা করলো। তার দৃষ্টি গম্ভীর হলো, চোখে সন্দেহ ফুটে উঠলো। নানা রকম ভাবে মারিয়াকে নতুন রকম করে পরীক্ষা করে অবশেষে সে জানালো যে বহুদিন ধরে অনিয়ম অত্যাচার করবার জন্যে এবং প্রয়োজনীয় খাবার না খাওয়ার জন্যে তার দুটো লাঙ্ আক্রান্ত হয়েছে। বাড়িতে আর এক মুহূর্তও এই রোগীকে রাখা উচিত নয়, আজই হাসপাতালে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। অবশ্য হাসপাতালে অবিলম্বে জায়গা পাওয়া কঠিন কিন্তু সে আশা করে লেস্টার স্কোয়ারের ফরাসী হাসপাতালে হয়তো একটা বেড পাওয়া যেতে পারে।

ডাক্তারের বলা শেষ কথাগুলি বোধ হয় চঞ্চল শুনতে পায় নি। মাত্র কয়েকটি কথা শোনবার পর তার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, শরীর অবশ হয়ে গেলো। মারিয়ার যন্ত্রণায় লাল মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল স্বরে বললো, এ তুমি কী করলে মারিয়া।

হঠাৎ নিজের ওপর ঘৃণা হলো চঞ্চলের। মনে হলো মারিয়ার এতো বড়ো অসুখের জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী সে নিজে। নিষ্ঠুরের মতো সে তার সর্বস্ব হরণ করেছে তাকে দেয়নি কিছুই। কেন সে আগে ভালো করে তার শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখলো না। কেন এমন করে তাকে মরণের পথে এগিয়ে যেতে দিলো। কেন তাকে পাশে বসিয়ে ভালো করে একদিনের জন্যেও খাওয়ালো না। কিন্তু ডাক্তারের একটি কথার অর্থ সে শুধু বুঝতে পারলো না, কেন সে বললো যে প্রয়োজনীয় খাবার না খাওয়ার জন্যে এ অসুখ হয়েছে। তারা তো এতো খারাপ খাওয়া খেতো না যার জন্যে এত বড়ো অসুখ হতে পারে। আশঙ্কায় চঞ্চলের চারপাশে যেন অন্ধকার নামলো।

তবু ভাগ্য ভালো যে আজ শুক্কুর বার। মাইনে পাবার দিন। তার পকেটে কিছু টাকা ছিলো। ডাক্তারের কথামতো তখুনি সে ফোন করলো লেস্টার স্কোয়ারের ফরাসী হাসপাতালে। হ্যাঁ, ফরাসীদের জন্যে সেখানে সব সময় জায়গা থাকে। মারিয়াকে ট্যাক্সিতে করে চঞ্চল সেই রাত্রেই হাসপাতালে নিয়ে

এলো। বেশি কথা তখন মারিয়া বলতে পারে নি, জ্বরের ঘোরে সে অজ্ঞানের মতো হয়ে পড়েছিলো।

এক ঘরে চারটে খাট। বেশ বড়ো ঘর। সেখানে মারিয়ার জায়গা হলো। নার্স, ডাক্তারেরা ভালো ইংরেজী জানে না। তারা খাটি ফরাসী। যাহোক নামঠিকানা লিখে সে রাত্রে চঞ্চল বিদায় নিলো। আর ইচ্ছে করলেই মারিয়ার দেখা পাওয়া যাবে না। সপ্তাহে মাত্র দুদিন দেখা করবার দিন। মঙ্গলবার আর শনিবার। মঙ্গলবার চারটে থেকে পাঁচটা আর শনিবার তিনটে থেকে পাঁচটা। বাড়ি ফিরে চঞ্চলের আর কিছুতেই ঘুম এলো না। নানা দুর্ভাবনা তাকে ঘুমহীন করে তুললো। চারপাশ বড়ো শূন্য মনে হচ্ছে। এখন কেমন করে দিন কাটাবে সে। কাকে বলবে মনের কথা। কে তার দেখাশোনা করবে। কে তাকে দিয়ে অতো আগ্রহ নিয়ে লেখাবে উপন্যাস। চঞ্চলের হঠাৎ মনে হলো এ পৃথিবীতে সে যেন সম্পূর্ণ একা।

কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না। এবার চঞ্চলের পালা। মারিয়া তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যেমন সর্বস্ব ত্যাগ করেছে এখন তেমন করে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। দিশা হারিয়ে সমস্ত গোলমাল করে মারিয়ার অসুখ আবও বাড়িয়ে তুললে চলবে না। ভয়ের কী আছে। এদেশে এ অসুখ সারতে দেরি লাগে না।

প্রাথমিক চিকিৎসা হয়ে গেলো। ডাক্তারও বেশি কথা জানালো না চঞ্চলকে। শুধু বললো, এখানে খুব বেশিদিন রাখা চলবে না। আর কিছুদিন পর কোনো স্যানিটোরিয়ামে পাঠাতে হবে।

কোথায়? ম্লান স্বরে চঞ্চল জিজ্ঞেস করলো।

সে-বন্দোবস্ত আমরা করে দেবো, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, ডাক্তার হেসে চঞ্চলের পিঠ চাপড়ে দিলো।

এদেশের সবচেয়ে বড়ো সুবিধা চিকিৎসার খরচ। মারিয়ার দুটো লাঙ্ আক্রান্ত হলেও খরচের ভার হাসপাতালের ওপর। মাঝে মাঝে চঞ্চল শুধু মারিয়ার মনের মতো খাবার নিয়ে যায়।

কয়েক দিনের মধ্যে লণ্ডনে চঞ্চলের সমস্ত বন্ধু-বান্ধব মারিয়ার অসুখের কথা জেনে ফেললো। তারা চঞ্চলকে আশ্বাস দিলো, সমবেদনা জানালো। অমল, সোমনাথ হাসপাতালে গিয়ে মারিয়াকে দেখে এলো। সকলেই বললো যখন যা দরকার হবে চঞ্চল যেন অসঙ্কোচে তাদের জানায়। এতো দুঃখেও আনন্দে চঞ্চলের মন ভরে উঠলো। এতো স্নেহ, এতো প্রীতি, এমন আন্তরিকতা— এ কি সহজে পাওয়া যায়। যদি সে সবই এদেশে পেলো তাহলে এমন করে হারাবার ইঙ্গিত এলো কেন। এদেশে ও রোগকে কেউ ভয় না করলেও চঞ্চলের ভারতীয় মন যেন আশঙ্কায় গুম হয়ে যায়।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো মারিয়ার ব্যবহার। কিছুতেই সে চঞ্চলকে কাছে যেতে দেয় না, বেশিক্ষণ হাসপাতালে বসতে দেয় না। সজল চোখে তার দিকে তাকিয়ে শুধু বলে, তুমি সাবধানে থেকো, তুমি এখানে বেশি এসো না, কথা দাও যে তুমি ডাক্তারকে দিয়ে নিজেকে কালই ভালো করে পরীক্ষা করিয়ে নেবে?

মারিয়ার কথা শুনে অভিমানে চঞ্চলের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, তুমি আমাকে আর লজ্জা দিও না মারিয়া। আমার জন্যে নিজেকে তুমি শেষ করতে বসেছো। সেকথা ভাবলে আমার নিজের ওপর ঘেন্না হয়। এখন আমার কথা না ভেবে দয়া করে তুমি তোমার নিজের কথা ভাবো।

ম্লান হেসে মারিয়া বললো, তুমি শুধু শুধু রাগ করছো। তোমার ভাবনা আমি না ভাবলে কে ভাববে বলো! সব ভুলে মারিয়া চঞ্চলের কোলে মাথা রাখলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, বড়ো অসময়ে আমার অসুখ হলো গো! তীরে এসে তরী ডুবলো। এখন আমি জানি আমার জন্যে চিন্তা করে করে এই উপন্যাস শেষ করতে তোমার অনেক সময় লেগে যাবে।

লাগুক, তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো।

তাই মনে হয় আর কিছু পরে আমার অসুখ হলো না কেন! বিয়ের পর তোমার সঙ্গে কেবলই শিক্ষয়িত্রীর মতো ব্যবহার করেছি। কতবার ইচ্ছে করে কঠিন হয়েছি, দূরে সরে গেছি, পাছে তোমার লেখার ব্যাঘাত হয়—

তুমি প্রেমের আবেগে সব ভুলে অন্ধ হয়ে যাও! কিন্তু মাঝপথে ছেদ পড়লো কেন?

সব ঠিক হয়ে যাবে মারিয়া। আমি তো বুঝেছি আমার সাহিত্যিক আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তুমি কি প্রাণপাত পরিশ্রম করেছো। তুমিই আমার সাহিত্যের আত্মা।

আমাকে বাড়িয়ে তুলো না চঞ্চল। আমি অতি সাধারণ মেয়ে। আমার বহু ভাগ্য যে তোমার সংস্পর্শে এসেছিলাম।

চিরকাল তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। তোমাকে বাদ দিয়ে আমার কলম কোনোদিনও চলবে না।

না চঞ্চল, কারুর জন্যে নিজেকে অতোখানি ছোটো কোরো না। শিল্পীরা চিরদিন নিঃসঙ্গ—তুমি তাদেরই একজন, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মারিয়া বললো, এ রোগ সারতে অনেক দেরি লাগে। আর সেরে গেলেও আর কোনোদিনও আমি তোমাকে আমার কাছে আসতে দেবো না। মন শক্ত করো চঞ্চল, মারিয়া পরম স্নেহে চঞ্চলের একটা হাত খুব শক্ত করে ধরে রইলো।

মারিয়া যেকথা বললো সেকথা বোঝবার মতো বুদ্ধি চঞ্চলের আছে। একটু আগে এ হাসপাতালের ডাক্তারদের সঙ্গে তার অনেকক্ষণ মারিয়ার অসুখ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। তারা আশ্বাস দিয়েছে মারিয়ার রোগ সেরে যাবে। কিন্তু সময় লাগবে বহুদিন। আর শহরের হাসপাতালে তাকে আর বেশিদিন কিছুতেই রাখা চলবে না। সেটা তার পক্ষে ক্ষতিকর। তাকে যতো তাড়াতাড়ি হয় পাহাড়ের স্যানিটোরিয়ামে নিয়ে যেতে হবে। এ হাসপাতাল থেকে খুব সহজে তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সাধারণত এ ধরনের রোগীকে হাসপাতাল থেকে ফ্রান্সের পিরিনিজ পর্বতে পাঠানো হয়। চঞ্চলের আপত্তি না থাকলে তার স্ত্রীকেও অবিলম্বে সেখানে পাঠানো হবে। সেখানেও খরচ কিছু লাগবে না। শুধু যাওয়ার ভাড়া দিতে হবে। এরাই ভালো নার্স সঙ্গে দিয়ে পিরিনিজ পর্বতমালার হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে।

উপায় নেই। মাথা নিচু করে চঞ্চল রাজী হলো। মারিয়াকে সেরে উঠতেই হবে। কিন্তু ডাক্তারকে কথা দেবার পর অসীম শূন্যতায় চঞ্চলের বুক কেঁপে উঠলো। এখন সে কী করবে! কেমন করে মারিয়াকে চলে যেতে দেবে! যদি সে আর ফিরে না আসে! তার শক্তি যেন তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবী দুলে উঠছে, মাথা ঘুরছে চঞ্চলের। কেউ কোথাও নেই, সে যেন সম্পূর্ণ একা। শূন্য গৃহে সে নিশ্বাস নেবে কেমন করে!

কথা বলছো না যে? কী ভাবছো চঞ্চল?

হঠাৎ চঞ্চল সমস্ত ভুলে গেলো। মারিয়াকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বললো, আমি তোমাকে কিছুতেই একা পিরিনিজে যেতে দেবো না। আমি তোমার সঙ্গে যাবো—

মারিয়া অনেকক্ষণ কথা বললো না। চঞ্চলকেও বাধা দিলো না। তার সঙ্গেও ডাক্তারের কথা হয়েছে। চঞ্চল অনুমতি দিলে তাকে আগামী সপ্তাহে লণ্ডন ছেড়ে যেতে হবে। দুঃখে মারিয়ার বুক ভেঙে যাচ্ছিলো। চঞ্চলকে কার কাছে রেখে যাবে সে। তার স্বামী যে বড়ো অসহায়। এতো শিগগির কেন যবনিকা নেমে এলো। তারা তো কাউকে ঠকায় নি, দুঃখ দেয় নি, আঘাত করে নি। কোনো অন্যায় করে নি। কোন্ অপরাধে এ শাস্তি হলো তাদের। মারিয়ার চোখ ঠেলে জল এলো। কিন্তু না, তাকে এমন করে ভেঙে পড়লে চলবে না। তাহলে চঞ্চল আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।

তুমি অবুঝ হয়ো না চঞ্চল। মন শক্ত করো, মারিয়া আস্তে আস্তে স্বামীর কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে একটু দূরে সরে এসে বললো, বলেছি না আমার অতো কাছে তুমি এসো না—

ভারী গলায় চঞ্চল বললো, আর আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে দিও না মারিয়া, আর কয়েক দিনের মধ্যে তুমি কতোদূরে সরে যাবে! কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাবোই।

মারিয়া হাসলো, তার চেয়ে তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে উপন্যাসের বাকি অধ্যায়গুলো লিখে ফেলো।

তুমি না থাকলে আমি এক লাইনও লিখতে পারবো না, আমি কিছু করতে পারবো না। লম্বা ছুটি নিয়ে আমিও পিরিনিজে যাবো—ফ্রান্সের পথে প্রান্তরে একা একা ঘুরে বেড়াবো। তুমি না থাকলে আমি কিছুতেই ঘরে বসে থাকতে পারবো না।

না না চঞ্চল, অমন কথা বোলো না। একজন মেয়ের জন্যে তুমি ঘর ছেড়ে, সব কাজ ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে সেকথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না। প্রেমের জন্যে অনেক মানুষ সব ছাড়ে, তারা নিঃসন্দেহে বড়ো প্রেমিক। কিন্তু তুমি যে বড়ো মানুষ। তুমি জীবনের জন্যে সব ছেড়েছো। আমি থাকি বা না থাকি জীবনের পূজা তুমি বন্ধ করবে কেন!

তোমাকে বাদ দিয়ে আমি কিছু করতে পারবো না মারিয়া।

কে বললো আমি নেই? কে বলে আমি থাকবো না? আমি তো হৃদয় ঢেলে দিয়েছি তোমাকে চঞ্চল। যতো বড়ো অসুখ আমার হোক না কেন, ভাগ্য যেখানে নিয়ে যাক—তোমার কাছ থেকে আমাকে কেড়ে নেবে কে! তুমি কোনোদিনও অবুঝ হয়ো না। তুমি রাজা। কতো বড়ো তোমার মন। এমন কাঙালপনা তোমার সাজে না।

চঞ্চল দীর্ণস্বরে বললো, কেন এমন হলো মারিয়া?

চঞ্চলের কাছ থেকে আর একটু দূরে সরে গিয়ে মারিয়া বললো, যা হয় ভালোর জন্যেই চঞ্চল। আজ আমার সন্দেহ ঘুচে গেছে, আজ আমি বিশ্বাস করি কেউ তোমাকে রুখতে পারবে না, তুমি বড়ো লেখক হবেই। কিন্তু আমি পিরিনিজে চলে গেলে শুরু হবে তোমার কঠিন পরীক্ষা। তাতে পাশ করে তুমি দেখিয়ে দাও যে পৃথিবীর কোনো শক্তি তোমার কলম থামিয়ে রাখতে পারবে না।

আমি ভেবে দেখেছি মারিয়া। আমি সব বুঝেছি। তোমার যাবার আর খুব বেশি দেরি নেই, হয়তো শিগগির আর এমন করে কথা বলবার সুযোগ মিলবে না। তাই তোমাকে বলি যে মানুষ মনের আনন্দে লেখে, মানুষ মনের দুঃখে নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করে কিন্তু যার মন উপবাসী সে কেমন করে সৃষ্টি

করবে? নোঙরহীন নৌকার মতো সে এদিক ওদিক ঘুরে মরবে, ঝরাপাতার মতো সে এখানে ওখানে মাথা খুঁড়বে।

না না চঞ্চল, বিদায় দেবার আগে তোমাকে বলতেই হবে যে তোমার মন উপবাসী নয়। অফুরান সম্পদ তোমার। তার থেকে এককণা নষ্ট হলে তোমার মহাভাণ্ডারে কোন ক্ষতি হবে না। এই বিরাট বসুন্ধরা তোমার। প্রত্যেক মানুষ যে তোমার একান্ত আপনার জন! আমার জন্যে তুমি তাদের সকলকে ভুলবে কেন!

কিন্তু যে আমাকে তৈরী করলে, নব অনুপ্রেরণায় আমার অন্তর ভরে তুললো সে আমায় ছেড়ে গেলে আমি লিখবো কেমন করে? আমি যে মানুষ।

তুমি শুধু মানুষ নয় চঞ্চল, তুমি মহামানুষ। নিজেকে অস্বীকার করে তুমি বিশ্বমানবের সুখদুঃখ মাথায় তুলে নিয়েছো। তাই আজ শুধু আমার জন্যে কেঁদে ভাসালে তুমি নিজেকে প্রতারণা করবে—লোকের কৃপা কুড়োবে কিন্তু কারুর কোনো কাজে লাগবে না। যদি কাঁদতেই হয় তাহলে পৃথিবীর জন্যে কাঁদো।

একটু চুপ করে থেকে মারিয়া বললো, সাধারণ মেয়ে যা চায় আমি তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি। তোমার মতো স্বামী, এতো প্রেম, এতো সমবেদনা—এমন কজন পায়! আজ সব ছেড়ে আমাকে ভাগ্য কতদিনের জন্যে দূরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে জানি না। কিন্তু তবু আমি তো কাঁদছি না চঞ্চল। আমি যা নিয়ে যাচ্ছি সে আমার চিরকালের সম্বল। আমার মতো বড়ো মানুষ কে!

মারিয়া থামতেই চঞ্চল বললো, আরও কথা বলো মারিয়া।

মারিয়া ম্লান হেসে বললো, তবু আমার সাধ পূর্ণ হয় নি। তোমার কাছ থেকে আরও চাই। বলো দেবে?

তোমাকে না দিলে কাকে দেবো আমি?

আমার কথা ভেবে নিজের দৈন্য রেখো না। তোমাকে যে মুহূর্তে আমার কাঙাল বলে মনে হবে সেই মুহূর্তে আমি যেন ইহলোক ছেড়ে চলে যাই। ও আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না। আমি যদি তোমার সামান্য কাজে লেগে থাকি, যদি কোনোদিন তোমাকে এতোটুকু অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকি

তাহলে সেকথা তুমি লোককে জানিয়ে দাও। আমি যদি সেবা দিয়ে তোমাকে সত্যি তৈরী করে থাকি তাহলে এবার তোমার সাহিত্য দিয়ে তুমি আমাকে ফুটিয়ে তোলো! কিন্তু আমার জন্যে কেঁদে কাঙালের মতো আমাকে খুঁজে ফিরো না, নিজেকে শেষ কোরো না। যখন যে লোকেই থাকি না কেন তোমার সাফল্যের গান আমার কানে বাজবেই। আমার হৃদয় ভরে যাবে চঞ্চল।

চঞ্চল উত্তর দিলো না। তীব্র উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর কাঁপছিলো। সময় হয়ে এলো। আগামী সপ্তাহে মারিয়া তাকে ছেড়ে অনেক দূর চলে যাবে। আবার কবে এমন করে দেখা হবে কে জানে! যদি আর দেখা না হয়। একথা ভাবতেই চঞ্চলের শরীরে রক্তচলাচল যেন বন্ধ হয়ে গেলো। মারিয়া যে কথাগুলি বললো সেসব কথার অর্থ সে জানে। নিজেকে ইচ্ছে করে ধ্বংস করে না কেউ। কিন্তু সমস্ত জেনেশুনেও কেন মানুষ দিশা হারায়, কেন তুচ্ছ হয়ে যায় যশ মান বৈভব? সিংহাসন তুচ্ছ মনে হয়? সেকথা মারিয়াকে জিজ্ঞেস করলে সে কি দেবে উত্তর?

আজ চঞ্চলের জীবনে এসেছে সেই সব তুচ্ছ মনে হওয়ার ক্ষণ। মারিয়া যদি তার জীবনে না থাকে, পিরিনিজ পর্বতমালায় যদি হয় তার জীবনের অবসান তাহলে স্থির হয়ে ঘরে বসে চঞ্চল কোনোদিন লেখাপড়ার কাজ করতে পারবে না—কিছুতেই না। তাকে ছুটে বেড়াতে হবে ঘর থেকে পথে, পথ থেকে দেশে মহাদেশে, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তার মনের এ অবস্থার কথা হাজার চেষ্টা করে সে মারিয়াকে কিছুতেই বোঝাতে পারবে না। শূন্য ঘরে হাতের কলম কাগজের সামনে এগিয়ে নিয়ে গেলেই মনের আনাচে কানাচে সাপের মতো হিলহিল করে উঠবে মারিয়ার স্মৃতি। কেমন করে লিখবে সে? কেমন করে ভুলবে যে একজন জীবন উৎসর্গ করে গেছে তার সাহিত্যের জন্যে। লেখবার জন্যে মাথা নিচু করলেই গায়ে এসে লাগবে তার নিশ্বাস। কার জন্যে লিখবে চঞ্চল? কেন লিখবে? হৃদয়ের আসল সম্পদে যে বঞ্চিত সে কেমন করে ফুটিয়ে তুলবে অন্য লোকের পাওয়ার উজ্জ্বল ইতিহাস।

কার কাছে যাবে চঞ্চল? কে দেবে উত্তর!

তিন বছর পরে

আজও নিয়মিত মারিয়ার চিঠি আসে। আশ্চর্য, তাতে ব্যাধির কথা থাকে না, কোনো যন্ত্রণার উল্লেখ থাকে না—থাকে শুধু আনন্দের কথা। কেমন করে পিরিনিজের চূড়ায় চূড়ায় প্রথম আলো ঝরে পড়ে, ঝলমল করে তুষার, কতো তুষারের পাখি উড়ে উড়ে ফেরে, তারা মারিয়ার বড়ো চেনা। সে সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকে বটে, তার চলাফেরা করা একেবারে বারণ, কিন্তু ওই তুষারের পাখিদের সঙ্গে তার মন যেন পর্বতমালা ছাড়িয়ে অনেক দূরে উড়ে যায় আর আশ্চর্য আনন্দে তার সারা শরীরে রোমাঞ্চ লাগে। তখন চঞ্চলকে মনে থাকে না মারিয়ার, তাকে একেবারে অপরিচিত মনে হয়। শুধু চঞ্চলকে নয়, মনে হয় তার সঙ্গে যেন এই পৃথিবীর কারুরই পরিচয় নেই। এমনি অনেক কথা লিখে মারিয়া চঞ্চলের খবর নেয়। কেমন করে তার দিন কাটছে, উপন্যাস কতদূর লেখা হলো, সে যেন নিশ্চয়ই ভালোভাবে শরীরের যত্ন করে। অথচ আশ্চর্য যে চঞ্চল অনেকবার লিখে লিখেও উত্তর পায় নি যে মারিয়া কেমন আছে, যেখানে আছে সেখানে তার ভালো লাগছে কিনা। যখন তার চিঠি আসে তখন চঞ্চল দেখে যে সে সব কথা লিখেছে কিন্তু অসুখ কিংবা হাসপাতালের কথা কিছুই লেখে নি।

কিন্তু এমন করে আর বেশিদিন চলবে না। চঞ্চল মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করবার চেষ্টা করতে লাগলো। অফিসের পর আর কোথাও না গিয়ে অনেকদিন সোজা বাড়ি চলে এলো, নিজের হাতে চা টোস্ট করে নিয়ে খেলো। তারপর শূন্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে কলম খুললো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তেমনি করে বসে রইলো। আশ্চর্য, লেখা হলো না। অনেকদিনের অনেক সুখ দুঃখের কথা মনে ভিড় করে আসে। কেন সে মারিয়ার দিকে যথাসময়ে তাকিয়ে দেখলো না, কেন নিতে পারলো না তার শরীরের খবর, কেন তাকে তিলতিল করে শেষ হয়ে যেতে দিলো। নিজেকে খুব বড়ো স্বার্থপর মনে

হতে লাগলো চঞ্চলের। সে যেন মারিয়ার সমস্ত প্রাণশক্তি নিষ্ঠুরের মতো গ্রাস করে নিয়েছে। স্বামী হিসেবে তার কর্তব্য মোটেই পালন করে নি। অকালে এমন করে যে সদ্যফোটা ফুল শুকিয়ে গেলো তার জন্যে এক চঞ্চল দায়ী। এসব কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে বসে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে চঞ্চলের, তার গা ছমছম করে ওঠে। উঠে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট খেতে খেতে সে অনেকক্ষণ পায়চারি করে। যন্ত্রণায় তার কপালের শিরাগুলি ফুলে ওঠে। হয়তো মারিয়া ভালো হয়ে উঠবে, হয়তো আবার ফিরে আসবে এই বাড়িতে, আবার তেমনি করে চঞ্চলের দিনগুলি আনন্দে ভরে তুলবে। কিন্তু তবু তো তাকে সব সময় সাবধানে থাকতে হবে, ও রোগ কখন আবার নতুন করে আক্রমণ করে ঠিক নেই।

কিন্তু যদি মারিয়া আর ফিরে না আসে। যদি—না, না, সেকথা এমন অবস্থায়ও কিছুতেই চঞ্চল ভাবতে পারে না, তার চোখের সামনে থেকে আলো মুছে যায়। লিখতে বসলেই এমনি অনেক কথা চঞ্চলের মনে আসে। কিছুতেই সে লেখায় মন দিতে পারে না। মারিয়া যতোদিন না ফিরে আসে ততোদিন সে বোধহয় একটি লাইনও আর লিখতে পারবে না। মারিয়া তাকে অনেক সময় বলতো, ইচ্ছে না থাকলেও রোজ অন্তত পাঁচ লাইন লিখবো—এই মনে করে লিখতে বসবে। প্রথমে খুব কষ্ট হবে, একেবারেই লিখতে ইচ্ছে করবে না, লিখলেও মনে হবে খুব বাজে হচ্ছে। তবু প্রাণপণ চেষ্টা করে লিখে যাবে। তারপর এক সময় দেখবে, পাঁচ লাইন ছেড়ে পঞ্চাশ লাইন কি তারও বেশি লিখেছো আর দিন কয়েক পর পড়ে দেখলে দেখবে প্রথমে যতো খারাপ মনে হয়েছিলো এখন আর ততো খারাপ লাগছে না। লিখতে ইচ্ছে থাক বা না থাক তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যে ভুললে চলবে না যে তুমি লেখক।

মারিয়ার বলা অনেক কথা মনে করে নতুন করে আবার চঞ্চল লেখবার চেষ্টা করলো। মারিয়ার সাধ পূর্ণ করতে হবে। তাকে লিখতে হবেই।

তবু ভাবনার শেষ হয় না। চঞ্চলের কেমন যেন ভয় লাগে—সব হারানোর ভয়। এ বাড়িতে এমন করে তার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। লেখা দূরের

কথা, থাকাও অসম্ভব। শূন্য ঘরে নিশ্বাস নিতে তার কষ্ট হয়। তার জীবনে যে একজন মানুষের এতোখানি প্রয়োজন হতে পারে সেকথা চঞ্চল এর আগে কোনো দিনও ভাবতে পারে নি। বাবার কথা এমন করে মনে হয় নি, এমনকি দেশের কথা মনে করেও সে এতো ব্যাকুল হয়ে ওঠে নি। পৃথিবীর কোথা থেকে সে যা পায় নি, মারিয়ার কাছ থেকে তাই পেয়েছে। মারিয়ার মধ্যে সে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে! সে তাকে নতুন উপলব্ধির উপকরণ জুগিয়েছে। আজ চঞ্চল মনেপ্রাণে বুঝতে পেরেছে যে সে শুধু লেখবার জন্যেই পৃথিবীতে জন্মেছে। আর কোনো কাজ তার জন্যে নয়, আর কিছু সে করতে পারবে না।

মারিয়া তাকে বার বার বলতো, তোমার জীবনে যাই ঘটুক না কেন, যতো বড়ো ঝড় আসুক, মনে রেখো কলম থামিয়ে রাখার কোনো অধিকার তোমার নেই। তোমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সঙ্গে কখনও তোমার সাহিত্যিক মনকে জড়াতে যেও না। নিজেকে অস্বীকার করতে হবে, নিরপেক্ষ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। তোমার নিজের একটা সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ আছে, সেখানে তোমার আশেপাশে কেউ নেই, সেখানে তুমি একেবারে একা।

এসব কথা চঞ্চল জানে, এসব কথা সে চেষ্টা করে অনেকবার ভেবে দেখেছে। সে ভাবপ্রবণ নয়। কিন্তু আজ সমস্ত জেনেশুনেও সে কছুতেই ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ অস্বীকার করতে পারছে না। একাকিত্বের বোঝা তাকে ঘুমহীন করে তুলছে। পঙ্গু করে রাখছে। পৃথিবীর আর যে-কোনো লেখক পারুক—চঞ্চল মনের এই দুঃসহ জ্বালা নিয়ে কিছুতেই লিখতে পারবে না। একা শূন্য ঘরে বসে লেখবার চেষ্টা করলেই তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠে। হ্যাঁ, আজ সে একেবারে একা। তার আশেপাশে কেউ নেই। দেশে এমন কোনো আত্মীয়ের কথা তার মনে পড়ে না, ক্লান্ত মন নিয়ে যার কাছে ছুটে গিয়ে চঞ্চল বিশ্রাম খুঁজতে পারে। মায়ের কথা বেশি করে মনে পড়ে চঞ্চলের। তিনি বেঁচে থাকলে আজ হয়তো তার সব দুঃখের অবসান হতো। মা মারা যাবার পর তার বাবা চঞ্চলকে মানুষ করবার জন্যে কঠিন কর্তব্য পালন করে গেছেন, মায়ের অভাব তাকে একদিনের জন্যেও বুঝতে দেন নি। আজ তিনি

একেবারে পর হয়ে গেছেন। চঞ্চলেরও মনে হয় অমন কোনো মানুষ যেন তার জীবনে কোনোদিন ছিলো না।

তারপর এলো মারিয়া। এমন আশ্চর্য মেয়ের কথা চঞ্চল কল্পনা করতে পারে নি। তাকে পেয়ে চঞ্চলের মনে হলো জীবনের আর-কিছু কিংবা আর-কাউকে সে যদি না পায়, যদি সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায় তাহলেও তার কোনো ক্ষতি হবে না। মারিয়ার চোখের তারায় সে পৃথিবীকে দেখেছে। আর কিছু প্রয়োজন নেই চঞ্চলের।

কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেলো! কোনো লাভ হলো না, ভালো করে কিছু বোঝা হলো না, সব সাধ অপূর্ণ থেকে গেলো। মারিয়া তাকে যে নির্জনতা দিয়ে গেলো তা মৃত্যুর মতো কঠোর। এর মাঝে বেশিদিন বাস করলে চঞ্চলের চেতনা গুলিয়ে যাবে।

নিরুপায় হয়ে অবশেষে সে মারিয়াকে দীর্ঘ চিঠি লিখে সমস্ত কথা জানিয়ে দিলো। খুব জোর দিয়ে লিখলো যে এমন করে আর সে লণ্ডনে বাস করতে পারবে না। তার সঙ্গে অবিলম্বে মারিয়ার দেখা হওয়া প্রয়োজন। অনেক ছুটি পাওনা আছে চঞ্চলের। অর্থও কিছু সে জমিয়েছে। মারিয়ার কাছ থেকে উত্তর পেলেই সে পিরিনিজে গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই ছোটো-খাটো হোটেল আছে, চঞ্চলের থাকবার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মারিয়ার মা বাবা পিসি দাদা বৌদি—সকলের সঙ্গে তার দেখা করবার খুব ইচ্ছে। এই অবসরে সকলের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে। প্যারিসে দিন দু-এক থেকে চঞ্চল পিরিনিজের পথে পা বাড়াবে। সে একেবারে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। শুধু কবে সেখানে পৌঁছবে সেকথা যদি মারিয়া তাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেয় তাহলে চঞ্চল যথাসময়ে টিকিট কেটে ট্রেন ধরবে।

সাধারণত মারিয়া চিঠি পেয়েই উত্তর দেয় না। বেশ কয়েকদিন সময় নেয় সে। কিন্তু চঞ্চলের এই চিঠি পাওয়া মাত্র সে উত্তর দিলো। মারিয়া লিখলো, কিছুতেই তুমি এখন আমাকে দেখতে আসতে পাবে না। দয়া করে তুমি

এসো না চঞ্চল! তোমার মনের অবস্থা আমি খুব বুঝতে পারি। আমারও মনের অবস্থা ভালো নয়—সেকথা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারো। তোমার মন শূন্যতায় ভরে আছে। আমি জানি আমাকে দেখবার জন্যে তুমি ব্যাকুল। তোমাকে কিছু না জানালেও তোমাকে আবার নতুন করে পাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো কামনা নেই। তোমার সঙ্গে এখন দেখা হওয়া আমার সৌভাগ্য। কিন্তু না চঞ্চল এখন কিছুতেই আমাদের দেখা হতে পাবে না। আমার এ অবস্থা আমি কিছুতেই তোমাকে দেখতে দেবো না! তোমার কাছে সুস্থ শরীরে রানীর মতো ছিলাম তাই আজ কিছুতেই আমার দীনমূর্তি তোমার সামনে দেখাতে পারবো না! কথা দাও তুমি আমার এ-রূপ দেখতে আসবে না। যদি আসো তাহলে আমাকে কঠিন আঘাত করবে। তুমি লিখেছো প্যারিসে কিছুদিন থেকে আমার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করবে। তা এখন হতেই পারে না চঞ্চল। ব্যাকুল মন নিয়ে তুমি আমার কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা কোরো না। মনের দৈন্য প্রকাশ হয়ে পড়বে, চোখে জল জমবে। তোমাকে তো আমি জানি, তুমি হয়তো নিজেকে সামলাতে পারবে না। আমার আত্মীয়েরা তোমাকে দেখবে আনন্দের মাঝে, দুঃখের রাত্রে নয়। ধৈর্য ধরো, আমি সেরে উঠি, তারপর আমরা দুজনে অনেকদিন প্যারিসে বাস করবো। তখন সকলের সঙ্গে দেখা হবে। এখানে আসবার সময় প্যারিসে আমার খুব খারাপ লেগেছিলো। আমার সেই প্যারিস! দুজনের কতো ইচ্ছে ছিলো এক সঙ্গে সেখানে কিছুদিন থাকবো। তবু আমি দুঃখ করি না কারণ আমার বিশ্বাস এ বিচ্ছেদ আমাদের মঙ্গলের জন্যেই। তোমাকে আরও নিবিড় করে পাচ্ছি, তোমাকে আরও গভীরভাবে বুঝেছি। আমার এই রোগ আমাকে শুধু যন্ত্রণা দেয় নি, নতুন উপলব্ধিও দিয়েছে।

প্যারিসে দাদা বৌদি পিসি স্টেশনে দেখা করতে এসেছিলো। তারা সকলে বারবার তোমার কথা জিজ্ঞেস করলো। তোমাকে না দেখেই তারা ভালোবেসে ফেলেছে। তাই তোমার শোকের সময় তোমার সঙ্গে তাদের যেন কিছুতেই দেখা না হয়। এখন তুমি প্যারিসে আসবে না, এখন তোমার

পিরিনিজে আসা হবে না। এলেও আমার দেখা তুমি পাবে না। আমাদের নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে কিন্তু এমন ভাঙাচোরা অবস্থায় নয়, প্রথম যখন দেখা হয়েছিলো তখন আমরা যেমন ছিলাম, আবার তেমন করে আমাদের মিলন হবে। তুমি ধৈর্য ধরো চঞ্চল। আবার আমরা একসঙ্গে থাকবো, এক ঘরে নিশ্বাস নেবো, তেমনি করেই দিন কাটাবো—আমি শুধু সেই আশাতে বেঁচে আছি, বেঁচে থাকবো। তোমার ভাবনা আমার আনন্দ, আমার সম্বল।

তুমি অনেক কথা লিখেছো, অনেক খবর দিয়েছো, আমাকে দেখবার নিদারুণ আগ্রহ বারবার প্রকাশ করেছো। কিন্তু তোমার সাহিত্যের কথা কিছু লেখো নি। চঞ্চল, আমি যে তোমাকে লেখক বলে জানি। তোমাকে আমি সত্য-দ্রষ্টা বলে মনে করতে চাই। তুমি জানো না যে এই রোগশয্যায় তোমার চিঠিগুলি আমার আত্মার আহার। কিন্তু কই, তুমি তো আমাকে সঞ্জীবনী মন্ত্র একবারও শোনালে না, একবারও পাঠালে না জাগরণের বাণী। তোমার চিঠিতে আজও বাজলো না রোগ শোক দুঃখ ভোলবার গান। তুমি কেবলই দুঃখ করো। আমাকে হারিয়ে কী বেদনায় তোমার দিন কাটছে সেকথা লিখে পাতার পর পাতা ভরিয়ে তোলো আর লেখো আমাকে বাদ দিয়ে তোমার কিছুতেই চলছে না, আমি তোমার একমাত্র নির্ভর। এ তো সাহিত্যিকের লেখা চিঠি নয় চঞ্চল। অন্য যে কোনো সাধারণ মানুষ ঠিক এমনি করুণ চিঠি লিখতো, এমনি ভাষায় জানাতো যে প্রিয়তমার বিরহে অসহ বেদনায় তার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেছে।

আমি কি তোমার কাছ থেকে এমনি বিলাপ শুনতে চেয়েছিলাম? না, সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভাবতে পারি নি যে তুমি আমার কাছে এমন করে মাথা নিচু করবে—এমন করে হৃদয়ের দৈন্য জানিয়ে এতোখানি ছোটো হবে! আমি ভেবেছিলাম, তুমি লিখবে যে আমার বিরহে দারুণ দুঃখে তোমার হৃদয় ভরে গেলেও একমুহূর্তের জন্যেও তুমি দিশা হারাও নি, আমি তোমার কাছে যা আশা করি সেই সাহিত্যে তুমি মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছো। আর শিল্পের অপূর্ব

স্পর্শে এত দ্রুত তোমার কলম চলছে যে মাঝে মাঝে আমার কথাও তোমার মনে থাকে না।

তুমি প্রায়ই বলো যে আমি তোমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছি, তোমাকে অন্য মানুষ করে তুলেছি, কিন্তু কই তুমি তো আজও তার প্রমাণ দিতে পা'লে না চঞ্চল। আমার জন্যে মনকে এমন দীন করে রাখলে ভবিষ্যতেও তুমি কেমন করে প্রমাণ করবে তোমার সাহিত্যিক জীবনে আমি সত্যি কিছু কাজে লেগেছিলাম ?

রোগশয্যায় তোমার চিঠিগুলি পড়বার পর প্রায়ই আমার দুই চোখ জলে ভরে ওঠে। আমি তোমার ওপর আস্থা হারাই। আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো। স্বামীর কাছ থেকে এতো প্রেম পাওয়া যে কোনো মেয়ের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সে আমার অসুখে আমাকে কেঁদে কেঁদে বলবার কি প্রয়োজন ! তোমার দীন বেশ, দরিদ্র রূপ আমি আজও কিছুতেই কল্পনা করতে পারি না চঞ্চল। তোমাকে অভাবের স্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে আমি প্রাণপণ সংগ্রাম করেছিলাম। আমার ভয় ছিলো যদি সংসারের নানা অভাব তোমার সুদূরপ্রসারী মনের সামনে বেড়া দিয়ে দেয়, পাছে রাজা কাঙাল হয়ে যায়। তাই তোমার করুণ চিঠি পেলে আমার মনে কঠিন আঘাত লাগে। আমাকে ভুল বুঝো না। ভেবো না যে আমি তোমাব দুঃখ বুঝতে পারছি না। আমি জানি তোমার কষ্ট কচ্ছে, জানি আমি ছাড়া তোমার কেউ নেই, জানি তুমি অনিয়ম অত্যাচার করে শরীর নষ্ট করবে। ইচ্ছে করে নয়, এসব কাজ করবার জন্যে তুমি জন্মাও নি বলে। তোমার সেবা করবার জন্যে তোমার কাছে সব সময় কোনো একজনের থাকা দরকার। তোমার ভাবনায় আমার ভালো ঘুম হয় না। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি আমি যেন সেরে গেছি, দুই বাহু মেলে ছুটে যাচ্ছি তোমার কাছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। তখন পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে তোমার কথা ভেবে অকারণ চোখের জল ফেলি। এর আগে তোমাকে এসব কথা আমি ইচ্ছে করে জানাই নি কারণ আমি জানি একথা শুনলে তুমি উন্মাদের মতো হয়ে আমার কাছে ছুটে আসতে চাইতে।

একবারও ভেবে দেখতে না যে এই হাসপাতালে এসে তুমি নিশ্চয়ই মুহূর্তে আমাকে সারিয়ে তুলতে পারতে না কিংবা আমার এই রুগ্ন শরীর দেখে তোমার মন প্রথম দেখার মতো উল্লাসে ভরে উঠতো না। তোমার আর আমার দুজনের মন আরও ভার হয়ে উঠতো আর আমার ম্লান করুণ চেহারার স্মৃতি নিয়ে তোমাকে একা ফিরে যেতে হতো।

তুমি বড়ো হও চঞ্চল। বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে সবকিছু বিচার করতে শেখো। সংযত ক রা হৃদয়াবেগ, শান্ত করো উচ্ছ্বাস। যে ভাবপ্রবণতা শুধু ঘর ভাঙে কিন্তু গৃহের শুভপ্রদীপ জ্বালে না, তা থেকে যতো শিগগির পারো মুক্ত হও। এবার আমি তোমার ওপর নির্ভর করতেই চাই। সেরে ওঠবার পর তোমার হাত ধরে এগিয়ে যেতে চাই মহাজগতে। তুমি আমাকে সারিয়ে তোলো, আমাকে বাঁচিয়ে তোলো। করুণ বিলাপগাথা গেয়ে নয়, কাজ দিয়ে, পৌরুষ দিয়ে, সৃজনের অনির্বাণ অগ্নিমন্ত্র দিয়ে। তোমার একান্ত আপনার আমি যে আজ তোমার পৃথিবী ভরে তুলেছে দুঃসহ বেদনায়, সে যেন তোমার দুঃখ মূর্ত করে তোলে তোমার সাহিত্যে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে মানুষের স্মরণে।

আজ আর কিছু নয়।

ইতি

তোমারই

মারিয়া

মারিয়ার চিঠি বারবার পড়েছে চঞ্চল। প্রত্যেকটি অক্ষর যেন লেখা হয়ে গেছে তার মনের নিভৃতে। একটি কথাও ভুল লেখে নি মারিয়া। চঞ্চল মন শক্ত করে ফেললো। মনে হচ্ছে এবার সত্যি উপন্যাস শেষ করতে পারবে।

সোমনাথের সঙ্গে প্রায়ই আজকাল চঞ্চলের দেখা হয়। তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়ে ইণ্ডিয়া হাউসের লাউঞ্জে বসে তারা অনেকক্ষণ গল্প করে। সুযোগ বুঝে একদিন চঞ্চল তাকে তার উপন্যাসের কাহিনী শুনিয়ে দিলো। গল্প শুনতে শুনতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো সোমনাথ।

অসীম আগ্রহে বললো, খুব ভালো হচ্ছে, একেবারে নতুন ধরনের উপন্যাস। তোমার খুব নাম হবে চঞ্চল।

উৎসাহ পেয়ে চঞ্চল বললো, আরও শুনবেন একদিন ?

নিশ্চয়ই। আমাদের কথা তুমি যে এতো সুন্দর করে লিখছো, এতো দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলছো, আমার কাছে তার চেয়ে আনন্দের আর কী থাকতে পারে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চঞ্চলের দিকে একটা চার্চম্যান নম্বর ওয়ান সিগ্রেট বাড়িয়ে দিয়ে সোমনাথ বললো, আমাদের কথা কেউ জানে না চঞ্চল। ভারত-বর্ষের কোনো লোক হয়তো কল্পনা করতে পারবে না আমরা কী অবস্থায় এখানে আছি। তুমি দেশে ফিরে যাও। তোমার কলমে জোর আছে, তুমি নিজের চোখে আমাদের আসল অবস্থা দেখে গেলে, তুমি দেশে ফিরে পাঠককে আমাদের কথা জানিয়ে দাও। যদি কোনোদিন ভারতবর্ষের কোনো পাঠক তোমার লেখা পড়ে আমাদের কথা মুহূর্তের জন্যেও মনে করে তাহলে আমরা ধন্য হবো।

কয়েক মাস থেকে চঞ্চল সোমনাথের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। কথা সে চিরদিনই কম বলে। কিন্তু আজকাল কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সে কী যেন ভাবতে আরম্ভ করে। ছলোছলো চোখে শূন্য দৃষ্টিতে চঞ্চলের দিকে তাকিয়ে থেকে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। গলার স্বরও যেন নিচু হয়ে গেছে সোমনাথের।

অবশ্য এর মধ্যে তার সংসারে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। মিলন অ্যানকে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। বাধা দেবার চেষ্টা করে সোমনাথ নিজেকে ওদের কাছে হাস্যাস্পদ করে তোলে নি কিন্তু হাসি মুখে বধূবরণও করতে পারে নি। একেবারে নির্বিকার থেকে গেছে। সে বুঝতে পেরেছে মিলন তার মতামতের কানাকড়ি মূল্য দেয় না। সে নতুন দর্শন মানে। সোমনাথের মনে হয় হয়তো ছেলে তাকে মানুষ বলে ধরে না। তবু সোমনাথ নির্বিকার। সে আর কোনোদিনও বোধহয় মিলনকে তার দর্শন বোঝাতে যাবে না। কিংস কলেজ থেকে পাস করে মিলন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক চেষ্টা করে চাকরি পেয়েছিলো। অ্যানালিসা তাকে বারবার বলেছিলো, মিলন, আমি যেন

জার্মানিতে মরি। তুই যেমন করে পারিস আমাকে সেখানে নিয়ে চল্। এখানে আমার আর কিছু ভালো লাগছে না—তোর বাবাকেও না।

সোমনাথ সব বুঝতে পারে। ছেলে পর হয়ে গেছে, ছেলের বউকে সে আপনার জন বলে মনে করতে পারছে না, এক বাড়িতে বাস করলেও তার স্ত্রী আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। এই অশান্তি, এই দারিদ্র্য—সব কিছুর জন্যে দায়ী যেন সোমনাথ নিজে। তবু দুঃখ করে না সে। কাউকে দোষ দেয় না। দোষ হচ্ছে বর্তমান হিংস্র সভ্যতার। যে আগুন তার ছাত্রজীবনে সারা পৃথিবীতে জ্বলে উঠেছিলো, তার শিখা আবার লকলক করে উঠছে চারপাশে। সোমনাথ ভেবেছিলো মানুষ সতর্ক হবে, কল্যাণের মন্ত্রে দীক্ষা নেবে। লোভ সম্বরণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। কিন্তু আজও স্বার্থপর মানবসমাজ কিছুতেই হীন প্রবৃত্তি দমন করতে পারলো না। আবার আগুন জ্বলে উঠবে, আবার ছারখার হবে পৃথিবী। কিন্তু শান্তি একদিন আসবেই। সংসার যদি তাকে নিঃস্ব রিক্ত পথের ভিখিরী করে একে একে সবকিছু হরণ করে নেয় তাহলেও হার মানবে না সোমনাথ। সমস্ত অন্তর দিয়ে সে গ্রহণ করবে মহা-শান্তির মন্ত্র। এমন একদিন আসবেই যেদিন পৃথিবীর মানুষ পূর্বপুরুষের হিংস্র-স্বভাবের কথা স্মরণ করে লজ্জায় মাথা নিচু করবে। তখন সোমনাথ থাকবে না। না থাকুক, তাতে ক্ষতি নেই। তখন তার কোনো উত্তরপুরুষ তার কথা ভেবে মনে মনে বলবে, না সে ভুল করে নি। বহুদিন আগে শান্তির মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে সে জীবনের সবকিছু উৎসর্গ করেছিলো।

মিলন অ্যান আর অ্যানালিসাকে নিয়ে জার্মানি চলে গেছে। যাবার সময় অ্যানালিসা খুব কেঁদেছিলো। অনেকবার সোমনাথকে বলেছিলো অন্তত কিছু দিনের জন্যে তাদের সঙ্গে যেতে। কিন্তু সোমনাথ কিছুতেই রাজী হতে পারে নি। যে ছেলের কাছে তার মতামতের কোনো মূল্য নেই তাকে কেমন করে সে সহ্য করবে? কিন্তু তবু অ্যানালিসা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছেলের সঙ্গে নিজের দেশে যাচ্ছে বলে সোমনাথ এতো কু দুঃখিত হয় নি। কেনই বা সে যাবে না। নিজের দেশ দেখতে কে না চায়। অ্যানালিসা তার জন্যে অনেক

করেছে, যন্ত্রের মতো তাকে অনুসরণ করে গেছে। কিন্তু শেষ অবধি সে যদি হাতে হাতে ফল না পায় তাহলে কেন স্বামীর মন্ত্র মিথ্যা বলে মনে করবে না? ছেলের মতামত তার যদি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় তাহলে তার মত নিজের বলে গ্রহণ করতে সে কোনোদিনও তাকে বারণ করবে না। নিজের দেশে যাওয়ার সুযোগ এলে সকলেই উন্মাদের মতো হয়ে ছুটে যায়। অ্যানালিসা নিজের ছেলে-বউএর সঙ্গে গেছে। এতে কার কী বলবার আছে। অ্যানালিসা সোমনাথের জন্যে অনেক ত্যাগ করেছে, তার মতামত মনেপ্রাণে গ্রহণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ অবধি সে যদি শুধু কষ্ট সহ্য করে আর কেউ যদি তাকে বোঝায় যে মতান্তরে বিশ্বাস করলে সব দুখেকষ্টের অবসান হবে তাহলে সে কেন মত বদলাবে না! সোমনাথ কখনও কাউকে জোর করে কিছু বিশ্বাস করাতে চায় না।

যখন কিছুতেই মিলনের সঙ্গে জার্মানি যেতে রাজী হলো না তখন চোখে জল নিয়ে অ্যানালিসা বলেছিলো, আমি শিগগির ফিরে আসবো। তোমার দেখাশোনা না করে বেশিদিন থাকতে পারবো না।

কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেল অ্যানালিসা ফিরে এলো না। জার্মানি যাবার জন্যে বারবার সোমনাথকে চিঠি লিখে অনুরোধ করতে লাগলো। অনেক বছর অ্যানালিসার সঙ্গে ঘর করছে সোমনাথ। একা থাকার অভ্যাস তার নেই। তাই বড়ো অসুবিধায় পড়লো। আর সহ্য করতে না পেরে একদিন প্রচুর অনিচ্ছায় স্ত্রীকে ফিরে আসতে লিখলো। কিন্তু অ্যানালিসা এলো না। উত্তরে জানালো, তার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। হার্টের অসুখ বেড়েছে। কোনোদিন শেষ হয়ে যাবে ঠিক নেই। তাই আপাতত লণ্ডনে আসবার ইচ্ছে তার নেই। সবচেয়ে ভালো হয় যদি সোমনাথ জার্মানিতে চলে আসে। তাহলে সব দিক দিয়ে তার উপকার হবে। সেখানে এখন তার মতো এঞ্জিনীয়ারের মূল্য অনেক। মিলন বোধ হয় অ্যানালিসার দেশে থেকে যাবে। কারণ সেখানে তার উন্নতি করবার সম্ভাবনা প্রচুর। মিলন বলে, কোনো বিশেষ দেশে থাকবার তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। পৃথিবীর যে কোনো দেশে বসে সে তার নিজের কাজ

করে যেতে পারে। আর এতোদিন পর জার্মানিতে এসে অ্যানালিসার খুব ভালো লাগছে। লণ্ডনের ধোঁয়া আর কুয়াশার কথা মনে হলে সেখানে সে কোনো কারণেই হোক না কেন তার আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। সুতরাং সোমনাথ যেন নিশ্চয় বার্লিনে আসে। চাকরি বিনা দ্বিধায় সে ছেড়ে দিতে পারে কেননা সেখানে তার চাকরির অভাব হবে না।

অ্যানালিসার চিঠি পড়ে সোমনাথ যেন একটা রূঢ় আঘাত পেলো। এতো বড়ো আঘাত স্ত্রীর কাছ থেকে এর আগে সে কখনও পায় নি। তাব মতামতের না হোক, স্বামী হিসেবেও সে তাকে কোনো মূল্য দেয়া প্রয়োজন মনে করলো না। স্পষ্ট লিখলো, যে কোনো কারণেই হোক না কেন, তার আর লণ্ডনে ফিরে আসতেই ইচ্ছে করে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সোমনাথ। অ্যানালিসাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন শুধু আরাম চায়, কোনোরকম অসুবিধা সহ্য করতে ইতস্তত করে। আজ অ্যানালিসার বয়স হয়েছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে সে তো বাস করতে চাইবেই। কিন্তু এসব কথা মনে করলেও বহু বছর পর হঠাৎ সোমনাথ অ্যানালিসাকে যেন স্ত্রী বলে ভাবতে পারলো না। তার মনে হলো, এতোদিন একসঙ্গে ঘর করলেও কী যেন একটা জিনিস সে অ্যানালিসার কাছ থেকে পায় নি। হয়তো এদেশের মেয়ের কাছ থেকে সে-জিনিস কেউ পায় না।

সোমনাথ কয়েকদিনের মধ্যেই অ্যানালিসাকে উত্তর লিখে দিলো, আমি আমার আদর্শের জন্যে দেশ ছেড়েছি, জীবনে যতোই দুঃখকষ্ট আসুক না কেন, আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুধু শারীরিক আরামের জন্যে আমি লণ্ডন ছেড়ে কোথাও যাবো না। তুমি সুখে থাকো, তুমি ভালো থাকো, তুমি রানী হও। কিন্তু আমাকে এমনি একা থাকতে দাও। বার্লিনে যাবার জন্যে তুমি আমাকে আর অনুরোধ কোরো না।

সেই চিঠি ডাকে দিয়ে সোমনাথ নিশ্চিন্ত হলো। এখন কারুর জন্যে তার আর কোনো দায় নেই। সব বন্ধন থেকে সে একেবারে মুক্ত। মনে একটা কাঁটা

বিঁধে থাকলেও সোমনাথ নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলো যে এমনি করে সব আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে না পারলে ব্যাপক আদর্শের জন্যে পরিপূর্ণরূপে সামনে অগ্রসর হওয়া কঠিন। সন্তান ছেড়ে যাক, স্ত্রী দূরে চলে যাক, চুরমার হয়ে যাক ঘর—কারুর জন্যে চোখের জল ফেলে নিজেকে অলস অসহায় করে তুলবে না সোমনাথ! ব্যক্তিগত সমস্যার জন্যে তার কিছুই যায় আসে না, যে সমষ্টিগত সমস্যা নিয়ে সোমনাথের জীবন, তার সমাধান করতে হলে নিজের সবকিছু তুচ্ছ করতে হবে।

তবু থেকে থেকে তার চিন্তাব জাল যেন ছিঁড়ে যায়। একা ঘরে বসে থাকলে নিজেকে বড়ো দুর্বল মনে হয়, মাথার শিরাগুলি দপদপ করে। কৈশোর থেকে শুরু করে আজকের অনেক কথা মনে ভিড় করে আসে। চুপ করে বসে তার শুধু নানা অসংযত কাহিনী ভাবতে ইচ্ছে করে। বেরুতে ইচ্ছে করে না, বেড়াতে ইচ্ছে করে না, কারুর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না। রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় না, দিনের বেলা রাজ্যের ক্লান্তি তাব শরীর ছেয়ে নেমে আসে। আর হঠাৎ কখন ব্যাপক আদর্শের চেয়ে তার নিজের সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠে। থেকে থেকে হাত-পা হিম হয়ে যায় সোমনাথের। ভারতবর্ষ তকে বারবার ডাকে। সাঁওতাল পরগনার রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল, বর্ষাকালে বাংলাদেশের ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, কত অপরূপ গ্রীষ্ম-সন্ধ্যা ভরে তোলে তার স্মরণ। মরবার আগে একবার তাকে ভারতবর্ষে যেতেই হবে।

তাই অ্যানালিসার ওপর সামান্য অভিমান হলেও মনে কোনো রাগ রাখতে পারে না সে। এই বয়সে দেশে যেতে পারলে বিদেশে কে আর দারিদ্র্যের মাঝে ইচ্ছে করে ফিরে আসতে চায়।

সোমনাথ দুঃখবাদী নয়। কিন্তু আজকাল থেকে থেকে তার চারপাশ ঘিরে সারাদিন একটা বিষণ্ণ সুর বাজে। মনে হয়, সব শেষ হয়ে এলো। এইবার একদিন তার চোখের সামনে থেকে আস্তে আস্তে আলো মিলিয়ে যাবে, নেমে আসবে গভীর অন্ধকার, সব কোলাহল থেমে যাবে। ভয় লাগে সোমনাথের।

কেবলই সে অন্তিম মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে। কে যেন তার সমস্ত শক্তি হরণ করে নিয়েছে।

অনেকদিন আগে কিশোর বয়সে তার ছবি আঁকতে ভালো লাগতো। কিন্তু সে একেবারেই বাল্যলীলা। তারপর আজ অবধি জীবনের আর কোনোদিন সোমনাথ তুলি ধরে নি। আজ অনেক—অনেকদিন পর আবার নতুন করে সোমনাথের ছবি আঁকবার সাধ হলো। সময় পেলে সে বেরিয়ে পড়ে লোক-সমাজ থেকে অনেক দূরে—এপিং জঙ্গলে কিংবা কোনো পার্কের গহনে—যেখানে গাছপালা আর পাতার মর্মর ছাড়া আর কিছু নেই। সেই নির্জনে বসে ছবি আঁকতে আঁকতে সোমনাথ শুধু নিজেকে খোঁজবার চেষ্টা করে আর তার বারবার মনে হয় শেষ হয়ে আসছে দিন। যখন নির্জনতা অসহ্য মনে হয় তখন ইণ্ডিয়া হাউসে এসে সে চঞ্চলের দেখা পাবার আশায় গুম হয়ে সোফায় বসে থাকে অনেকক্ষণ। চঞ্চলকে সোমনাথ ভালোবাসে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে মন খুলে তার সঙ্গে নিজের সব কথা আলোচনা করতে কিন্তু কিছুতেই পারে না। কোথায় যেন বেধে যায়।

চঞ্চল, চার্চম্যান নম্বর ওয়ান সিগ্রেট নিবিয়ে ফেলে সোমনাথ বললো, মারিয়া কেমন আছে ?

স্তিমিত স্বরে চঞ্চল উত্তর দিলো, অসুখের কথা সে আমাকে লেখে না, একটু থেমে সে বললো, চিঠি পড়ে মনে হয় ভালোই আছে।

মারিয়া ফিরে এলে তুমি কী করবে চঞ্চল ?

চঞ্চল সহসা উত্তর দিতে পারলো না। সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো। তারপর এক সময় আস্তে আস্তে বললো, জানি না কী করবো। এদেশে কী আর করবার আছে বলুন ?

কিছু করবার নেই, ভাঙা গলায় থেমে থেমে সোমনাথ বললো, দেশে ফিরে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করো, যেমন করে হোক ভারতবর্ষে ফিরে যাও—

কিন্তু কেমন করে যাবো বলে দিন।

জাহাজের খালাসী হয়ে, কু ল হয়ে, চুরি করে, ধার করে, পালিয়ে, সাঁতরে—যে করে হোক!
দেশে ফিরে কী করবো? পড়াশুনো এখানে করলাম না, শুধু লেখবার চেষ্টা করে দিন কাটালাম—
ভারতবর্ষে গিয়ে ঠিক তাই করবে। তোমাব ভয় কি? তুমি লিখতে পারো। আমি বলছি চঞ্চল, আমি দুই হাত তুলে তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তোমার সেখানে কোনোদিনও মোটা ভাতকাপড়ের অভাব হবে না। আমাদের যে কাহিনী তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছো, আমাদের দেশের লোক তা প্রাণভরে শুনবে। তোমাকে বলবে, আরও বলো। বাংলাদেশ আমাদের কথা না শুনলে, আমাদের দুঃখে চোখের জল আর কোন দেশ ফেলবে বলো!
কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আগে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করবো—
তা করে কিছু লাভ হবে না চঞ্চল। ভারতবর্ষের মানুষ নিয়ে তোমার উপন্যাস। এ দেশের লোক তার কতোখানি রসগ্রহণ করবে? কি বুঝবে এরা দেশে 'ফরতে না পারার বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের জ্বালা? আগে তোমার দেশের লোককে শোনাও আমাদের কথা। অনুবাদের কথা পরে ভাবা যাবে। আমরা তো রইলাম এ'ানে।
আপনি বুঝি আর ফিরবেন না?
দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ম্লান হেসে সোমনাথ বললো, কোনো উপায় নেই। কোনো রকমে ফিরে যেতে পারলেও এই বয়সে ভারতবর্ষে গিয়ে আমার কী করবার আছে বলো? মরবার আগে একবার দেশ ঘুরে যাবার বড়ো ইচ্ছে আছে। দেশে যেতে কে না চায়! অ্যানালিসা ওর নিজের দেশে গিয়ে আর আসতে চাইছে না, আমাকে বারবার যেতে লিখছে। আমিও ভারতবর্ষে গেলে কি আর এখানে ফিরে আসতে চাইতাম! অতো মায়া, অতো দরদ, অতো সমবেদনা পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই চঞ্চল। ভারতবর্ষের মতো দেশ হয় না। তাই তোমাকে ফিরে যেতে বলছি। এখন ফিরে যেতে না পারলে জীবনে আর পারবে না। কিছু থাক বা না থাক, তোমার বয়স আছে, কলম

থাছে, তোমার ভাবনা কি, ছবি আঁকবার ক্যানভাস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সোমনাথ বললো, তোমার উপন্যাস এখনও শেষ হয় নি। যদি পারো কোনো চরিত্রের মুখে শেষের দিকে এই কথাগুলি বসিয়ে দিও, আমার দেহ পেলো ইউরোপ, মনও জয় করলো ইউরোপ। কিন্তু ভারতবর্ষ পাবে আমার আত্মা। আমি যখন থাকবো না তখন কন্যাকুমারিকা থেকে হিমাচল অবধি একদিন ঘুরে ফিরবে আমার ক্লান্তিহীন আত্মা—ম্লান হেসে সোমনাথ আস্তে আস্তে ইণ্ডিয়া হাউস থেকে বেরিয়ে গেলো।

এখানে চঞ্চলের সমবয়সী বন্ধু বলতে একমাত্র অমল দত্ত। তার সঙ্গে আজকাল প্রায়ই দেখা হয়। বিয়েব আগে ওরা যেমন একসঙ্গে ছুটির পর ইণ্ডিয়া হাউস থেকে বার হতো আজও মাঝে মাঝে তেমনি বার হয়। ঠিক তেমনি করেই অমল ক্লাবে যাবার জন্যে টানাটানি করে কিন্তু আজকাল আর চঞ্চল সেখানে যেতে চায় না।

হেসে অমল দত্তকে বলে, এতোদিন ক্লাবে ঘুরে আজও বিয়ে করবার মতো কাউকে পেলে না অমল ?

অমল দত্ত উত্তর দেয়, মাথা খারাপ, এদেশে বিয়ে করবে কে ? সময়মতো দেশে গিয়ে বিয়ে করে আনবো।

কবে যাবে দেশে ?

যাবো সময়মতো, ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

তুমি কি এদেশেই থেকে যাবে নাকি ?

নিশ্চয়ই। কোন চুলোয় আর যাবো ? যেখানে পয়সা সেখানে আমি—বুঝেছো ?

অমলকে উপদেশ দেবার লোভ সামলাতে পারে না চঞ্চল। একটু গম্ভীর হয়ে বলে, আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি অমল। যৌবন যতোদিন থাকে ততোদিন এদেশ ভালো লাগে কিন্তু বুড়ো বয়সে থাকতে ভালো লাগে না আর। তখন ফেরবারও উপায় থাকে না—

আরে দুত্তোর জীবন, দেশে এতো পয়সার টানাটানি যে সেখানে চিরকাল বার্ধক্য। যেখানে পয়সা নেই সেখানে আমি নেই।

কিন্তু বয়স হলো, বিয়ে-থা করো এবার—

যথাসময়ে হবে, অমল হেসে বলে, 'নজে লেজ কেটে আমাকেও দলে ভেড়াতে চাচ্ছো বুঝি? উঁহু এ বড়ো শক্ত ঠাঁই, এখানে এ দেশের মেয়েদের সুবিধা হবে না—যতো সব স্বার্থপর ঘাড়ভাঙার দল?

এতোদিন এদেশে থেকে তোমার যদি এই ধারণা হয় তাহলে আমার কিছু বলবার নেই—

বোলো না, অমল দত্ত হেসে বলে, কে তোমাকে বলেছে আমাকে উপদেশ দিতে? আমি কিছুতেই আমার মত বদলাবো না। যতোদিন চলে এদেশে চালিয়ে যাবো। এদেশের মেয়েরা যেমন ছেলেদের খেলায় আমিও তেমনি ওদের খেলিয়ে যাবো। তারপর হয় ভারতবর্ষে বদলী হবার চেষ্টা করবো নয় খাঁটি বাঙালী মেয়ে বিয়ে করে আবার চলে আসবো।

তাহলে এদেশে এলে কেন?

বিয়ে করতে নয়, পয়সা রোজগার করতে। দেশে কে আমাকে এমন চাকরি দিতো? আমার গুণাবলীর কথা তো জানোই।

চঞ্চল আর কথা বলে না। সে কুড়ি বছর পরের অমল দত্তর চেহারা মনে মনে কল্পনা করবার চেষ্টা করে। সে যে দেশে গিয়ে বিয়ে করবে সেকথা মনে হয় না। হয়তো এখানেই সংসার করবে। দেশে আর ফেরা হবে না। ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকবে না। এদেশের প্রতি অমল দত্তর যা মনোভাব তাতে মনে হয় শেষ বয়সে এখানকার সবকিছুকে গালাগাল করতে করতে অনঙ্গ দাশের মতো এখানেই একদিন শেষ হয়ে যাবে। তবু আজ যৌবনের উত্তাপে জীবনে আর কোনো কিছু ভেবে দেখবার অবসর পাবে না। এমনি হয়। প্রথমে মনে হয় ফিরবো বৈকি একদিন। তারপর ফিরি ফিরি করে দিন কেটে যায়। সেই ছকে-ফেলা জীবন। ফেরা আর হয়ে ওঠে না। কিন্তু অমল দত্ত আজ সেকথা বুঝবে না। যৌবন যতোদিন থাকে ততোদিন কেউ বোঝে না।

তাই চঞ্চল আর তাকে কোনো কথা বোঝাবার চেষ্টা করে না। নিজে কী করবে সেকথা ভাববার চেষ্টা করে।

আজকের সকাল আশ্চর্য উজ্জ্বল। দিগন্তের হালকা রোদ্দুর কাঁচা সোনার মতো ঝরে ঝরে পড়ছে লণ্ডনের অলিতে গলিতে। আপামর জনসাধারণ নিঃশব্দে উপভোগ করছে প্রকৃতির আশীর্বাদ। কোথাও কোনো কোলাহল নেই। এতো নির্জন লণ্ডন চঞ্চল আর কখনও দেখে নি।

কলম থামিয়ে খোলা জানলা দিয়ে একদৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিলো। তার ঘরের কাছ থেকে ডানা ঝাপটে একটা শাদা পায়রা একটু আগে উড়ে গেলো। দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে সেই পায়রা। চঞ্চল এখনও তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আস্তে আস্তে চঞ্চলের দৃষ্টি থেকে সরে যেতে লাগলো সেই শ্বেত কপোত। তারপর এক সময় হঠাৎ কখন যেন দিগন্তে বিলীন হলো। তাকে আর দেখতে পেলো না চঞ্চল।

ঝি এসে চিঠি দিয়ে গেলো। সকালের ডাকে এসেছে। একটির উপর হাতের লেখা দেখে চঞ্চল চমকে উঠলো। তার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে গেলো। বাবার চিঠি। এতোদিন পর বাবা তাকে কী কথা লিখেছেন। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে চঞ্চল সেই এয়ার লেটার ছিঁড়তে লাগলো।

খুব বড়ো চিঠি নয়। বাবা শুধু কাজের কথা লিখেছেন। সংসারে তাঁর মন নেই। তিনি কাশীবাস করবেন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি চঞ্চলের নামে লিখে দিয়েছেন। সে আর তার স্ত্রী যেন অবিলম্বে ফিরে গিয়ে বাড়ি দখল করে। চঞ্চল কবে সে পৌঁছবে কথা জানালে তিনি কাশী যাবার দিন স্থির করবেন। তবে একটি কথা, চঞ্চল কিংবা তার স্ত্রী কারুর সঙ্গেই তাঁর দেখা হবে না ইত্যাদি।

বাবার চিঠি পড়ে চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো না। শুধু ছোটো একটি দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলে ভাবলো, বাবা এ চিঠি তাকে তিন বছর আগে লিখলেন না কেন! তাহলে আজকের মতো এতো অন্ধকার তার জীবনে এমন করে কিছুতেই নেমে আসতে পারতো না। জীবনে যখন যা সবচেয়ে প্রয়োজন ঠিক তখন মানুষ কেন তা পায় না! যা হোক, একথা আজকেই মারিয়াকে লিখতে হবে। চঞ্চল জানে যে এ খবর পেয়ে সে খুশি হবেই। যত্ন করে বাবার চিঠি চঞ্চল তুলে রাখলো।

দ্বিতীয় চিঠি ফ্রান্স থেকে এসেছে। হাতের লেখা চঞ্চল চেনে না। খামের ওপর পিরিনিজের ছাপ রয়েছে। সে মনে ভাবলো নিশ্চয়ই মারিয়া অন্য কাউকে দিয়ে ঠিকানা লিখিয়েছে। খেয়াল হলে মাঝে মাঝে সে তাই করে। কিন্তু চিঠি পড়তে পড়তে চঞ্চলের হাত কেঁপে গেলো, ঝিমঝিম করে উঠলো শির-উপশিরা, শরীর দুলে উঠলো। পিরিনিজ স্যানিটোরিয়ামের কর্তৃপক্ষ তাকে জানিয়েছে, চব্বিশে জুলাই সকাল আটটায় তোমায় স্ত্রী ইহলোক ছেড়ে গেছে। তার শেষ কথা, আহা তাকে যদি একবার দেখতে পেতাম! বড়ো লোকের ছেলে সে। আমার জন্যে সমস্ত ত্যাগ করে কী কঠিন দারিদ্র্য বরণ করেছিলো! সে যেন দেশে ফিরে যায়, সে যেন সফল হয়, তার যশে যেন পৃথিবী ভরে যায়! চঞ্চল—চঞ্চল—

মৃত্যুর ঠিক আগে দুই হাত বাড়িয়ে সে বোধহয় তোমাকেই খুঁজেছিলো। তার ইচ্ছামতো হিন্দু রীতি অনুসারে তাকে এখানকার ক্রিমেটোরিয়ামে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পর দাহ করা হয়েছে। দাহের আগে তোমাকে শোক সংবাদ না দিতে সে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলো। তারই অনুরোধে তার সিঁথিতে প্রচুর সিঁদুর দেয়া হয়েছিলো আর তোমার দেয়া মূল্যবান লাল শাড়ি পরিয়ে যথারীতি দাহ করা হয়েছিলো—

*   *   *

মহীয়সী, আমার স্মরণের মেঘে মেঘে তুমি কর্মের বিদ্যুৎ জ্বালাও।

আমি শোক করবো না। আমি দিশা হারাবো না—দেশান্তর ঘুরে তোমাকে

ভোলবাব চেষ্টা কবে নিজেকে ফাঁকি দেবো না। তোমাকে খুঁজবো প্রাণেব মিছিলে।

তুমি আমাকে দিযে গেছো বিপুল পবিধি, মহত্তব জীবন, বিশাল কর্মভাব। তুমি আমাকে পর্বতেব মতো ধৈয দিযেছো, ধীব স্থিব গম্ভীব করে তুলেছো, এনেছো ধ্যানেব সংকেত।

মনেব নিভৃতে যে হোমাগ্নি তুমি জ্বালিযে দিযে গেছো তাবই দাহে তিলে তিলে শেষ হযে যাক আমাব বাসনা কামনা লাভ ক্ষতি দ্বেষ যশ সম্পদ মান অপমান। আমাব সমস্ত মন জুড়ে, আমাব দিনবাত্রিব চেতনা ভরে কাঁপুক তোমাব স্বাক্ষব। তাই হোক সম্বল—তাই হোক আমাব আজীবন অঙ্গীকাব।

আজও তেমনি ঝবে পডছে দিগন্তেব আলো কিন্তু কোথাও শ্বেত পাবাবত নেই। ফেয়াব হেজেল্ গার্ডেনসএব সেই ঘব থেকে দিগন্তেব দিকে তাকিযে থাকতে থাকতে হঠাৎ দুই চোখ ভবে কী দেখলো চঞ্চল?

অনেকদিন আগে বিলেতে আসবাব সময মাঝ সমুদ্র থেকে অনেক—অনেক দূবে চঞ্চল মাঝে মাঝে অন্য জাহাজ দেখতে পেতো। মনে হতো যেন সুদূব দিগন্তে আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে সেই জাহাজ।

আজ বহুদিন পব চঞ্চল আবাব তেমনি জাহাজ দেখলো। একটিব পব একটি—অনেক—যেন শেষ নেই।